তত্ত্ব জিজ্ঞাসা

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
কয়েকটি বাণীর সারাংশ

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
নিয়মিত রবিবারের কয়েকটি বাণীর সারাংশ
(প্রশ্নোত্তরে) টেপ-রেকর্ড হইতে

শ্রীমতী কনকপ্রভা দেবী
কর্তৃক
সংগৃহীত ও সম্পাদিত

প্রকাশক ঃ বৈদিক সন্তানদলের পক্ষে—
বকুল সরকার
বেদধাম, প্রভাসপল্লী,
ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগণা

প্রকাশকাল ঃ ২৩শে জানুয়ারী ২০১৬

মুদ্রক ঃ ইউরেকা অফসেট
৯১, এ বৈঠকখানা রোড
কোলকাতা- ৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ ৩০ টাকা মাত্র

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা

(প্রথম ভাগ)

ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ

উৎসর্গ

ঠাকুর!

গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজার মত তোমারই তত্ত্ব তোমার পায়ে উৎসর্গ ক'রলাম।

মুখবন্ধ

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আশ্রিত হবার পর থেকে তাঁর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়েছে। ফলে শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিকত্ব ও ঐশীশক্তি সম্বন্ধে এতদিন যা দূর থেকে লোকমুখে শুনে আসছিলাম, তা প্রত্যক্ষ করার অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটে। চলায় বলায় কথায় প্রতিমুহূর্তে তাঁর অসংখ্য বিভূতির প্রকাশ দেখেছি যা পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে, বিশেষ করে' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলায় প্রকট। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে তাঁর বিভূতির থেকে তাঁর তত্ত্বই অধিক বিস্ময়কর।—বাস্তবের কঠিনতম সমস্যাগুলির তিনি কত সহজতম মীমাংসা দেন! তাঁর দৈনন্দিন ক্লাসে দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, চিকিৎসা, আইন, সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সভ্যতা সংক্রান্ত জটিলতম প্রশ্নের (বাইরের জগৎ আজও যার মীমাংসা খুঁজে পায়নি) অতি সহজ সরল সমাধান করে' দেন। তাঁর অসংখ্য ভক্ত-শিষ্য ও অনুরাগীবৃন্দ যাতে তাঁর সেই তত্ত্বামৃত পান করে' জগতের আধিভৌতিক, আধি-দৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের অগণিত প্রশ্নের মীমাংসা লাভ করে' জীবনে ধন্য ও তৃপ্ত হ'তে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহজ সরল উক্তিগুলি হুবহু সঙ্কলিত করেছি এই "তত্ত্ব জিজ্ঞাসা"য়।

এই পুস্তকের শেষের দিকের সাতটি প্রশ্নোত্তর সন্তান দলের মুখপত্র "কড়া চাবুক" থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে। এই পুনর্মুদ্রণের অধিকার দান করে' উক্ত সন্তান দলের সভাপতি মহাশয় অশেষ বদান্যতা দেখিয়েছেন। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কনকপ্রভা

সুচীপত্র

পৃষ্ঠা

১। সংসারে রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য ব্যথা বেদনা—এ সব কেন? ৯—১১

২। জপ করতে বসলেই নানা আজেবাজে চিন্তা এসে জপে ব্যাঘাত ঘটায়—এর উপায় কি? ১১—১২

৩। গৃহ-গুরু, বসে' সাধনা করে' গুরু আর জন্মসিদ্ধ গুরু—এই তিনের দীক্ষার মন্ত্রের কোন প্রভেদ আছে কি? ১২—১৩

৪। সংসারে মায়া-মোহের আকর্ষণ এত বেশী কেন?—মায়াটা কি? ১৩—১৫

৫। মৃত্যুর পর দেহ থেকে কি বেরিয়ে যায়? ১৫—১৮

৬। মৃত্যুর পর দেহ যখন শ্মশানে নিয়ে যায়, যার দেহ—সে দেখতে পায় কি করে' এবং সে কথাই-বা বলে কি করে'? আর কখনো কখনো যে মৃত আত্মা দেখা যায়— তাই-বা কি করে? ১৮

৭। এখানে সাধু-সন্ন্যাসীরা বলেন—কাম ত্যাগ না করলে ভগবান দর্শন হয় না।—এটা কি সত্যি? ১৯—২১

৮। এখানকার কথা হ'ল—সন্ন্যাস না নিলে ধর্ম হয় না।—একথা কি ঠিক? ২১—২২

৯। শব্দ-ধ্বনির তত্ত্ব কি? মন্ত্রকে কেন আশ্রয় করে? ২২—২৩

১০। মনে খারাপ চিন্তা আসে কেন? ২৩—২৪

১১। চক্র কি? ২৪—২৫

১২। ওঁ শব্দ স্ত্রী-বাচক না পুরুষ-বাচক? ২৫—২৬

১৩। মন্ত্রের শক্তি কি? ২৬—৩১

১৪। শরীরটা মনের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ মানুষ যখন বড় হয়, তার ওয়েট্ তো বাড়ে? ৩১—৩২

১৫। মন আর জ্ঞানের ভিতর পার্থক্য কি? ৩২

১৬। কোন কিছু ধ্যান করায়, মূর্তি চিন্তা করায়, সেই মূর্তি সামনে দেখা যায় কিভাবে? ৩২—৩৩

১৭। বিভূতি কি এবং কি করে হয়? ৩৩—৩৫

১৮। ঘুমের মধ্যে জপ চলতে থাকলে তার ফল কি এবং ঘুমের মধ্যে জপটাকে কি করে নেওয়া যায়? ৩৫—৩৮

১৯। মূলাধার বড়, না সহস্রার বড়? ৩৮

২০। নিকৃষ্ট জীব-জন্তুর কিভাবে উদ্ধার হবে? তাদের কি ক্রমোন্নতি হবে না? ৩৮—৩৯

২১। কথায় বলে—ষাঁড়ের লেজ ধরে বৈতরণী পার হয়।—সেটা কি? ৩৯—৪০

২২। যা চাইলে চাওয়া-পাওয়া শেষ হয়, যা জানলে সব জানা শেষ হয়—সেটা কি? ৪০—৪১

২৩। গুরুপূর্ণিমা বলে কেন? ৪১
২৪। দীক্ষা নিলে কি ব্যাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকতে হয়? ৪১
২৫। সংখ্যা রেখে জপ আর সংখ্যা না-রেখে জপ—দুটোর প্রভেদ আছে কি? ৪১
২৬। আজ্ঞা-চক্রে অনন্ত কোটি সূর্যের তেজ আছে বলেছিলেন। কিন্তু আজ্ঞা-চক্রে যে এতো অগ্নি, তা তো বুঝা যায় না? ৪১—৪২
২৭। আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের রাজনীতিতে এবং এই বর্তমান পরিস্থিতিতে কতটুকু দেওয়ার আছে? ৪২—৪৩
২৮। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'— তাই তো মহাপুরুষেরা বাস্তবকে এড়িয়ে থাকতে চান। ঠিক নয় কি? ৪৩
২৯। বহু সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে গেছি, অভাব অনটনের কথা জানিয়েছি, পরমার্থের কথা জিজ্ঞেস করেছি ; শেষে জিজ্ঞেস করেছি—কিছু দেবার আপনাদের আছে কি? তাঁরা বললেন—প্রারব্ধ, তাই ভুগতে হবে নিষ্ঠা সহকারে কাজ কর, ভগবৎ নাম কর, তবে আনন্দ পাবে। তাতে মন ভরলো না। আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছি—কোন কিছু হওয়ার মত পথ আছে কি? আপনার কি নির্দেশ? ৪৩—৪৫
৩০। এখানকার কমিউনিষ্টরা কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেশে না দেখছি—এটা কেন? নিশ্চয়ই এদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা আছে।—আপনি কি বলেন? ৪৫—৪৭
৩১। আমরা তো এখন এই বুঝেই আছি যে, এখানকার ভাবনা যে ঠিকমত ভাববে, সেই ঠিক। এটা ঠিক কিনা, আপনার নিকট জানতে চাই। ৪৭—৪৯
৩২। আমাদের এখানে যাঁরা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র নিয়ে সাধনা করছেন, তাঁরা কি সা'্যবাদের সাধনাই করছেন? আপনি সাম্যবাদ বলতে যা বোঝাচ্ছেন—তাঁরা তো সেটাকে নাস্তিক্যবাদই বলেন। সুতরাং তাঁদের কি সাম্যবাদী বলা চলে? ৪৯—৫০
৩৩। আপনি তো বললেন, এখনকার সাম্যবাদের মূলনীতিগুলি বৈদিক সাম্যবাদেও ছিল। কিন্তু এখনকার সাম্যবাদীরা অর্থাৎ কম্যুনিষ্টরা তো ধর্মের নাম শুনলেই অগ্নিমূর্তি ধারণ করে! ওদিকে বৈদিক নীতি তো ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত।—এদিক থেকে এই দুই সাম্যবাদকে মেলাবো কি করে? ৫০—৫১
৩৪। আপনি বলেছেন এই মহাশূন্যের থেকে জীব-জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। —জীবের ভিতর তো চৈতন্য আছে; মহাশূন্যে কি চৈতন্য আছে, প্রাণ আছে? ৫১—৫৩

ভূমিকা

বহুখ্যাত "ভারতের সাধক"-এর স্বনামধন্য গ্রন্থকার শঙ্কর নাথ রায় ওরফে প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ "সাধুসন্তের মহাসঙ্গমে"-র প্রথম প্রবন্ধে এককালের শিবকল্প বিরাট পুরুষ আদিত্যনাম বাবার ভবিষ্যৎ বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন—"কলির এই অঙ্কে পাপ এসেছে চারপোয়া পূর্ণ ক'রে। ভগবানের আসন তখনই টলে যখন সাধুদের মধ্যে পাপাচক্র দানা বেঁধে ওঠে। সময় পূর্ণ হয়েছে, লগ্ন নিকটবর্তী। এবার তিনি নিজেই আসবেন। একটা সর্বপরিপ্লাবী ধ্বংসাত্মক লীলা অনুষ্ঠানের পর নব সৃষ্টি হবে। যুগের ভিতরেই ঘটবে যুগান্তর। তিনি এ যুগের খোলার ভিতরে পুরে দেবেন পুণ্যযুগের শাঁস। তিনি আসবেন প্রচ্ছন্ন হয়ে। তাঁকে জানবে শুধু গুটিকয়েক পার্শ্বচর আর ঋষিকল্প পুরুষেরা। তিনি অকল্পনীয় ধ্বংসের বীজ ছড়িয়ে দেবেন এই সৃষ্টির বুকে। এযুগে পাপ জেগেছে ভক্তি-শক্তি-জ্ঞানের সর্বস্তরে। এ কলুষ এ দৈন্য নিশ্চিহ্ন হবে নির্মম আঘাতের মধ্য দিয়ে। মানুষের নিজের ধ্বংসকারিতা পর্যান্ত নয়, তাই এবার আসছে ভূ-ভার হরণকারী অবতারের শক্তির মহাপ্রকাশ। কোথায় কবে আবির্ভূত হবেন, তা পূর্বনির্ধারিত—তা জানেন শুধু গুটিকয়েক প্রধান ঋষি। তবে মহাসাধকদের বিশ্বাস—এবারকার যুগাবতার আভির্ভূত হবেন ভারতবর্ষের প্রদেশে বাংলায়।"

একা আদিত্যনাথ বাবা নয়, আরও অনেক মহাপুরুষ সেই ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবের পূর্বাভায রেখে গেছেন বিভিন্ন ভাবে। বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী, তারাপীঠের সিদ্ধ বামাক্ষ্যাপা, প্রভু জগবন্ধু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সকলেই তাঁদের দিব্যদর্শনের মাধ্যমে সেই অনাগতের আগমনবার্তা ঘোষণা করে গেছেন। সেই তিমির-বিদারণ ভূ-ভারহরণকারী পূর্ণ-স্বরূপ কি জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী?—যাঁরা ইতিহাসের ছাত্র, যাঁরা তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, যাঁরা সত্যানুসন্ধানী- তাঁদের ওপর এই তথ্য উদঘাটনের দায়িত্ব অর্পণ ক'রে তাঁরই অমূল্য তত্ত্বময় ভাষণের কিয়দংশ টেপ্ রেকর্ডার থেকে উদ্ধৃত ক'রে এখানে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

কনকপ্রভা

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা

(প্রথম ভাগ)

প্রশ্ন ১। সংসারে রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য ব্যথা বেদনা—এসব কেন?

উত্তর ঃ— দুঃখ দারিদ্র্য আঘাত ব্যথা বেদনা—এসবের প্রয়োজন আছে। এসব আক্কেল দেবার জন্য নয়। ডাল যেমন ফেনিয়ে ফেনিয়ে বড়ি দেয়—ফেনাতে ফেনাতে ডাল ফেঁপে ফুলে ওঠে, তেমনি দুঃখ-আঘাতে আমাদের তৈরী করে। স্রষ্টা এসব কেন দিয়েছেন? জীবনে ফুল ফোটাবার জন্যই এই রোগ-শোক-আঘাত। কপাল খারাপ হ'লে কি এগুলো পায়? এগুলো হ'চ্ছে স্রষ্টার বড় দান। যার কোন দুঃখ নেই, সে কিছুটা অভাগা। বীজ থেকে ফুল তো ফোটে? তাহলে আমাদের মধ্যে তো ফুল ফুটছে। ঐ যে একটা দুঃখ হ'লো—একটা ফুল ফুটলো, শোক হ'লো—একটা ফুল ফুটলো। কত জ্বালা-যন্ত্রণা!—এসবই জীবনে ফুল ফোটাবার জন্য।

রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য—এগুলো হ'চ্ছে সমাধির মন্ত্র। সাপের ওঝার মন্ত্র হ'চ্ছে যত রকম গালি-গালাজ—এই মন্ত্র শুনে সাপ ফোঁস ফোঁস ক'রে আসে। গালি-গালাজের মতন রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য এরাও হ'চ্ছে মন্ত্র,—এই মন্ত্রে দেবতার আবির্ভাব হয়। যেখানে অসার, সেখানেই সার।

তোমরা আলু পটল কপি বেগুন খাও,—স্রষ্টা এগুলো খাওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর রোগ শোক দুঃখ আঘাত—এগুলোও তো ভগবানের সৃষ্টি, এগুলোও তো খাওয়ারই জিনিস। অন্য সকল জিনিস খাবে আর এগুলো খাবে না, তা কি করে হয়? দুধ মাখন ছানা খাবে, আর ঘাত-প্রতিঘাত নেবে না, রোগ শোক দুঃখ নিতে চাইবে না—এ তো হ'তে পারে না! এগুলো তো নেওয়ারই বস্তু,—এগুলো যখন এসেছে, তখন নিতে হবে। তরি-তরকারী, মাছ দুধ—এগুলোতে যদি শরীরে রক্ত হয়, তবে রোগ শোক আঘাতে কি উপকারটা হ'তে পারে, সেটা খোঁজ করে দেখেছ?— দেহপাত্রটা তৈরী হওয়ার জন্যই এইসব ঝঞ্ঝাট। দেখ না —জলের কুঁজো যখন তৈরী করে তখন চাকের মধ্য দিয়ে কেমন ঘুরায়; ঘুরাতে ঘুরাতে কি সুন্দর কুঁজো তৈরী হয়! ব্যথা না হ'লে সুপ্রসব হয় না। দেখ না —প্রসূতির জন্য ব্যথা চায়, ব্যথা হ'লেই সন্তান সুপ্রসব হয়। তাই পূর্ণত্বে পৌঁছবার জন্যই এইসব ব্যথা বেদনা দুঃখ আঘাত। কেন রোগ এলো, কেন দুঃখ এলো, কেন দারিদ্র্য এলো?—এগুলো যদি নাই আসতো, পৃথিবীতে যদি তৃপ্তি নিয়ে সবাই বসে থাকতো, তবে আর সুরের সঙ্গে মেশা হ'তো না। কারণ তাগিদ না থাকলে বুদ্ধি বা'র হয় না; তাগাদা আসলেই নানা রকম ফন্দী বা'র হয়। জীবনে আমরা প্রয়োজনের তাগিদেই কাজ করে যাচ্ছি; তাগিদে যখন কাজ করে যাচ্ছি, তখন চিন্তা করতে হবে— কিভাবে আমরা কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে পারি। এই করার ভিতর স্রষ্টা কি দিল? রোগ দিল, শোক দিল, মৃত্যু দিল—দুঃখ দারিদ্র্য এসব দিল। স্রষ্টা যেই নিয়মের মধ্য দিয়ে আমাদের রেখেছেন, তাতে অশান্তি ঝঞ্ঝাট যার যত বেশী আসবে, ততই

মনে করবে—স্রষ্টার স্মরণের মধ্যে সে বেশী করে পড়েছে এবং তত বেশী সে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। এটা নিশ্চিত—এটা হবেই। না হয়ে পারে না। তবে যারা সুখে আছে, তাদের কি এগিয়ে যাওয়া হবে না? তাদেরও হবে, তবে তাদেরও ঘা খেতেই হবে। কেমনে তারা ঘা খাবে?— খাওয়ালো, পড়ালো, মানুষ করলো,—শেষে বলছে— কি করেছে আমার জন্য?—একটা কথাতেই ঘা খাওয়া হয়ে গেল।

আঘাত—এটা জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছে। স্রষ্টা কি করেছেন?—মেঘের মতন, ঝড়ের মতন সব সময় আমাদের উপর দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছেন। এই চালিয়ে নেওয়ার ফলে গড়ে' উঠছে,—তাতে দর্শন, স্পর্শন, যাবতীয় যা কিছু যে নিয়মে যা দরকার, তাই হয়ে যাচ্ছে।

দুঃখ আঘাত রোগ শোক মানুষ চায় না; কিন্তু না চাইলেও এর মত হিতকারীও মানুষের আর কিছু নেই। আলোড়ন না হ'লে গড়ে' ওঠে না, মন্থন না হ'লে মাখন বা'র হয় না। দুধের মধ্যে আলোড়ন কর, আঘাত দাও—মাখন পাবে। এই যে নূতন সৃষ্টি, অপরূপ রূপ—এটা কি করছে?— ঘাত-পতিঘাতের মাঝ দিয়ে, ভাঙা-গড়ার মাঝ দিয়ে যাচ্ছে। যদি না ভাঙতো, তবে গড়তে পারতো না। তাই স্রষ্টা ঘাত-প্রতিঘাত-মৃত্যু দিল। মৃত্যুটা দেওয়ার প্রয়োজন সেইজন্যই। মৃত্যুটা কেবল নামে আছে, আসলে কেহ মরে না। আমরা মনে করছি মারা গেছে, কিন্তু পরিবর্তিত রূপে সে আছে। তবে এখানে কি হ'চ্ছে?—থিয়েটারের গ্রীনরুম থেকে একই ব্যক্তি পাগলের পার্ট নিয়ে আসলো, আবার সেই একই ব্যক্তি বিবেকের পার্ট নিয়ে এল। এক গ্রীনরূপ থেকে কত পার্ট নিল! সেই রকম আমরাও একবার মৃত্যুর পার্ট, একবার শোকের পার্ট, একবার রোগের পার্ট, একবার দুঃখের পার্ট নিচ্ছি। এমনিই চলছে এই পৃথিবী-মঞ্চের উপরে একই ব্যক্তির নানা পার্ট।

দেখ না—কাপড়ের কলে কেমন মাকু চলে, মাকুটা কেমন সব সময় দৌড়াদৌড়ি করে! মাকুটা ঘুরছে বলেই কাপড়টা ঠাসবুনাট হ'চ্ছে। মাকু না চললে কাপড়ে বুনাট হ'তো না। ঐ মাকুটাই আসল।—তেমনি আমরা কি করছি?—মাকুর মতন ঘুরছি— একবার আনন্দ, একবার দুঃখ, একবার রোগ, একবার শোক, একবার কেমনে টাকা রোজগার করবো, কেমনে রাজা-প্রজা হবো, কেমনে বাড়ী-গাড়ী করবো—এই মাকু চলছে, এই নিয়েই ব্যস্ত, আর এই মাকুতেই বুনাট হ'চ্ছে। এটা হ'লো ঘানি—ঐ ঘানিতেই চৈতন্যের বুনাট এমন সুন্দরভাবে হ'য়ে যাচ্ছে যে কারো রেহাই পাবার উপায় নেই। জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই না পাওয়া পর্যন্ত রোগ শোক দুঃখ আঘাতের থেকেও কারো রেহাই নেই,—রেহাই পাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেনি। সৃষ্টি করেছে মিলতি করার জন্য, সৃষ্টি করেছে আনন্দলোকে—আলোর রাজ্যে নিয়ে মেলাবার জন্য। যতক্ষণ না মিলছে, ততক্ষণ এই মাকু খ্যাট্ খ্যাট্ করে চলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সীমানায় গিয়ে না পৌঁছবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ছকের মধ্যে বার-বার ঘূর্ণিপাকের ঘূর্ণিতে এইভাবে ঘুরতে হবে।

কথায় বলে যমপুরী আছে, নরক আছে। এই কথাগুলি এমনি এমনি আসেনি। দেহের

মধ্যে যত রকম অনুভব আছে—রোগ আছে, শোক আছে, দুঃখ আছে, আঘাত আছে, ততরকম পৃথিবী আছে—রোগের পৃথিবী। এই সব পৃথিবী মিলেই ছক। এই ছক বড় সাংঘাতিক ছক। যতক্ষণ এ ছক অতিক্রম করতে না পারছে ততক্ষণ এই ছকের মধ্যে, ঘূর্ণিপাকের মধ্যে বার-বার যাতায়াত ক'রতে হবে তৈরি হবার জন্য। এই ছক অতিক্রম করার জন্যই জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা, আর এই দেহটাই হ'লো ছক অতিক্রম করার যন্ত্র। এই দেহে জপ-তপ-ধ্যান-ধারণার দ্বারাই সেই আনন্দলোকে যাওয়া যায়। এখানে যে মাত্রায় দেহ রাখবে, সেই রকম পৃথিবীতে সেই রমক জন্ম হবে। সবই একটা অঙ্কের উপরে আছে। মনে কর একজন এক লক্ষ মাত্রায় দেহ রাখলো। সে লক্ষ মাত্রার পৃথিবীতেই চলে গেল—অতি মধুময় জন্ম হলো। সেখানে গিয়ে দেখলো নারায়ণ বিষ্ণু শিব সবাই ঘোরাফেরা করছেন—সবাই স্থূল শরীর নিয়ে আছেন।

জনৈকের প্রশ্ন ঃ—মাত্রা কি করে হবে?

উত্তর ঃ—কর্মের মাধ্যমেই মাত্রা হবে।

প্রশ্ন ২। জপ করতে বসলে নানা আজেবাজে চিন্তা এসে জপে ব্যাঘাত ঘটায়—এর উপায় কি?

উত্তর ঃ—দেখ, যেমন তোমরা পায়খানা প্রস্রাব কর, তেমনি ঐ চিন্তা-ভাবনাগুলো হ'চ্ছে মনের পায়খানা। শরীরের মল যেমন পায়খানা প্রস্রাব দিয়ে বা'র হয়ে যাচ্ছে—শরীরের দূষিত জিনিস বা'র হয়ে যেমন তোমার শরীরকে সুস্থ রাখছে, তেমনি কুচিন্তা কুভাবনাগুলো হ'চ্ছে মনের মল;মনের দূষিত জিনিস বা'র হবেই,—ওটা বা'র হবার জন্যই। ওতে তোমাদের মন সুস্থ থাকবে। ওটা যত বা'র হয়, ততই মঙ্গল। ওটাকে আটকাবে না।—বা'র হয়ে যাক, ওদিকে তোমরা নজর দিও না। যা খুশি তা মনের মধ্যে আসুক, তাতে তোমাদের কিছু হবে না, তাই সেজন্যে ভাবার কিছু নেই। রাস্তায় যখন তোমরা চল, তখন দুর্গন্ধ নাকে এলে যেমন 'ওয়াক থু' ক'রে থুতু ফেলে দাও, তেমনি আজে-বাজে চিন্তাগুলো মনের কাছে দর্গন্ধস্বরূপ, কাজেই মন তার দুর্গন্ধরূপ কুচিন্তাকে 'ওয়াক থু' করে ফেলে দিচ্ছে। তোমরা ঐ আজে বাজে চিন্তার দিকে খেয়াল ক'রো না। তোমরা ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মন বসুক বা না-বসুক, আজেবাজে চিন্তা নিয়েই কেবল জপ করে যাবে। মন তার ময়লা ফেলে দেওয়ার জন্য অবিরত ঐ চিন্তা করে যাচ্ছে, তাতে তোমাদের আসল কাজের কোন ক্ষতি হবে না। মনের বিড়বিড়ানিতে তোমাদের কাজের কোন ক্ষতি করতে পারবে না,—তোমাদের কাজ ঠিক হ'য়ে যাবে। দেখ না, ঘুমের মধ্যে পর্যন্ত মনের বিড়বিড়ানির থেকে রেহাই নেই! ঘুমের মধ্যে পর্যন্ত মন কাউকে রেহাই দেয় না। তুমি বাড়ীতে ঘুমিয়ে আছ, আর মন তোমাকে খালে-বিলে-নদীতে নিয়ে গিয়ে মাছ ধরাচ্ছে, গাছে উঠিয়ে আম পাড়াচ্ছে। এই মনের জন্য তোমাদের ভাবনা করার কিছু নেই। মন তোমাদের গুরুত্বহীন কথাই বিড়বিড় করে বা'র ক'রে দিচ্ছে। মনের বিড়বিড়ানির বিশ্বের কাছে গুরুত্ব নেই বলেই গুরুত্ববিহীন, এবং গুরুত্ববিহীন হ'লেই মন তা বা'র করবেই—সর্দি প্রস্রাব ঘামের ন্যায় বা'র হবেই। বলছে—এগুলো ধরে থাকার জিনিস নয়। হাটে-বাজারে মাঠে-ঘাটে সব জায়গাতে

মনের মধ্যে চলছে কত চিন্তা—যেন সিনেমার রীল চলছে মনে। মনের এইসবের জন্য তোমাদের ভাবাভাবির দরকার নেই;চিন্তা যা আসে আসুক, তোমরা ঐদিকে মন দিও না।—তবে ঐগুলো উৎপাত করে কেন?—মনের জমানো মলকে বা'র করার জন্য।

জপটা একটা অদ্ভুত জিনিস, ভাল জিনিস। ভাল জিনিসকে সবাই ভালবাসে। কাঁঠাল চেন তো? সেই কাঁঠাল যখন তোমরা খাওয়ার জন্য ভাঙ্গ, তখন কোথা থেকে সব বড় বড় মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে উপস্থিত হয়—নিশ্চয়ই দেখেছ। ঐ কাঁঠাল তোমরা যেমন ভালবাস, মাছিরাও খুব ভালবাসে। ঐ মাছিরা আসলে তোমরা কি কর? হাত দিয়ে তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে কাঁঠাল খেতে আরম্ভ কর। তেমনি জপটা হ'ল শ্রেষ্ঠ শব্দ,—এই জপ যখন তামরা করতে বস, তখন ঐ আজেবাজে চিন্তাগুলো, ওরাও জপ ভালবাসে, তোমাদের জপে বিঘ্ন করার জন্য ছুটে আসে, ঠিক যেমন তোমাদের কাঁঠাল খাওয়ার বিঘ্ন করার জন্য মাছিগুলো ছুটে আসে। মাছিগুলো তাড়িয়ে তো তোমরা কাঁঠাল খাও? সেইরকম তোমরা ঐ আজেবাজে চিন্তাগুলোকে সরিয়ে সরিয়ে কেবল জপ করে যাবে। মাছি তাড়ালেও যেমন কাঁঠালের আশে পাশেই থাকে, তেমনি আজেবাজে চিন্তা মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিলেও তোমরা আপন খেয়ালে জপ করে যাবে।

প্রশ্ন ৩। গৃহগুরু, বসে সাধনা করে গুরু আর জন্মসিদ্ধ গুরু—এই তিনের দীক্ষার মন্ত্রে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ— দেখ, জহরলাল-পান্নালাল আর মন্ত্রী জহরলালের লেখা এক নয়। জহরলাল-পান্নালালের সই থাকলে তুমি চার জোড়া কাপড় বাকী আনতে পার। আর মন্ত্রী জহরলাল সই দিলে সেটা অন্যরকম হবে। একই ব্যক্তিত্ব, একই নাম—হ'লে হবে কি! সূর্যের থেকে যিনি এসেছেন তিনি যখন দান করেন, তাঁর দেওয়া মন্ত্র একেবারে সাঁ-আ-আ করে নিয়ে ফেলে দেবে যেখানে সত্যদ্রষ্টা সত্যদর্শী, যেখানে কৃষ্ণ রাম বিষ্ণু বিরাজ করছেন—সেই স্তরে। জন্মসিদ্ধ ব্যক্তি যখন তোমার কানে ঐ শব্দটা দিয়ে দিচ্ছেন, তিনি কিন্তু সাধারণ শব্দই দিচ্ছেন, সবাই যা দেয় তিনিও তাইই দিচ্ছেন। কিন্তু জন্মসিদ্ধ ব্যক্তি দিলে সেই শব্দের ক্রিয়া বেশী হবে, কারণ হ'লো তাঁর জন্মগত মাত্রা। তিনি যেই মাত্রা থেকে এসেছেন, সেই মাত্রা থেকেই তোমায় দিচ্ছেন,—কথাটা বুঝলে? যেমন একতলা থেকে পড়া আর তিন-তলা থেকে পড়া—এক রকমই ব্যথা কি?—চোটটা বেশী লাগবে না?—ধুপ করে শব্দটা বেশী হবে না?—আট-তলা থেকে পড়লে আরো বেশী চোট লাগবে, চল্লিশ-তলা থেকে প'ড়লে আরও বেশী লাগবে। অর্থাৎ যত বেশী উচ্চ মাত্রা হবে, চোট তত বেশী লাগবে। সব কিছুরই মাত্রা আছে, এ ক্ষেত্রে তলা হ'লো মাত্রা। যিনি জন্মগতের মাত্রা নিয়ে এসেছেন, তিনি যখন এই শব্দটা দেবেন তখন মাত্রার কাজটা বেশী হবে। এখানে বসে সাধনা করে যাঁরা দেবেন তাঁদের এক মাত্রা, আর যাঁরা গৃহগুরু তাঁদের আর এক মাত্রা, আবার যিনি ঘরোয়ানা হয়ে এসেছেন তাঁর স্বতন্ত্র মাত্রা। একই শব্দ—একই নাম—একই জিনিস তোমায় দিচ্ছেন,—তিনিও 'রাম'—একই নাম দিচ্ছেন; কিন্তু মহাপ্রভু যখন নাম দিচ্ছেন— সে নামে

কাজ হ'চ্ছে বেশী। দেখ, রাম নাম একই, কিন্তু সেই রামকে 'রাম' বলা যায়, 'রামা' বলা যায়, 'হা রাম' বলা যায়। এক রাম কত রকম হয়ে যায়, একটা শব্দের মধ্যে কত পার্থক্য হয়ে যায়!

আবার দেখ, মন্ত্র হলো, মনে করো এখানকার লোহা। যিনি জন্মগত অধিকার নিয়ে আসেন তিনি কি করেন? সেই লোহার ভিতরে একটু তাঁর জন্মগতের বারুদ লাগিয়ে তোমাকে দেন। তখন বারুদের ক্রিয়ায় ঐ মন্ত্র বুলেটের মতন ফটাস্ ক'রে ফেটে পাঁচশত হাত দূরে যাবে। এতটুকু বুলেট্, সেটা হাতে ক'রে ছুঁড়লে একশত হাত যাবে,—আর বারুদের ক্রিয়ায় যাবে পাঁচশত হাত। বুঝতে পেরেছ?

দেখ, পাঠশালায় যেমন এক গুরু শিক্ষা দেন, স্কুলে অন্য গুরু শিক্ষা দেন, আবার কলেজে আর এক গুরু শিক্ষা দেন। সেই রকম কেউ অনাহতের কাজ জানেন, কেউ আজ্ঞাচক্রের কাজ জানেন, আবার কেউ সহস্রারের কাজ জানেন। সাতটা চক্র আছে, এক একজন এক একটি ফুটিয়ে দিতে পারেন। এক এক জায়গায় এক একজন মহান ব্যক্তি আছেন, তাঁরা সেই সেই জায়গার কাজ জানেন। ব্যাপার হচ্ছে, সবটাই নির্ভর করে গুরুর কাজের উপর। এই খানেই বসে সাধনা করে যিনি শক্তি আয়ত্ত ক'রলেন, তিনি এক স্তরের আর জন্মের থেকে যিনি ক্ষমতা নিয়ে এলেন তিনি আর এক স্তরের। বিভিন্ন স্তরের অধিকার নিয়ে এক একজন আসেন। সুতরাং দেখতে হবে কে কোন স্তরের।

প্রশ্ন ৪। সংসারে মায়া-মোহের আকর্ষণ এতো বেশী কেন? মায়াটা কি?

উত্তর ঃ— মায়া হ'লো আকর্ষণ। আকর্ষণটা কেন হয়? আমাদের এই সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু—গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য-পৃথিবী, সবার সঙ্গে সবার আকর্ষণ আছে। কারণ প্রত্যেকটি জিনিস জানার পথে বা বুঝার পথে, আকর্ষণের পথে যুক্ত আছে। সন্তানের উপর যদি আকর্ষণ না থাকতো, তবে সন্তান মানুষ হ'তো না। আকর্ষণ আছে বলেই এগিয়ে যাচ্ছে। এই আকর্ষণের ভিন্ন নাম দিয়েছে—কোনটি মায়া, কোনটি প্রেম, কোনটি ভালবাসা, কোনটি যোগাযোগ। ভিন্ন ভিন্ন নামে এই আকর্ষণটি আছে বলেই সত্যিকারের সুর খুঁজে পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রী ছেলে-মেয়ে—এই যে সংসারে আকর্ষণ— এটা না থাকলে সংসার ছন্নছাড়া হ'য়ে যেতো।

এই যে ভগবানকে ডেকে ডেকে কাঁদছে—মায়ার সৃষ্টি করছে। সেই মায়াটা কি? আমাদের ভিতরে যে মায়ার উদ্ভব হ'চ্ছে, এটা হচ্ছে একটি অঙ্গ। এই মায়া অঙ্গাঙ্গি ভাবে সবার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রয়েছে। পৃথিবী-সূর্য মায়ার আকর্ষণে যুক্ত হয়ে রয়েছে, বাতাসে-জলে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে; আকাশে-মেঘে মায়ার বন্ধন, চাঁদে-পৃথিবীতে মায়ার বন্ধন, গাছে-মাটিতে মায়ার বন্ধন, জলে-স্থলে-খাদ্যে সবাই সবার সঙ্গে মায়ার আকর্ষণে যুক্ত। সংসার সমাজ সবটাই মায়ায় আবদ্ধ। মায়া কখনও ত্যাগ করা যায় না, মায়া ত্যাগ করার প্রয়োজনও হয় না। কারণ হচ্ছে, আমরা সবাই সেই মায়ার আকর্ষণের সিঁড়ি দিয়ে আকর্ষণের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আকর্ষণকে উপলব্ধি করছি, আকর্ষণকে বুঝতে পারছি। এই যে ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ, খাদ্যের আকর্ষণ, ভালবাসার আকর্ষণ— সমস্ত জীবনে এই যে একে

অন্যের সঙ্গে যোগাযোগের আকর্ষণ, এই আকর্ষণ থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি? বুঝতে পারছি—সেই বিরাট মহামায়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এই আকর্ষণ। সেই মহামায়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যা করণীয়, সেইভাবে আমরা এখান থেকে তৈরী হয়ে যাচ্ছি। মায়ার আকর্ষণে, সৌন্দর্যের আকর্ষণে, গুণের আকর্ষণে তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই মহামায়ায়।

কোন্ মায়া ত্যাগ ক'রতে বলেছে? যেটা উৎকট মায়া, সেইটা ত্যাগ করবে। এই সংসারের উপরে তোমার চিন্তাধারা ষাট-বাষট্টি-সত্তর, না হয় একশতই ধরলাম। চলে যখন যেতেই হবে, তখন যাত্রার পুটলিটুকু গুছিয়ে নিতে হবে, সম্বল সঙ্গে নিতে হবে। আমার একশত বছরের আয়ুর জন্য লক্ষ বছরের ভাবনা ভাবলে তো চলবে না! সেইটিই হ'লো মায়ার বন্ধন। 'মায়া ত্যাগ কর' মানে কি? যা আছে তা ত্যাগ করা নয়; যা আছে তা রেখে, তার অতিরিক্তকে ত্যাগ করা। যা আছে সেই পর্যন্ত তুমি ভাব, তারপরের ভাবনাকে তুমি ভাবতে যেও না, গেলেই তুমি ফেঁসে পড়বে। আমরা কিন্তু সেইখানেই ভুল করি।

ষাট-সত্তর-একশত বছরের রাত্রটা কোনমত ক'রে কাটিয়ে নিতে পারলেই তো হ'লো—এর জন্য ঝগড়া বিবাদ হিংসা করে লাভটা কি? ষাট-সত্তর-একশত বছরের রাত্রটা একটু লম্বা হয়ে যাওয়াতে কথাটার গুরুত্ব কমে গেছে। একটা রাত যেমন তাড়াতাড়ি শেষ হয়, ষাট-সত্তর-একশত বছরের রাতটা সে তুলনায় অনেক বড় হয়ে যায়। এই ষাট-সত্তর-একশত বছরের ভাবনাটাকে এক লাখ ষাট হাজার বছর ভেবে নিয়ে যত অন্যায়, অপরাধ, ত্রুটি, কুবৃত্তি, ব্ল্যাক মার্কেট—এই সবের দিকে এগিয়ে যায় এবং গিয়ে প্যাঁচে আটকিয়ে পড়ে। এমন মায়ার প্যাঁচে আটকায় যে, সে গিঠ্ঠু আর খোলে না। মায়াটা হলো এমন একটা গিঠ্ঠু যেই গিঠ্ঠুতে ভগবানকে পাওয়া যায়; আবার এতে ভগবানকে না-পাওয়ার গিঠ্ঠুও হয়ে যায়। একটা হ'লো— হড়কা গিঠ্ঠু, আর একটা হ'ল— সিঙ্গা গিঠ্ঠু। বলেছে—সেই মায়া ত্যাগ কর, সীমায় থাক, সীমা ছাড়িয়ে যেও না। স্রষ্টা বলছেন— আমি তোমাদের যেই বুদ্ধি-বৃত্তি-ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে যা সহজ গতিতে দিয়ে দিলাম, তোমরা সেই সহজ গতির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাও। তিনি বলছেন— তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তির ভিতর আমি যা দান করলাম, সেই হিসাবেই তোমাদের আমি ন্যস্ত করেছি; তোমরা আমার দেওয়া বুদ্ধিবৃত্তির উপর এমন কোন কারিকুরি করতে যেও না, ব্যতিক্রম করতে যেও না যাতে তুমি ফেঁসে পড়তে পার। যে মায়া সহজ গতিতে আছে, সেই মায়ার পথ দিয়ে আমি তোমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছি,—তোমরা সেই পথের পথিক হয়ো, তার মধ্যে আর কোন উৎকট মায়াকে টেনে নিও না। সমসুরে বাঁধ; বাড়তি যেটা, সেটা ত্যাগ কর। আমি তোমাদের জ্ঞানের কাঁটা ঠিক করে দিয়ে পাঠিয়েছি; কম্পাসের কাঁটা যেমন চারদিকে ঘোরালেও উত্তরমুখেই থাকে, সেইরকম তোমাদের জ্ঞানের কাঁটা ঠিক রেখে চল।

আর দেখ, মায়ার এই যে আকর্ষণ, এই যে সবার সঙ্গে সবার সম্পর্ক-শক্তিটা রয়েছে, এই সম্পর্কের ভিতর দিয়ে আকর্ষণ-শক্তিটা জাগ্রত রয়েছে। কিন্তু কেন এই আকর্ষণ? কথায় বলে—স্বর্গের সিঁড়ি। স্বর্গের সিঁড়ি তো আর এমনি দড়ি ফেলে করবে না! স্বর্গের

সিঁড়ি হলো ওই আকর্ষণের মাঝে যে সিঁড়ি রয়েছে, সেই সিঁড়িটা দিয়েই আমাদের যেতে হবে। এই সিঁড়িটা যে কত সুন্দর, এটা দেখবার যদি যন্ত্র থাকতো তবে দেখতে পেতে। এই সিঁড়ি সবাইকে লিফ্টের মতন নিয়ে যাবে—টানা-হ্যাঁচড়া ক'রে যেতে হবে না। এই সিঁড়িটা কিসের জন্য? এই পৃথিবীকে যে টেনে রাখতে পারে, সূর্যকে যে টেনে রাখতে পারে, সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহকে যে টেনে রাখতে পারে, সেই টেনে রাখার শক্তিটার থেকে যখন আমরা এসেছি, তখন আমরা তো সেই শক্তির সঙ্গেই যুক্ত। তাই আমরা সেই আকর্ষণের মাঝ দিয়ে সেই শক্তিতেই যাব, সেই ভাবেই মিশব। কি ভাবে মিশব জান? আমরা বীজ হয়ে এসেছি—গাছ হয়ে বা'র হ'লাম, আবার ফল-ফুল হ'য়ে বীজ হ'য়ে যাব। আমাদের কোন অসুবিধা নেই, আমরা ঠিক চলে যাব। ওই যে আকর্ষণের রাস্তা, ওই রাস্তা দিয়ে আমরা সবাই এগিয়ে চলে যাব। অতি অপূর্ব এই রাস্তা—এই রাস্তা স্রষ্টা আমাদের যাওয়ার জন্যই তৈরী ক'রে রেখেছেন।

প্রশ্ন ৫। মৃত্যুর পর দেহ থেকে কি বেরিয়ে যায়?

উত্তর ঃ— মৃত্যু কি জান? মৃত্যু হ'লো সমাধি। তোমাদের যখন ফটো তোলা হয়, তখন তোমরা কি কর? ফটোগ্রাফার বলে—ঠিক হ'য়ে বসুন, নড়বেন না। তোমরা যদি হাত-পা নাড়াচাড়া কর, শরীর নাড়াচাড়া কর, তবে ফটো উঠবে না। তাই তোমাদের বলে—নড়বেন না, চুপ করে বসুন—ওয়ান—টু—থ্রি। এই যে তোমরা একটুখানি চুপ করে বসলে, এটাও এক রকম সমাধি। ঐ সমাধি-অবস্থায় কি সুন্দর ফটো উঠে গেল তোমাদের! মৃত্যু হ'লো বড় রকমের সমাধি। এই সমাধিতে যখন লোক থাকে, তখন দেহটা পড়ে থাকে, কিন্তু তার সুন্দর ফটো উঠে চলে যায়।

আত্মাটা কি, তাই আগে বুঝতে হবে। আত্মা কোথায় থাকে? হাতটা কেটে ফেল—সেই হাতে কি আত্মা থাকে? পা কেটে ফেল—সেই পায়ে কি আত্মা থাকে? শরীরের অর্ধেকটা কেটে ফেললেও সেই শরীরে আত্মা নেই। কাছিমের গলা কেটে ফেললেও সেই কাছিমের গলাটা হা করে' জল খায়। মুণ্ডটা ভাবে—দেহটা তো পড়ে আছে, ওটা যদি আমার দেহ হয়, তবে তাতে আমি নেই কেন?

আত্মা সর্বব্যাপী। সীমার মধ্যে যখন থাকে, তখন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। মোটরগাড়ী যখন চলে, ইঞ্জিনটা তাকে চালিয়ে নেয়; কিন্তু ইঞ্জিনটা থামিয়ে দিলেও সেই গতিতে গাড়িটা আরো কিছুদূর এগিয়ে যায়। সেই রকম দেহের থেকে আত্মা যখন চলে যায়, তখন দেহের ইঞ্জিন বন্ধ হলেও তার গতিতে মহাশূন্যে চলে যায়।

মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় চলে যায়? ঘুম হ'লো মৃত্যুর ছোট ভাই, ঘুমের ভিতর কোন সাড়া থাকে না। মনে কর, ছোট ভাই ঘুম হ'লো জমিদার। ছোট জমিদার—তার জায়গাও ছোট। তুমি ঘুমের ভিতর কত স্বপ্ন দেখলে—জলে হাঁটলে, শূন্যে গেলে, ঝগড়া করলে, মারামারি করলে, কত কথা বললে। কিন্তু ছোট ভাইয়ের রাজত্ব থেকে যখন চলে এলে, অর্থাৎ যখন জাগলে, তখন সব কথা স্মরণ করে বলতে পারছ। আর যখন ছোট ভাই তার

বড় ভাইয়ের কাছে, মৃত্যুর কাছে সবাইকে পৌঁছে দিয়ে আসে, (মৃত্যু হ'ল সম্রাট, সেই সম্রাটের রাজত্ব বিরাট) তখন তোমরা বিরাট রাজত্বে চলে গেলে। বিরাটের সবই বিরাট।— সেখানে গিয়ে দেখলে—তোমার দেহ অন্যে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি তাকিয়ে দেখছ, এবং সবাই যখন হরিধ্বনি দিচ্ছে তুমিও তখন হরিধ্বনি দিচ্ছ। তোমার দেহ দেখে তুমি তখন ভাবছ—আমি যখন ঐ দেহতে ছিলাম, তখন আমি এই-এই কাজ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা তো আমার করা হ'লো না! তাই তোমার হতাশা-নিরাশা সবই দেহ ছেড়ে তোমার সঙ্গে চলে গেল। দেহতে যখন তুমি ছিলে, তখন যদি মনে কর এই কাজ করবে, কিন্তু করা হ'লো না, জীবন-কালের সেই হতাশা-নিরাশার পরিমাপ যতটা থাকে (মনে কর তারা পা বাড়ালে দুই হাত দূরে সেই পা পড়বে), মৃত্যু-সম্রাটের কাছে, সেই বিরাট জায়গায় চলে গেলে তোমার সেই হতাশা-নিরাশা আরও বিরাট হয়ে যাবে (ধর তারা পা বাড়ালে বিলাত পর্যন্ত সেই পা যাবে)। বিরাট জায়গায় সবই বিরাট; মৃত্যু-সম্রাটের কাছে গিয়ে সেই হতাশা-নিরাশা-ইচ্ছা-আকাংক্ষা সব বড় হয়ে যায়। তার প্রভাবে যখন তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখন দেখলে তোমার আবার জন্ম হয়ে গেছে।

দেখ, একটি ফুল আছে এখানে, আর তার গন্ধ বেরিয়েছে—ঐ অনেক দূর পর্যন্ত। তা হলে গন্ধ যখন বা'র হয়, তখন ফুলের মধ্যে একটা কিছু বস্তু না থাকলে, সূক্ষ্ম কিছু না থাকলে গন্ধটা কি করে সেখানে যায়? মিলতির সঙ্গে এমন ভাবে আছে বলেই তোমরা সুগন্ধটা পাচ্ছ। দেহের মধ্যেও সুগন্ধ আছে; দেহের থেকে যখন এই সুগন্ধ বেরিয়ে যায়, বেরিয়ে যেতে যেতে দেহটা তখন লয় ক্ষয় হয়ে যায়। এই যে ফুলটা দেখছ, দেখবে দিনের পর দিন এর গন্ধ বেরিয়ে যাচ্ছে, তারপর শুকিয়ে ক্ষয় হ'য়ে পরিবর্তন হয়ে যায়। আণিমা শক্তির নিয়ম কি? অণিমা শক্তি হচ্ছে— যেই বস্তুটা শক্ত আছে, সেইটা সম্পূর্ণ অণু আকারে পঞ্চভূতের সঙ্গে মিশে যায়, অন্য আকার নিয়ে নেয়। এই দেহও ঠিক তাই—এই দেহের থেকে সেই সুগন্ধ বেরিয়ে যায়। দেহের সুগন্ধ মন,—মনটা হচ্ছে দেহের সুগন্ধ। ফুলের সুগন্ধ হচ্ছে ফুলের মন। সেটা যেমন ফুল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তেমনি দেহ থেকেও সুগন্ধ-রূপ মন বেরিয়ে যাচ্ছে। এই সুগন্ধরূপ মন অনর্গল ভাবে আজও বেরিয়ে যাচ্ছে এবং বেরিয়ে যেতে যেতে এই দেহও মনের সঙ্গে একদিন বেরিয়ে যাবে।

আত্মাটা কি ক'রছে? ভরপুর হ'য়ে রূপ নিয়ে এসেছে। সেই মহাকাশ হ'তে আমরা শিলা হ'য়ে বরফ আকারে এসেছি। আত্মাটা বরফ হ'য়ে, জল বাতাস খাদ্য দিয়ে বরফের ন্যায় বের হ'লো। আত্মাটা কি? এই বিরাট মহাচৈতন্য বরফ আকারে জমাট হয়। সেই সজাগ জমাট হ'লেই আত্মা হয়। সজাগ চিরকালই সজাগ—মৃত্যু বলে কোন কথা নেই। সজাগ শুধু রূপান্তরিত হয়। মৃত্যুর পর আত্মা বের হয়—একথা ঠিক নয়। সবটাই আত্মা, দেহটাও আত্মা—শুধু এঘর থেকে সেঘরে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর দেহ থেকে কি করে বার হয়? দুধে মাখন কণিকায় কণিকায় ছড়িয়ে আছে, সেই দুধ মন্থনে দলা বেঁধে মাখন হ'য়ে সেই দুধেই ভাসতে থাকে। তেমনি আত্মার ননীগুলো দেহময় ছড়িয়ে আছে; মনের মন্থনে,

আলোড়নে জাগতিক প্রক্রিয়াতে শ্বাসে প্রশ্বাসে ননীগুলো গঠন হয়ে যাচ্ছে। গঠন হয়ে কি হচ্ছে? ক্যামেরায় যেমন ছবি উঠে যায়—একেবারে সজাগ ছবি উঠে যায়, তেমনি দেহে যা আছে, তাই উঠে গিয়ে ফস্ করে সরে পড়ে, আর দেহটা তখন পড়ে থাকে। দেহটা যখন সমূহ বন্ধ হয়.—বোমার বাজীর মধ্যে যেমন রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ, ফুলের মালা—এই সব থাকে, বোমবাজী ফাটলে যেমন তার ভেতর থেকে ঐ ফুলের মালা, রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ বা'র হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়, আর বাজীর ছোবড়া নিচে পড়ে থাকে, তেমনি এই দেহটা যখন সমূহ বন্ধ হয়, অর্থাৎ দেহের বোম—ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম, যা দিয়ে এই দেহ তৈরী, সেই দেহের বোম যখন ফাটে তখন এর থেকে রাম বা'র হয়, কৃষ্ণ বা'র হয়, শিব বা'র হয়, আবার অসুর বা'র হয়। কি রূপ যে বা'র হবে তা বলা যায় না—কাকও বা'র হতে পারে, বিড়ালও বা'র হ'তে পারে, কুকুরও বা'র হ'তে পারে। বা'র হওয়ার পরে ছোবড়া পড়ে থাকে, সেই ছোবড়া আমরা কাঁধে করে হরিবোল বলে নিয়ে যাই শ্মশানে। আর ওদিকে রাম চলছে, কৃষ্ণ চলছে, শিব চলছে, অসুর চলছে, আবার হয়তো কাক-বিড়ালও চলছে। আবার শুদ্ধসত্ত্ব রূপে ভগবানও বা'র হ'তে পারে। বা'র হ'য়েই রূপ নিয়ে নেয়। কার যে কি রূপ বা'র হবে তা তো ঠিক নেই! রূপটা বেরিয়ে যাবে ঠিকই,—আর সেই মূর্তির ছোবড়া যা পড়ে থাকে, তাকেই কাঁধে করে হরিধ্বনি দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যায়।

এই আত্মার রূপ হচ্ছে বিকাশ—কোথায় কিভাবে থাকে বুঝা যায় না। ধড়াস্ করে ফেটে যখন চলে যায়, তখন একটা অদ্ভুত সত্তা নিয়ে বহির্গত হয়। এই জীবনে যে যা কর্ম করেছে, সেই কর্মের মন্থনে যে মাখন যতটুকু হ'ল, —কর্মের আলোড়নের মন্থনের সেই মাখন হুড়স ক'রে বেরিয়ে এই মহাকাশে গিয়ে রূপ নিয়ে নেয়। মৃত্যুর সময়েই তা বা'র হয়—সমাধিতেই এটা হয়। স্বপ্ন হচ্ছে অল্প সমাধি, মৃত্যু হচ্ছে চরম সমাধি। চরম সমাধিতেই চিরন্তন জাগ্রত জীবন্ত ফটো উঠে যায়। চৈতন্য বলছে—তুমি এখন শুয়ে থাক,—তুমি এখন তুমি নও, তুমি নড়বে চড়বে না এখন,—তোমার জাগ্রত জীবন্ত ফটো তুলছি। কাপড় পরে' ছিলাম এতদিন, এখন দেখছি সব ছেড়ে দিয়ে নূতন দেহ নিয়ে যাচ্ছি।—এই হ'ল আত্মার রূপ।

আত্মার মৃত্যু নাই,—মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুটা মৃত্যু নয়, এটাও একরকম জন্ম। যখন জন্ম হয় তখন যেমন হুঁস থাকে না, মৃত্যুর সময়ও তেমনি হুঁস থাকে না। একটা জন্ম নিম্নমুখী, আর একটা জন্ম ঊর্ধ্বমুখী। দুটোই জন্ম। এখানে যেটাকে মৃত্যু বলা হয়, সেটা তবে কি?—যেমন আমি যদি পিসীমার বাড়ীতে যাই, তখন আমাকে কেউ ডাকতে এলে পিসীমা বলবেন—ও তো এইমাত্র এলো। আবার মামীমার বাড়ীতে গেলে সেখানেও কেউ ডাকতে এলে মামীমা বলবেন—ও তো এই মাত্র এলো। যেখানেই যাই, সবাই বলবে—ও তো এইমাত্র এলো। সব জায়গাতে 'এলো'ই বলবে। আমি যে-বাড়ী থেকে গেলাম, সেখানে খোঁজ করলে বলবে—তিনি এখানে নেই, মাসীমার বাড়ী গেছেন এবং সেখানে আছেন। তা হ'লে আমি আছি এক জায়গায় না- এক জায়গায়। গর্ভে যখন তোমরা ছিলে, তখন কূর্ম

আকারে ছিলে। এই 'ছিলে' কথা যখন আছে, তখনি প্রাণ আছে বুঝতে হবে। আবার গর্ভে যখন ছিলে, তার আগে নিশ্চয় কোথাও ছিলে, তারও আগে অন্য কোথাও ছিলে। না থাকলে এলে কি করে? যার প্রাণ থাকে, সে-ই আসতে পারে এবং যেতে পারে। প্রাণবিহীন হলে যেতে-আসতে পারে না। তাই যখন মৃত্যু হয়, তখনও প্রাণ থাকে। তাই সেটা মৃত্যু নয়। যখনই প্রাণ চলে যাচ্ছে, তখন তোমরা যেমন বলছ—তিনি নাই, সেই রকম আর এক জায়গাতে আর একজন বলছে—ও তো এইমাত্র এলো। তাহ'লে মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু নাই—ওটা কেবল নামেই আছে। প্রাণ কখনও মরে না, ছোলন বদলায় মাত্র। সাপ যেমন তার পুরান ছোলন বদলায়, তেমনি আত্মা ছোলন বদলায়।

মৃত্যু নামে আমরা ডুবুরী হয়ে মহাতৃপ্তির পথে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি—এই মহান মৃত্যুর মহাসাগরে আমরা ডুবুরী হয়ে ডুব দিয়ে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি? ক্রমশঃ ক্রমশঃ অন্য অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক করার জন্য, মিশবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। মিশতে গেলে কি করতে হবে? তখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঠিক এই ফুলের মতন—গাছ হ'ল, পাতা হ'ল, ডাল-পালা হ'ল—শেষে ফুল হ'ল, আবার শুকিয়ে গেল। প্রত্যেক জিনিসই এই রকম ফুটছে, আবার শুকিয়ে যাচ্ছে। আত্মা তার ছোলন বদলিয়ে যে বিষয়বস্তুর দ্বারা দেহ তৈরী, সেই লম্বায় চলে যায়। আগুন যখন ধরে, তখন একটা খড়ের কুটো থেকে আরম্ভ করে শেষে কাপড়ে ধরে। তারপর অগ্রসর হ'তে হ'তে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ীঘর, তারপর রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত ধরে। ধরতে ধরতে যায়; যে জল বাতাস আগুন মাটি দিয়ে এই দেহ তৈরী, সেই সত্তায় তখন মিশতে থাকে। দেহ থেকে যেটা আরও সূক্ষ্ম, যা দিয়ে দেহ তৈরী সেই বিষয়বস্তুর সহজ পথে চলে যাচ্ছে।—আকাশ-বাতাস-জল, —তাতে মিশছে—সেই শক্তিতে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার পর কি হ'ল? শরীরটা এখানে পড়ে রইল—এটার আর বোধ-ভাষ্য কিছু নাই, বোধশক্তিটা তখন আত্মস্থ হয়ে নির্বাণ নির্বিকল্প হয়ে রয়েছে। কেন রয়েছে? এদিককার অবস্থাটাকে বাতিল করবার জন্য।

এইভাবে মহান পথে অগ্রসর হতে হতে তাঁরা নির্বাণ-নির্বিকল্প হন, ভগবান হন।

প্রশ্ন ৬। মৃত্যুর পর দেহ যখন শ্মশানে নিয়ে যায়, যার দেহ, সে দেখতে পায় কি করে? এবং সে কথাই-বা বলে কি করে? আর কখনো কখনো যে মৃত আত্মা দেখা যায়, তাই-বা কি করে?

উত্তর ঃ— অজস্র অজস্র অণু-পরমাণু দিয়ে দেহ তৈরী। সব অণুতেই 'আমি' আছে। মৃত্যুর পর জলের অণু জলে যায়, তাপের অণু তাপে যায়—সব অণু-পরমাণু ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যেমন জল আর বরফ— দুটোই জল, অথচ পার্থক্য আছে। জল ছড়িয়ে আছে, আর সেই জলেই বরফ ভাসছে। সেই রকম অণু-পরমাণু সব জলের মতন ছড়িয়ে যায়, আর প্রত্যেক অণু-পরমাণুর ইচ্ছাশক্তি বরফ আকারে এক জায়গায় জমাট হ'য়ে রূপ নিয়ে এই জলবৎ অণুর মধ্যে ভাসতে থাকে। সেই ইচ্ছাশক্তির রূপটাই দেখে এবং কথা বলে। আর কখনো কখনো যে মৃত আত্মা দেখা যায়, সে ঐ রূপটাকেই দেখা যায়।

প্রশ্ন ৭। এখানে সাধু-সন্ন্যাসীরা বলেন—কাম ত্যাগ না ক'রলে ভগবান দর্শন হয় না। এটা কি সত্যি?

উত্তর ঃ— কাম কখনো ত্যাগ হয় না। সর্ব অঙ্গে কাম, তৃপ্তিটাই কাম। লিঙ্গ শুধু মূত্রের দ্বারই নয়,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এ সবই লিঙ্গ। এ সবের তৃপ্তিই হ'চ্ছে কাম। চক্ষু দেখে তৃপ্তি পাচ্ছে, মানে—চক্ষু দেখে সঙ্গম করছে। কান শুনে তৃপ্তি পাচ্ছে, মানে—কান শুনে সঙ্গম করছে। নাসিকা ঘ্রাণে তৃপ্তি পাচ্ছে, মানে—নাসিকা ঘ্রাণে সঙ্গম করছে। জিহ্বা স্বাদে তৃপ্তি পাচ্ছে, মানে—জিহ্বা স্বাদে সঙ্গম করছে। তেমনি ত্বক স্পর্শে সঙ্গম করছে। সুতরাং কাম কখনও ত্যাগ হয় না। ভগবান ব'লছেন— আমি তোমাদের সর্ব অঙ্গে কাম ভরে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি; কাম যদি ত্যাগ করতে হয়, তবে আমি কেন তোমাদের দেহের ভিতর এত কাম ভরে দিলাম? এই ইন্দ্রিয়গুলোর কোন কিছুই বর্জনের নেই। ইন্দ্রিয় হ'চ্ছে বিশ্বের সুরের সাহায্যকারী। ত্যাগ তোমাদের কিছু করতে হবে না, শুধু সমসুরে বাঁধ। সেটাই হ'লো তোমাদের কাজ। ইন্দ্রিয়ের কোন বর্জন নেই। এখানকার কোন কার্যকলাপে আধ্যাত্মিকের কোন কিছুই আটকায় না। শুধু আটকায় কোনটায় জান? তোমার মনের সত্তার সঙ্গে তোমার নিজের সত্তাকে যদি বিভিন্ন কর, তবেই আটকায়। তোমার মধ্যে একটা সত্তা আছে, সেই সত্তা প্রতি মুহূর্তে ইঙ্গিত দিচ্ছে। তার নির্দেশমত তুমি চলবে, অর্থাৎ তোমার মনের নির্দেশমত তুমি চলবে। ঐ মনই হ'লো গুরু।

তৃপ্তিটাই হ'লো সঙ্গম। জিহ্বা, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু—এই সবের তৃপ্তিতে সঙ্গম হ'য়ে যাচ্ছে। এসব না থাকলে ভগবানের স্বাদ পেতে না। চক্ষু বুঁজে যে ভগবানকে ডাকছে—হে ভগবান! দয়া কর—এতেই তার কাম হয়ে যাচ্ছে। ভগবানকে ডেকে যে তৃপ্তি, তাও কামতৃপ্তি। কাম-ক্রোধ-মায়া-মোহ—এগুলো হ'লো যন্ত্রের জিনিস,—এর জন্যে ভাববে না।

ত্যাগ কিছুই করতে হবে না। যেখানে সৃষ্টিতে কোন কমবেশী নেই,—দেখ, গরম দেশে কুকুরের গায়ে লোম নেই, আর শীতের দেশে কুকুরের গা লোমে একেবারে ঢাকা; যেখানে সৃষ্টির এমন সুন্দর দান,—সেখানে তোমাদের ছাড়াছাড়ির কি আছে! কাম-ক্রোধ-মায়া-মোহ—এসব তো দেবতাই দিয়ে দিয়েছে,—যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তাইই দিয়েছে। বেদ বলেছে—তোমাদের ভরপুর করে দিলাম। এখানে ছাড়াছাড়ির কিছু নেই।

আমাদের ভিতরে যে হা-হুতাশ,—এটা হ'চ্ছে চক্রের একটা প্রভাব। কোন্ চক্রের প্রভাব? আমাদের জীবনটা শুধু সেই ভিত্তি, যেটার নাম দিয়েছে চক্র—তার উপরে সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি স্তরে স্তরে সেই ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আমাদের জীবনের গতি প্রবাহিত হ'চ্ছে এবং সেই গতির এক এক অবস্থায় যা কিছু হ'চ্ছে—রোগ, শোক, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং আরও অনেক কিছু—সেগুলি আমাদের চক্রের ক্ষমতা ছাড়া নয়—তা চক্রেরই বিকাশ—স্তরেরই বিকাশ। সেগুলি কি চক্রছাড়া? একই বাগানে এক ফুলের গন্ধ সহ্য করা যায় না, আবার আরেক ফুলের গন্ধে তন্ময় হ'তে হয়। যে ফুলের গন্ধে নাক বন্ধ করে হাঁটতে হয়, সেই ফুলটি কি ফুল নয়? সে ফুল কি ঐ বাগান-ছাড়া?

তেমনি এই দেহের বাগানের মধ্যে যখন কাম, লোভ, হায়-হুতাশ চলতে থাকে, সেগুলো কি এই দেহ-কানন ছাড়া? সেগুলো কি এই দেহেরই বস্তু নয়? সেগুলো কি স্তরের বিকাশ নয়? নালা-নর্দমার জল,—কিন্তু জল তো ঠিকই। সে জল কি কোন কাজেই লাগে না? সেই জল কি অপবিত্র? সেই জল কি ফেলে দেওয়ার? সেই যে নর্দমার জল বয়ে যায়, বয়ে গিয়ে কি হয়? সাগরের জলে গাছ হয় না, বা নর্দমার জলেও তেষ্টা মেটে না ঠিক। কিন্তু আবার সাগরের জলে গাছও হয়, আবার নর্দমার জলে ফুলও ফোটে। সুতরাং সেই যে নর্দমার জল—ক্লেদ-পঙ্কিলতা—সেগুলো কি করে? সমস্ত চক্রের স্তরে স্তরে, ভিত্তিতে ভিত্তিতে এক মহাশক্তির জাগরণের সাহায্য করে, সহযোগিতা করে। মাখনে তাপ হয় না, ঘিয়েতেও তাপ হয় না— আলো ফুটে ওঠে না;কিন্তু সেই নর্দমার জল যখন একাকার হয়ে, একত্রিত হয়ে এক জায়গায় জমা হয়, সেখানে বহুদিন থাকার পর দেখা যায় তার মধ্যে গ্যাস হয়ে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে, আর তার থেকে কি অদ্ভুত আলোর বিকাশ হয়!—নর্দমার জলে এত আলো! তাহলে দেখা যাচ্ছে, সৃষ্টির ভিতরে যাকে তুমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর, যাকে অবহেলা কর—সেই অবহেলার বস্তু এই চক্রের কোনোটাতেই নেই। কোন বিষয়বস্তুকে তুমি ফেলতে পারবে না। কারণ বাগানে যেই ফুলের উৎকট গন্ধ, বাতাস সেই উৎকটকে টেনে নিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে;যেই ফলে বিষ, সেই ফল থেকে বিষ শুষে নিয়ে অনেক কিছুকে বাঁচিয়ে রাখছে, শোধন করছে। এই রকম বহু পাতা, বহু ফল, বহু গাছ, বহু কিছু টেনে টেনে জীবনের সব কিছুকে শোধন করে এক বিরাট সত্য অভিজ্ঞতার মাঝে নিয়ে যায়। তাই আমাদের ভিতরে যেই পঙ্কিলতা-কদর্যতা যা কিছু আছে—গ্যাসকে বার করে দেওয়ার জন্য যেমন উপর দিয়ে পাইপ দেওয়া হয়,—আমাদের চিন্তার ভিতর দিয়ে, সব কিছুর ভিতর দিয়ে ঐ নর্দমার মত, গ্যাসের মত, ধোঁয়ার মত তা বা'র হয়ে যাচ্ছে। এই বেরিয়ে যাওয়ার নালা আছে বলেই জীবনের স্রোত ক্রমশঃ বিরাটের দিকে যাচ্ছে এবং এগুলোর প্রয়োজন যথেষ্টই রয়েছে। কারণ সমস্ত জীবনের চক্রগুলি—মূলাধার থেকে সহস্রারের ভিত্তিগুলিকে সজাগ করে দেওয়ার ভিত্তিই হচ্ছে এইগুলি।

তোমরা যখন খেতে বস, পাতে লাউ-কুমড়ো এনে দিলে সেই লাউ-কুমড়োকে যদি জিজ্ঞাসা কর—তোমরা কি খেয়ে বেঁচে আছ, তখন তারা ঐ ডাষ্টবিনের ড্রামটা দেখিয়ে বলবে—আমরা ঐ ময়লা খেয়ে বেঁচে আছি, ঐ ময়লাই আমাদের খাবার। শুনে তোমরা বলবে—সে কি! ঐ ময়লা তোমাদের খাবার? তারা বলবে—ঐ ময়লা না খেলে আমরা বাঁচতুম না, ঐ খেয়েই আমাদের সজীবতা এসেছে। কিন্তু ঐ ময়লা তোমরা খেতে পারবে না। তাই বলছে—ঐটায় দুর্গন্ধ বটে, কিন্তু বিশ্বের নিয়মের মধ্যে ওকে ছেড়ে দাও,—দেখবে, আপনমনে লতায় পাতায় লতিয়ে লতিয়ে এসে ঐ ময়লা থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার সুর, তার খাদ্য। এটা কিসের জন্য? একদিকে যেমন লাউ-কুমড়ো আমাদের খাদ্য হিসাবে খাচ্ছি, আরেক দিকে ডাস্টবিনের নোংরা লাউ-কুমড়োরা খাচ্ছে। আমাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা চেয়ে দেখ—বিশ্বের সৃষ্টিতে খারাপ বলে কোন কিছু নেই। অথচ খারাপ নাম নিয়ে বসে আছে ওরা। নাম নিয়েছে খারাপ, কিন্তু

তার থেকে মধুময়, অতি মধুময়ের সৃষ্টি হচ্ছে,—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রারের সমন্বয় শক্তি প্রস্ফুটিত হ'চ্ছে ঐ সমস্ত নর্দমার ধারা থেকে।

তোমাদের ভিতর দিয়ে মহাশক্তির বর্ণনা ক'রছে। যেখানে সূর্য উদ্ভাসিত হচ্ছে, সেই সূর্যে মহাক্লেদ,—মহাক্লেদের পরিবৃত্তে রয়েছে সূর্য। সেই মহাধাতু—গলিত ধাতু—পচা ধাতুগুলো একত্রিত গলিত হয়ে অনর্গল টগ্‌বগের মাঝে জগৎকে সৃষ্টি করছে এবং অপরূপ রূপের মাধ্যমে সবাইকে টেনে নিয়ে জ্ঞান এবং আলোর পথে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সূর্যের ভিতরে গলা পচা ধাতু অনর্গল টগ্‌বগ্ ক'রছে—ধড়াস্ ধড়াস্ করছে মহাশক্তির তেজে।

মূলাধার থেকে সহস্রারের সমন্বয় শক্তি এইভাবে দাউ দাউ করে জ্বলছে,—তোমাদের ভিতরে ক্লেদ-পঙ্কিলতা মহাধাতুর গলিত পরিবেশ। সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ—সর্ব অবস্থায় তোমরা গলিত ধাতুর মত সেইভাবে এসেছ। তোমাদের চিন্তাধারা আজ্ঞা-প্রজ্ঞার বিকাশ—জ্ঞানচক্রের বিকাশ। সেইখানেই মনশক্তির বিকাশ এবং সেইখানেই সূর্য উদ্ভাসিত হ'চ্ছে—সেই জ্ঞান-শক্তিতেই তোমাদের সূর্য উদ্ভাসিত হচ্ছে, তার বিকশিত রূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। যে গলিত ধাতুর মধ্যে তোমরা রয়েছ, তার মধ্যেই এক একটি মহাসূর্যের মতন তেজরশ্মিময় হয়ে তোমরা আপন মনে রয়েছ। তোমাদের চিন্তাধারার প্রবাহে সূর্যের শক্তির মত তোমাদের শক্তি বিরাজমান। তোমাদের হবেই—তোমাদের হ'তে বাধ্য। শুধু সব সময় সমসুরে বেঁধে রাখবে—মাত্রাছাড়া হবে না।

প্রশ্ন ৮। এখানকার কথা হ'ল—সন্ন্যাস না নিলে ধর্ম হয় না। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ— সন্ন্যাস নেবার প্রয়োজন নেই—তোমরা জন্ম-সন্ন্যাসী। যেদিন জন্ম নিয়েছ, সেইদিনই সন্ন্যাসের খাতায় নাম লিখে দিয়েছ। ত্যাগ করে করে তোমরা শ্মশানের দিকে অগ্রসর হচ্ছ। ভোগ বলে যেটা মনে হয়, সেটা ভোগ নয়। মাছ-মাংস-ফল-দুধ-তরিতরকারি খেয়ে কি বেঁচে থাকার দিকে যাচ্ছ, না শ্মশানের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছ?—যা খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না, তা ভোগ নয়—সেটা ত্যাগই। তাই, তোমরা মহাত্যাগী।—ত্যাগ করে করে যাচ্ছ। যেমন জি. টি রোড্, বি. টি. রোড্, গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড্—সেই রকম তোমরা ভোগের রোড্ ধ'রে ধ'রে শ্মশানের দিকে যাচ্ছ। অবশেষে নিজের যে দেহ, তাও ত্যাগ করে চলে যাবে। কাজেই আলাদা সন্ন্যাসের প্রয়োজন কি? আলাদা করে আর কিছু ছাড়তে হয় না ছাড়া জিনিসের মধ্যে যা যা আছে তা সবই ছাড়া, ওর আর জোড়া নেই। তোমরা এখানে কেউ ভোগ করতে আসনি। পৃথিবীতে কেউই ভোগ করতে আসেনি, সব ছেড়ে দিতেই এসেছে। ভোগ বলে যেটা মনে হয়, সেটা ভোগ নয়। তবে সেটা কি? ঐ যেমন রাস্তা—বি. টি. রোড্, জি. টি. রোড্—সেই রকম এটা ভোগের রোড্ ধরে সবাই ত্যাগ করে করে যাচ্ছে। আমাদের রাস্তা কি?—রাস্তা হচ্ছে ভোগের।—গন্তব্য স্থান হ'চ্ছে শ্মশান। শেষ—শ্মশান। সুতরাং ছাড়া আবার কি? আমাদের ষ্টেশন হ'ল শ্মশান—শ্মশানের জন্য আমাদের টিকিট কাটা, সেখানে আর ভোগ কোথায়? তাই আমাদের ত্যাগ করার কিছুই নেই, ইন্দ্রিয়কে সাথী করে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি—খাল ধরে' বিলে—বিল ধরে' নদীতে,—নদী ধরে' সাগরে।

যা নিয়ে তোমাদের দেহ তৈরী, সেটা ছাড়বে কেমন করে? ছাড়া কিছুই যায় না। এমনিতেই তো ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছ,—যখন শিশু ছিলে, তারপর যৌবনে এলে,—শিশু অবস্থায় তো আর যেতে পারবে না!—সেটা ছেড়ে দিলে। যৌবন থেকে যখন বৃদ্ধ হলে, তখনও আর যৌবনে যেতে পারবে না—সেটাও ছেড়ে দিলে, অবশেষে বৃদ্ধ থেকে একদিন শ্মশানে গেলে,—গিয়ে দেহটাকেও ছেড়ে দিলে। এমনি করে' ছাড়তে ছাড়তেই তো যাচ্ছ!

নতুন করে কেউ তৈরী করে না। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ—তার মধ্য দিয়েই তোমাদের কাজ হবে। ত্যাগী হ'য়েই তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ। তোমাদের প্রত্যেকেরই হবে। আমরা সকলেই ভোগের রাস্তা দিয়ে ত্যাগ করতে করতে অগ্রসর হ'চ্ছি। যাকে ভোগ বলা হয়—সেটা ভোগ নয়। এই যে আমরা এত খাচ্ছি, খেয়ে তো মড়ার যাত্রিক হচ্ছি! যে জিনিস খেলে লয় ক্ষয় হয়ে যায়, তাকে কি বাঁচা বলে? খেয়ে যখন মড়ার যাত্রিক আমরা, তখন কোন খাওয়াই খাওয়া নয়, এ সবই হচ্ছে মড়ার খাওয়া। শ্মশানে যেমন মুখে জল দেয়, সেই শ্মশানের খাওয়াই আমরা খাচ্ছি। সুতরাং এই ভোগ ভোগ নয়। যাত্রিক হিসাবেই এর যতটুকু দাম। জায়গা মতন যতক্ষণ না যাই, ততক্ষণই এই ভোগ। এখানকার তৃপ্তি ক্ষণস্থায়ী, সেটা তৃপ্তি নয়। দেহের যে কোন বৃত্তির নিবৃত্তি সাময়িক ভাবে দাদের চুলকানির মত। তবে আনন্দ কোথায়? যোগ কোথায়? তৃপ্তি কোথায়?—যেটা চিরকাল থাকবে, সেইটাই আনন্দ। একজন দেখতে তোমার মায়ের মতন; তাকে দেখিয়ে যদি বলি—ঐ যে তোমার মা,—তা তুমি বলবে—আমার মা কোথায়? নিজের গর্ভধারিণী মাকে না পাওয়া পর্যন্ত বলবে—আমার মা কোথায়? তাই যতদিন সেই মহাতৃপ্তির সঙ্গে মিলতে না পারছ, ততদিন এই ঘূর্ণির ছকের মাঝে ঘুরতে হবে।

অঙ্ক ক'ষছ, কিন্তু পূরণ আর মিলছে না—'এক'টা বাদ দিয়ে গেছ। পাঁচ পাঁচ দশ—ঠিকই অঙ্ক ক'রছ, মেলাতে মেলাতে লণ্ডন পর্যন্ত গেছ, কিন্তু তবু মিলছে না। হাতের 'এক'টা বাদ দিয়ে গেছ যে! তেমনি আমরা সবই করছি, কিন্তু হাতের 'এক'টা বাদ দিয়ে। এই মহাগণিতের অঙ্ক আমাদের মহাতিথিতে মিলতে হবে। আজ যে তিথি নক্ষত্র বা'র করেছে, তা' সব অঙ্ক কষে' কষে'। জীবনে চলার পথে গণ্তির মাঝ দিয়েই সব কিছু হচ্ছে। আমাদের চিন্তাধারার সাথে এই গণ্তি যদি মিলাতে পারি, তবেই সব মিলবে। এই মানচিত্র থেকে নিজেকে জান—এটাই সাধনা, এটাই জ্ঞান, এটাই ধ্যান।

জনৈকের প্রশ্ন ঃ—সাধনা আমরা কি ক'রব?

উত্তর ঃ—এর আগে বলেছি—তিনিই সাধনা করিয়ে নিচ্ছেন, তাঁর বুদ্ধিতে তিনি সবাইকে সাধনা করিয়ে নিচ্ছেন। আপনিই সাধনা হ'য়ে যাচ্ছে; তাঁর দেওয়া সেই বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে তোমরা সেইভাবে কাজ করে যাও। মনে রেখো—সমমাত্রার সুরকেই ব্রহ্মচর্য বলে।

প্রশ্ন ৯। শব্দধ্বনির তত্ত্ব কি? মন্ত্রকে কেন আশ্রয় করে?

উত্তর ঃ— এই বিশ্বে—এই শূন্যময় জগতে অবিরাম একটা ধ্বনি বয়ে যাচ্ছে। এই ধ্বনি ব্যথায়, বেদনায়, কান্নায়—সবের মধ্যেই আছে। দে[illegible] বিশ্বের শিশুরা 'ওঁয়া-ওঁয়া'

করে কাঁদে; প্রসবের সময় 'উঃ-উঃ' করে,—সব শব্দ যেন ঐ একটি মাত্র শব্দের ভিতরে আশ্রয় ; 'ওঃ-ওঃ-ওঃ'—এর মধ্যে যেন সব শব্দ বিশ্রাম নেয়। মন্ত্রকে আমরা কেন আশ্রয় করলাম? ব্যথায়, বেদনায়, প্রসবে, মৃত্যুতে সেই 'ওঁ-ওঁ' হুঙ্কারের ধ্বনি—নাদের ধ্বনি আছে। সৃষ্টির মূলে হ'চ্ছে ব্যথা। সেই ব্যথা না হ'লে সুপ্রসব হয় না। সেই ব্যথার সুরটা কেমন?—'উঃ-উঃ'। ঐ 'উঃ-উঃ' ধ্বনিতে প্রণবের সুর আছে। তবে কেন আমাদের হবে না?

মৃত্যুর সময় কিসের ধ্বনি শোনা যায়? কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর সময় কোন কবিতা বলেন নি, সব কবিতা তখন শেষ হয়ে গেছে। মণিপুর শেষ হয়ে কবি যখন অনাহতে এলেন, তখন কি ব'লছেন? ওঁঃ-ওঁঃ-ওঁঃ। আজ্ঞাচক্রে এসে প্রকৃতির নিজস্ব যে সুর, যে শাশ্বত নাম, তার ভিতরে জন্মগত সুর যেটা আছে, সেই সুর জেগে উঠল—ওঁঃ-ওঁঃ-ওঁঃ। তখন সবাই বলছে—কবির শ্বাস উঠে গেছে। সেই খবর শুনে সকলে কান্নকাটি শুরু করল।

সেই হুঙ্কার-ধ্বনি—নাদধ্বনি কি করলেন? ওই একটি মাত্র শব্দ, তাই নিয়ে অনন্ত কোটি গ্রহ-উপগ্রহ—অনন্ত কোটি পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। ঐ শব্দ কোথাকার? ঐ শব্দ হ'চ্ছে প্রকৃতি প্রদত্ত মন্ত্র—গুম্ গুম্ ধ্বনি। বিরাটের ধ্বনি ঐ একটি মাত্র শব্দ।

হাটবাজারের ধ্বনি দূর থেকে শোনা যায়—গুম্গুম্ শব্দ ; ভিতরে গেলে দেখা যায়—তেজপাতা দাও, লঙ্কা দাও—কেনা-বেচার কথা সবাই ব'লছে। ঐ খণ্ড খণ্ড সুর একত্রিত হয়ে এক অখণ্ড সুর বইতে থাকে—গুম্ গুম্ গুম্। জাহাজ, প্লেন, ট্রেন—সবই একটি ধ্বনিকে আশ্রয় ক'রে, অবলম্বন ক'রে যাচ্ছে। তেমনি অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে কেবল ঐ একটি মাত্র ধ্বনিকে অবলম্বন করে।

একটি মাত্র শব্দ, যেটা এই দেহবীণাযন্ত্রে রয়েছে, যে সুরে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, সেই সুর এই আকাশে অবিরাম বয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ১০। মনে খারাপ চিন্তা আসে কেন?

উত্তর ঃ—এ জগতে কিছুই খারাপ নয়। তোমার কাছে যেটা খারাপ, সেটা আমার কাছে ভাল। তোমার কাছে নর্দমা খারাপ; কিন্তু মশা-মাছি, তারা ঐ নর্দমার জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে। আবার তোমাদের কাছে যেটা ভাল, সেটা তাদের কাছে খারাপ। তোমরা ঘরে ধূপধূনা দাও, আতর ছিটাও ; বল—সামনে নর্দমা, সেখান থেকে কি দুর্গন্ধ আসছে! আবার নর্দমার জীব যারা, তারা বলবে—এই ঘরে মানুষগুলো কি সব গন্ধ ছিটিয়েছে, তার গন্ধে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম।

খারাপ যদি না থাকে তবে ভাল থাকবে কেমন করে? মন হ'ল ব্যাপ্ত—সে চিন্তা ছাড়া থাকতে পারে না, সে সকলকে নির্বাণে নিয়ে যেতে চায়। উড়ো বস্তু দিয়েই মন তৈরী, তাই মন সব সময় উড়ে বেড়ায়। তোমাদের কাছে মন যতটুকু থাকার, ততটুকু ঠিকই থাকে।

তোমরা মনে করছ—এবার আর অন্য দিকে মন দেব না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখবে—মন আবার কোথায় ছুটে চলে গেছে। একটি পয়সা একলাখ-টাকা ছাড়া নয়। কাজেই একটি পয়সারও দাম আছে। তাই ছোট ছোট চিন্তা না থাকলে বড় চিন্তা আসবে

কি করে? আবার দেখ—দুধে কত মাখন আছে, কিন্তু দুধ কি কখনো নিজে এসে তোমাদের কাছে মাখন পৌঁছিয়ে দেয়? তোমরা দুধের মধ্যে যন্ত্র বসিয়ে ঘ্যাট্‌ ঘ্যাট্‌ করে দুধের উপর আলোড়ন কর, তবেই তো তার থেকে সুন্দর জিনিস—মাখন পাও। আবার দেখ—কাপড়ের কলে মাকু চলে ;মাকু কেমন অবিরত দু'দিক থেকে দুটো চলছে, দেখলে অবাক হয়ে যাবে। এই মাকুর আলোড়নেই অমন সুন্দর ঠাস-বোনা কাপড় তৈরী হ'চ্ছে। তেমনি মনের আলোড়ন আছে বলেই মন ভাল-মন্দ ভাববে। তা না হ'লে ভালটা পাবে কি করে? মনের কাজ মন করুক না! জপ ক'রতে বসেছ—মন হয়ত বেয়াই-বাড়ী চলে গেছে, শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে, ঘাটে-মাঠে চলে গেছে। যাক্‌ না,—ও ওর কাজ করুক, আর তুমি তোমার কাজ কর। তুমি মনের লেজ ধরে থাকবে, যেখানে মন যায়, তুমিও মনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই গিয়ে জপ করবে। তোমার জপ তুমি বন্ধ ক'রো না, তুমিও বেয়াই-বাড়ী, শ্বশুর-বাড়ী, ঘাটে-মাঠে মনের সঙ্গে গিয়ে জপ করবে। মন যখন দেখবে— ও তো আমার পিছন ছাড়ে না, তখন সে নিজেই তোমার বশীভূত হবে।

এই প্রকৃতিতে কিছুই খারাপ নয়। খারাপের থেকেই ভালর উদ্ভব। একটি শিশু যখন জন্ম নেয়, তখন কত ক্লেদের মধ্য থেকে তার জন্ম! কত ক্লেদ তার গায়ে নিয়ে সে জন্মায়। তখন তাকে কেউ চুমু দিতে পারে কি? কিন্তু দেখ— অত ক্লেদ থেকে কি সুন্দর শিশু এল!

তোমরা সবসময় জপ করে যাবে। মন তার গতিতে যেখানে খুশি যাক, যা খুশি তা ভাবুক—সেদিকে তোমরা খেয়াল ক'রো না। তোমাদের কাজ হ'ল জপ করা।

বৃত্তির নিবৃত্তিতে জগৎ সৃষ্টি। সব যদি ছাড়, তবে থাকলটা কি? সব ছাড়লে সৃষ্টি হয় না, কাজেই সব ছাড়া যায় না। খালে-বিলে পানা জমাট বেঁধে থাকে, তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়;নদীতে পানা এখানে-সেখানে দু'একটা দেখা যায়; আর সাগরে গেলে সব পানা একেবারে মিলিয়ে যায়। কাজেই তোমাদের মনে পানার মত যেটা আসে, সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ হলে সেটা এমনিতেই ছেড়ে যাবে।

প্রশ্ন ১১। চক্র কি?

উত্তর ঃ— অ আ ই ঈ—বাংলায় ছত্রিশটা অক্ষর আছে, আর ইংরাজীতে A B C D — এই চব্বিশটা অক্ষর আছে; এই অক্ষরগুলি দিয়েই কবি হয়, সাহিত্যিক হয়। তেমনি শরীরে সাতটা চক্র আছে—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার। এই সাতটা চক্রে মন রেখে চক্রজয় করলেই সব কাজ হ'য়ে গেল।

আবার দেখ—সা-রে-গা-মা ক'রে ক'রে মানুষ গান শিখে ওস্তাদ হয়। আলাউদ্দীন সা সা ক'রে ক'রে আজ এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ হ'য়েছে। সপ্তসুর হ'চ্ছে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা—যেটা যন্ত্রে রয়েছে। যন্ত্রের এই সা-রে-গা-মা সাধলেই সুরজ্ঞ হ'য়ে যায়। আমাদের দেহবীণাযন্ত্রেও ঠিক এইরকম সপ্তসুর আছে—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এবং সহস্রার। এইগুলি ঐ সঙ্গীতের সা-রে-গা-মার মতন দেহের যন্ত্রের সা-রে-গা-মা-। ইংরাজীতে ছাব্বিশটি আর বাংলায় ছত্রিশটি অক্ষর দিয়েই বড় বড় কবি-সাহিত্যিক হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ সৃষ্টি হয়েছে ঐ অক্ষরের মাধ্যমে। এই অক্ষর শিশুরা যখন চর্চা ক'রত, তখন

তারা এর অর্থ জানত না। কিন্তু চর্চা ক'রতেই সেই শিশুরা পরে বড় বড় কবি-সাহিত্যিক হয়ে গেছে। তেমনি যাঁরা দেহের যন্ত্রের এই সা-রে-গা-মার সুর সাধনা করেছেন, তাঁরাই ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছেন। সুর হ'চ্ছে ব্রহ্ম, সুর হ'চ্ছে নাদ, সুর হ'চ্ছে ধ্বনি। সেই সুরধ্বনি আমাদের মূলাধারের মূলগ্রন্থি হ'তে সহস্রার পর্যন্ত যদি বাজাই, তবে কেন আমরা ওস্তাদ হব না, কেন আমরা সুরজ্ঞ হব না, ব্রহ্মজ্ঞ হব না? ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াটা কল্পনার জগৎ নয়। বাস্তবে যাঁরা গায়ক-কবি-সাহিত্যিক হয়েছেন, তাঁরা সুর ভেঁজে ভেঁজেই হয়েছেন। তাঁরা সাধনা ক'রতেন, রেওয়াজ ক'রতেন,—তাই তাঁদের জেগে উঠেছে। আমাদেরও দেহবীণার সপ্তচক্র চর্চা ক'রলে বেজে উঠবে, জেগে উঠবে সত্যিকারের ধ্বনি এবং তখন আপনিই স্ফুরণ হবে। মেঘের গর্জন না হ'লে বৃষ্টি হয় না। গুরুগম্ভীর গর্জনের নিনাদে যে আলোকপাত হয়, সেই শব্দই হ'চ্ছে ধ্বনি। এই মন্ত্র হ'চ্ছে শব্দ, মন্ত্র হ'চ্ছে ভাষা—ভাষা হ'চ্ছে মন্ত্র,—যে যেভাবেই ব্যবহার করুক। আমরা যদি মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত এই দেহবীণাযন্ত্রকে সুরে সুরে বাজাই, নিশ্চয়ই ঝঙ্কারিত হয়ে উঠবে। এখানে অন্য কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। এই দেহ-হারমোনিয়ামের উদারা-মুদারা-তারা যদি বাজাই, তবেই জাগবে এবং ফুটবে। এই মূল-সুর হ'চ্ছে অনন্ত লক্ষ লক্ষ সুরের একত্রিত সুর। এর অর্থ যখন খুঁজে বা'র ক'রল, তখন দেখা গেল—এই সুরের ভিতর অনন্ত খণ্ড খণ্ড কথা। অনন্ত খণ্ড খণ্ড কথার অনন্ত পৃথিবী বা'র হ'চ্ছে। যেমন অনন্ত বৃষ্টিপাতের কথাতে অনন্ত মহাসাগর সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি অনন্ত কোটি কোটি অণুপরমাণুর কণায় কণায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুর সৃষ্টি হ'য়েছে, জগতে ধ্বনির সৃষ্টি হ'য়েছে। মূলাধারে আমাদের সেই শব্দ। সেই শব্দ উচ্চারণ ক'রলে জাগবে অনিবার্য।

কবি-সাহিত্যিক হ'তে গেলে যেমন বাংলার ছত্রিশটা আর ইংরাজীতে ছাব্বিশটা অক্ষরকে সাধনা ক'রতে হয়, গান শিখতে গেলে যেমন সা-রে-গা-মা এই সাতটা পর্দা সাধতে হয়, তেমনি অন্তর্জগতেও সাধার জন্য সাতটা পর্দা আছে। এইগুলিকেই চক্র বলে। এই সাতটা চক্র হ'ল অন্তর্জগতের ভাষা। অন্তর্জগতের ভাষা জানতে হ'লে এই সাতটা পর্দাকে রেওয়াজ করতে হবে, তবেই সেই সুরকে জানা যাবে। সেই সুর এই দেহবীণাতেই রয়েছে। এই দেহ-হারমোনিয়ামটা বাজাও,—তবেই অন্তর্জগতের সুরের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অতি সহজেই পেয়ে যাবে।

প্রশ্ন ১২। ওঁ শব্দ স্ত্রী-বাচক না পুরুষ-বাচক?

উত্তর ঃ— ওঁ শব্দ হ'ল একটা মিশ্রিত শব্দ। মনে কর দূরে হাট বসেছে, তুমি গুম্ গুম্ ধ্বনি শুনছ। সেই হাটে মেয়েরাও জিনিস কিনছে, ছেলেরাও জিনিস কিনছে। যারা বিক্রি করছে, তাদের মধ্যে ছেলেরাও আছে, মেয়েরাও আছে। যারা কিনছে—তারাও কথা ব'লছে, যারা বিক্রি করছে—তারাও কথা বলছে। তুমি দূর থেকে সেইসব কথা—কে কি কথা বলছে তা কি বুঝতে পারবে? বুঝতে পারবে না; কেবল গুম্ গুম্ আওয়াজ শুনতে পাবে। ঐ গুম্ গুম্ আওয়াজ তো সব কথাগুলি মিলিয়েই হয়। কিন্তু হাটের মধ্যে গেলে শুনতে পাবে—কেউ বলছে 'তেজপাতা দেন', কেউ বলছে 'লঙ্কা দেন', কেউ বলছে 'চাল দেন'।

ঐ যে গুম্ গুম্ শুনছিলে, ওর মধ্যে কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শব্দ মেশান ছিল। এখন ঐ শব্দকে যদি খুঁজতে যাও, তবে স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই পাবে। ওঁ শব্দটা হ'চ্ছে সমস্ত মহাকাশের মিলিত একটা শব্দ। ঐ শব্দটা খুঁজলে দেখা যাবে, তাতে সব কথাগুলো আছে—সমস্ত পৃথিবী আছে, সমস্ত সূর্য আছে, সমস্ত আকাশ আছে—এই একটা শব্দে আছে। এই শব্দটা অনেক কষ্টে বা'র করেছে। বা'র করার পর তাতে এই পৃথিবীর শব্দ শুনতে পেয়েছে, অন্য পৃথিবীর শব্দ শুনতে পেয়েছে—পৃথিবীর লোকের শব্দও শুনতে পেয়েছে। প্লেন চলে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ ক'রে, ট্রেন চলে আওয়াজ ক'রে। সব কিছুই ঐ একটি মাত্র শব্দকে অবলম্বন ক'রে চলে। খুঁজে খুঁজে দেখল, এই অনুস্বার-বিসর্গ-চন্দ্রবিন্দু দিয়েই বেশীর ভাগ শব্দগুলো—যেমন হুং হাং কাং ....এই রকম। তখন খুঁজতে খুঁজতে এই শব্দটাকে একেবারে মনের ভিতরে ফটোগ্রাফি করে, রেকর্ড করে এনে আটকিয়েছে। আটকিয়ে এইটা সবাইকে ইন্‌জেক্ট ক'রে দিতে আরম্ভ ক'রেছে। দেখনা, টিকা যে দেয়, তা ঘোড়ার pox-এর বীজ নিয়ে তোমার মধ্যে ঢোকাচ্ছে, অর্থাৎ এক germ ঢুকিয়ে আর এক germ-কে আটকায়। তেমনি ঐ যে বিশ্বের pox টুকুন, শব্দটুকুন নিয়ে এসেছে, এসে কি করেছে? ইন্‌জেক্ট করতে আরম্ভ করেছে। ঘোড়ার pox যেমন তোমার দেহে একটু কেটে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, সেই রকম ঐ বিশ্বের শব্দটা কানের মধ্যে ইন্‌জেক্ট করে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। খ্যাচ্ করে দিয়ে দেয়, দিয়েই পাঞ্চ করে দেয়। পাঞ্চ করলেই ঐ শব্দটা সাঁ-আ-আ করে দেহের সত্তার সঙ্গে মিশে যায়। দেখ তো, হোমিওপ্যাথি তিন খানা বড়ি, খুঁজলে তাকে পাওয়া যায় না, ওষুধের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না; কিন্তু অসাধারণ উপকার ঐ ক্ষুদ্র বড়িতে! হোমিওপ্যাথি ওষুধ—যত তাকে dilute করবে, তত তার ক্ষমতা বেড়ে যাবে; এটা atomic action। বোতল ভর্তি সিরাপ খেলে যা না হয়, এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি ওষুধে আশ্চর্যজনক উপকার পাওয়া যায়। তাহ'লে দেখ, এতটুকু ওষুধের কত ক্ষমতা! সূক্ষ্ম শক্তির কত বড় ক্ষমতা! আর এই মহাকাশে মহাশক্তির ধ্বনি, যেই ধ্বনি থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হ'য়েছে, এই পৃথিবীগুলো বা'র হ'য়ে আসছে, যেমন হুং করে বার হ'ল, হুং হুং করে বার হ'ল, গুর্ গুর্ গুর্ করে বা'র হ'ল, ঐ শব্দটা এখানকার মহান্ মহান্ ঋষিরা টোকাইয়া বা'র করে নিয়ে এলো। ঐ একটা শব্দ দিয়ে এই যে কানের ফুটাটা, এই ফুটার মধ্যে হুস্ করে দিয়ে দিল। কানে গেলেই ওটা করে কি, হোমিওপ্যাথি ওষুধের মত কাজ করতে থাকে। ওটা যত dilute করবে, তত উপকার। তাই তোমরা কি করবে? ঐ শব্দটা—যেটা গুরু দিয়েছেন, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক রেওয়াজ করবে। রেওয়াজ করলেই বেজে উঠবে, জেগে উঠবে। ঐ শব্দ হ'চ্ছে ম্যাগনেটিক পাওয়ার। চুম্বকত্বটা হ'ল ঐ শব্দ, চুম্বকত্ব হ'ল ঐ ধ্বনি। বুঝতে পেরেছ?

প্রশ্ন ১৩। মন্ত্রের শক্তি কি?

উত্তর ঃ— ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না দিয়ে ত্রিশূল করেছে। কপালের বামে-ডানে ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ী, মাঝখানে সুষুম্না নাড়ী। ত্রিশূলের মূল গ্রন্থটা কোথায়? মূলে মূলাধারে করেছে বিদ্ধ, মূল বিদ্ধ করেছে। মূল থেকে সৃষ্টি হ'চ্ছে, উদ্ভব হ'চ্ছে, হ'য়ে সহস্রারে গিয়ে স্ফুরণ হয়ে

কলি আকারে ফুটছে। ত্রিশূলের মাথায় কলি আকারে আছে, তার নীচে অর্দ্ধচন্দ্রের মত চলে গেছে ইড়া-পিঙ্গলা। তিনটা ধারা, তিন ধারায় গিয়ে একটায় মিলিত হ'চ্ছে ত্রিশূল। এই যে ত্রিশূল, এই ত্রিশূল রয়েছে আমাদের হৃদয়ে। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, তিন ধারাতে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়ে যে সুরটা বা'র হয়েছে, ত্রিশূলের মধ্য দিয়ে সেটা কি করেছে? সজাগ করে দিয়েছে। এই যে ত্রি-নয়ন, দুই নয়ন ইড়া-পিঙ্গলা আর কপালের মাঝখানে এক নয়ন সুষুম্না, এই ত্রি-নয়ন ত্রিশূলের মত ত্রি-নয়নকে ভেদ করেছে। এই ত্রি-নয়ন হ'চ্ছে সূক্ষ্মানুভূতি। অনেক জীব আছে—যেমন সর্প, তার কান নেই, কানে শোনে না। কিন্তু কিভাবে সে শোনে? তার জিহ্বাতে কানের কাজ করে, জিহ্বা দিয়ে সে শোনে। তাই সর্প বার বার জিহ্বা বা'র করে। সর্পের জিহ্বা ত্রিশূলের মত দেখতে, সেই জিহ্বা বা'র করলেই সর্প শুনতে পায়। আমাদের ক্ষেত্রে কি হ'চ্ছে? এই ত্রি-নয়নের সুরটা কি রকম? সর্পাকারে, মানে বাহির থেকে সে শোনে না বা দেখে না। তৃতীয় নয়ন যেটা, সেটা ভিতরে থাকে, কিন্তু তার এমন জিহ্বা আছে, যা দিয়ে সে শুনতেও পায়, দেখতেও পায়। কথাটা বুঝতে পেরেছ? আমাদের যে ত্রি-নয়ন— তার একটা নয়ন, তৃতীয় যেটা, সেই নয়ন সুপ্ত অবস্থায়, ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে। সেই নয়ন কি করে জাগে? কোন্ অবস্থায় জাগে? যখন সে সজাগ হয়, কি ভাবে সজাগ হয়?—সে সজাগ হয় ধ্বনিতে।—কোন্ ধ্বনিতে? এমনি চিৎকারে নয়। সেই ধ্বনিটা তবে কিসের? সে ধ্বনি হচ্ছে মননধ্বনি—মনে মনে স্মরণ করলে যে ধ্বনি হয়, শব্দ হয়। মনের মধ্য দিয়ে যেই ধ্বনি হয়, সেই ধ্বনিতে সুপ্ত নয়ন জাগ্রত হয়। সেই সুপ্ত ধ্বনিটা কিরকম? কিসে কিসে সেটা জাগে? জাগে প্রণব-মন্ত্রে।—মানে, মূল-মন্ত্রে জাগে। মূল সুর যখন তোমার ভিতরে অবিরাম স্মরণ কর এবং মূল-মন্ত্র অনর্গল মনে মনে উচ্চারণ করে যাও, ঐধ্বনিতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সেই চক্ষুর দরজা আপনি খুলতে থাকে। সেই জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়ে সাক্ষ্য দেয়—আমি এই এই কারণের জন্য এতদিন খুলতে পারিনি। সেই দরজা খোলাই হচ্ছে—সেই দণ্ড, সেই ত্রিশূলের তিন নয়নের এক নয়ন প্রস্ফুটিত হওয়া। সেটা শিবের ছিল, পার্বতীর ছিল, বিষ্ণুর ছিল। সেই নয়নটা আপনি খুলে তখন বেশ দাঁড়ায়। সেই নয়নটা ত্রিশূলে ভেদ করে। সর্ব অবস্থার মধ্যে ত্রিশূল রয়েছে—এই শিরা-উপশিরার মধ্যে ত্রিশূল রয়েছে। সর্ব অবস্থায় যদি সেই নামে থাক, তবে আপনি স্ফুরণ হবে। মনন-শক্তিতে সেই শক্তিটা যখন স্মরণ করে, তখনি জাগে।

ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না দ্বার। শ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে যে প্রাণায়াম-কুম্ভক করে, তা আর কিছু নয়, সেই মহাদ্বারের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে, আর দ্বারী দ্বার রক্ষা করছে। পথিক যারা, তারা সেই দ্বার দিয়ে যাবে। দ্বারী তাদের দরজা খুলে দিচ্ছে। ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না—এরা দ্বারী। তোমরা সেই দ্বারের দ্বারীকে যদি তার বিষয়বস্তু না দাও, তবে সে দ্বার খুলবে না। দ্বারী চায়—শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম, কিন্তু আমরা তাকে দেই শুধু নস্যি। এই তো অবস্থা এখানকার!

ঘুমিয়ে যে নাক ডাকে তিন-চার ঘন্টা করে, সেই নাক যদি জেগে থেকে ইচ্ছা করে ডাকাও, তবে নাক দিয়ে রক্ত বা'র হবে। অথচ ঘুমের মধ্যে নাকের ডাক তিন-চার ঘন্টা

চলছে—তাতে নাকে কোন ব্যথা নেই। এই ঘুমন্ত অবস্থা হ'ল সমাধি অবস্থা। তখন সেই শব্দে বিশ্বের দরজা খুলে যায়। দেখা যাচ্ছে—এর কোন মাহাত্ম্য আছে।—কি মাহাত্ম্য? এক জিনিস দিয়ে অপর জিনিসকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। সেই নাক ডাকার শব্দকে যদি তোমার জাগ্রত অবস্থায় নিয়ে আসতে পার, তবে কি হবে জান? ব্রহ্ম সব সময় শিষে থাকে—সমস্ত শিরা-উপশিরা সব সময় শিষ দিচ্ছে। ঐ ধ্বনিটাকে আনার জন্যই ধ্বনি। যদি ঐ ধ্বনিটাকে তোমরা ধরে রাখতে পার, তখন ফট্-ফট্ করে ফাটতে আরম্ভ করবে। যদি জাগ্রত অবস্থায় উক্ত সমাধিকে আয়ত্ত করে নিষ্ঠার সঙ্গে জপ কর, তবে ঐ সুর তোমায় এগিয়ে নিয়ে যাবে। যে নাদকে অবলম্বন করে, যে ধ্বনিকে অবলম্বন করে এই জগতের রূপ সৃষ্টি হয়েছে, সেই মন্ত্রকে সম্বল করে আমরা যদি অগ্রসর হই, তবে সত্যিকারের আনন্দময় ধাম যেখানে, সে জায়গা খুঁজে পাব।

তোমরা প্রত্যেকে নামের ভিতরে, মন্ত্রের ভিতরে, জপের ভিতরে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, মন বসুক বা না বসুক, বিক্ষিপ্ত চিত্ত নিয়ে, চিত্তচাঞ্চল্য নিয়ে, অস্থির মন নিয়ে যদি ডুবে যাও—যদি নাম করে যাও, অবিরাম অনর্গল জপ করে যাও, সেই নামের যে ফল—জপের যে বিরাট শক্তি, সেই বিশ্ব বিরাটের ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভরপুর করে দেবে।—এইটাই হ'ল বিশ্ব-প্রকৃতির শব্দ-ধ্বনির নিয়ম। যারা অ-আ ক-খ পড়ে, সেই শিশুরা জানে না—কি করে পড়তে পড়তে বিরাট কবি হয়, সাহিত্যিক হয়, লেখক হয়। কিন্তু সেই সুর নিয়েই, সেই শব্দ নিয়েই, সেই শক্তি নিয়েই তো সেই শিশু একদিন কবি-সাহিত্যিক হয়। তাই আমরাও সেই অনন্ত বিশ্বের কাছে শিশু। শিশু যেমন চঞ্চল মন নিয়েই অ-আ ক-খ পড়ে, আমরাও তেমনি বিরাটের কাছে শিশু, আমরাও চঞ্চল মন নিয়ে, অস্থির মন নিয়ে মন্ত্র সেধে যাব, জপ করে যাব। মনের মধ্যে পানার মতন যা খুশি তা ভেসে আসুক, তাতে ভাববার কিছু নেই, মন খারাপ করবার কিছু নেই, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তোমরা শুধু একটাই কাজ করবে—সূর্য যেমন শত ঝড় আসুক, শত মেঘ আসুক, উঠতেও ছাড়ে না, ডুবতেও ছাড়ে না, তার যেমন বিশ্রাম নেই, তোমরাও সেইরকম জপ করতে, নাম করতে বিশ্রাম নেবে না। শিশু যেমন চঞ্চল চিত্ত নিয়েও অ-আ শব্দ নিয়ে কবি সাহিত্যিক হয়, তেমনি তোমার চঞ্চল চিত্ত নিয়েও সেই অনন্তশক্তির সুরজ্ঞ হতে পার এবং যেই কোন মুহূর্তে, যেই কোন অবস্থায়, যেই কোন ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করতে পারে, দেবদর্শন করতে পারে, মুহূর্তে মানুষ সর্বশক্তির অধিকার নিয়ে বসতে পারে। ভগবান বলছেন, প্রকৃতি বলছেন—এমন একটা মহাসুরের সাড়ার যন্ত্র (দেহযন্ত্র) তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে আমি সঁপে দিয়েছি। এর দ্বারা তোমরা কি পেতে পার? আমি যে যন্ত্র তোমাদের সবার হাতে সঁপে দিয়েছি, এই দেহ-যন্ত্র দেহ-তরীকে বহন করে তোমরা অণিমা-লঘিমা, মহাকাশ-মহালোক, সর্বত্র বিরাজ করতে পার, যে কোন জায়গায় যাতায়াত করতে পার। অনন্ত গতির একমাত্র গতি এই দেহ-যন্ত্র। এই দেহ-যন্ত্র বড় সাংঘাতিক। এই যন্ত্রে সর্বত্র যাওয়া যায়—এই যন্ত্রে যাওয়া যায় মহালোকে। এই যন্ত্রটাই সঁপে দিয়েছি তোমাদের হাতে।

দিন তো চলে যাচ্ছে। দেহ-তরীটা যেন নষ্ট না হয়ে যায়। এটা কিন্তু এখানকার রেশনব্যাগ বা শুধু প্রেমভালবাসার জন্য নয়—এটা একটা মহাকাশের পাত্র, এটা মহাপাত্রের পাত্র। এই পাত্র দিয়ে তোমরা গতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে, গতির সাথে সাথে যেতে পারবে। সবার ভেতরেই সেই শক্তি আছে— সেই শক্তিকে বাড়াতে হবে। তোমাদের শক্তি জমাট বেঁধে আছে। জলও যা, বরফও তা। কিন্তু জলের মতন বরফ গড়িয়ে যেতে পারে না—জমাট বেঁধে আছে বলে। তাপ দিলে সেই বরফ গলে জল হয়ে যায়। তাই তোমাদের সেই যে শক্তি জমাট বেঁধে আছে, তাপ পেলে সেই শক্তি গলে যাবে। তখন দেখবে—কি অসীম শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে! এই তাপ হ'ল জপ। যত জপ করবে, তত শক্তি বাড়তে থাকবে।

ধ্বনি হ'তে জগৎ সৃষ্টি। তোমরা যে এসেছ—ধ্বনি হ'তেই এসেছ। দেখ, সব কিছু দুয়ের মিলন ছাড়া হয় না। তোমাদের সুরের মাত্রা যখন বিরাটের সুরে মিলবে, তখনি স্ফুরণ হবে।

মন্ত্রের ঐ ধ্বনিটা কেন মহাসুরের সঙ্গে একযোগে মিশে যায়? দেখ, আফ্রিকার জঙ্গলে যারা ঘোরে, এক-এক জন এক-এক দিকে চলে যায়; তাদের বা'র করার জন্য একটা শব্দ করে—হো-ও-ও-ও—। সেই শব্দ শুনে দূর থেকে সবাই চলে আসে, সবাই একজায়গায় হয়ে যায়। তোমাদের এমনি একটা ধ্বনি আছে; মনের মধ্যে যা কিছু হ'য়ে যাক, তাতে ক্ষতি নেই, তোমরা ঐ ধ্বনিতে ডুবে থাক। ঐ ধ্বনি অতি ছোট্ট কথা, কিন্তু তাতে মহাশাস্ত্রের বোল আছে। এই নাম যদি এক সঙ্গে বহুজনে করা যায়, পাঁচ হাজার ব্যক্তি যদি এক সঙ্গে 'ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর' করে যায়, সেই শব্দের ধ্বনি যার কানে যায় তার এক সঙ্গে পাঁচ হাজার নাম হয়ে যাচ্ছে। এক লক্ষ জপ করতে প্রায় ছয় ঘন্টা লাগে, আর এই নাম যদি হাজার হাজার জনে এক সঙ্গে করে যায় এবং সেই শব্দের ধ্বনি যদি কানে শুনা যায়, তবে তার লক্ষ নাম এক মুহূর্তে হয়ে যায়। এমন সুন্দর ফল যে, গাছপালা পর্যন্ত ভরপুর হয়ে যায়। দৈনন্দিন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, নাম যদি প্রবল থাকে, শব্দ যদি তার থেকে বেশী থাকে, গভীর থাকে, তবে সেই ত্রুটিগুলো বিনাশ হয়ে যায়। সদাসর্বদা জপ করলেও হয়, আবার নাম-কির্তনেও হয়। ঐ বীজ মন্ত্র জপ করলেই সব সহজ হ'য়ে যায়। নাম আর বীজ—দুটোর মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই, দুটো একই—ধান আর চাল। ধান পুতলে গাছ হয়, আর চাল পুতলে গাছ হয় না; চাল না হ'লে চলে না, আবার ধান না পুতলে ঐ চাল পাওয়া যায় না। নাম হচ্ছে—ঐ চালের মতন কাজ হয়। ধান যদি থাকে, তবেই চাল পাওয়া যায়। বীজ পুতে যে কোন নাম করবে, সেইটাই সফল হয়।

সকলের শরীরের মধ্যে অজস্র অণু-পরমাণু আছে—তাদের আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে, বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে। তারা কি করছে? তুমি যেই নাম করছ—তারাও সেই নামের সঙ্গে সঙ্গে সুর দিচ্ছে। পৃথিবীতে যতগুলো জীব আছে, এই শরীরে—সকলের শরীরে ততগুলো জীব আছে; তারাও ভগবানকে ডাকে, তারাও মুক্তির কামনা করে। এই

দেহ পঞ্চভূতে গড়া, এর ভিতরে অগণিত আত্মা আছে। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে চৈতন্য আছে, বুদ্ধি আছে। তুমি যখন আপন মনে জপ করছ, নাম করছ, তখন তোমার সাথে সাথে তোমার দেহের জীবগুলো তোমার সুরে সুর দিতে আরম্ভ করল। যেমন চুম্বকের ঘর্ষণে, স্পর্শে স্পর্শে লোহা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি দেহের জীবগুলো সেই সুরের সঙ্গে যখন ধ্বনিত হয়, তখন ঐ জীবগুলোও ধ্বনিময় হয়ে যায়। তখন জীবকণিকাগুলো সুরে সুরময় হয়ে যায়। তাদের নিজেদের মধ্যে তখন আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তোমার আর তাদের মধ্যে তখন নামের ঢেউ বইতে থাকে। সেই তরঙ্গের ঢেউ তোমাকে এসে ধাক্কা দেবে; ধাক্কা দিলেই,— তুমি হয়ত শুয়ে ঘুমিয়ে আছ, জেগে দেখছ— কি অপরূপ রূপ তোমার সামনে ভেসে উঠেছে। কেন ভেসে উঠেছে? দেখ, সিনেমার রীল থাকে পিছনে— সিনেমা তো সামনে থাকে না, সামনে থাকে পর্দাটা। আলোর বন্যাতে ঐ রীলের ছবি সামনের পর্দায় ফেলে দেয়। তেমনি তোমার ভিতরে চিত্রের মতন নামের বন্যা বইতে থাকে। নামের বন্যার সাথে সাথে রূপের বন্যাও বইতে থাকে। সেই রূপ সামনে গিয়ে প্রতিফলিত হয়—শূন্যে প্রতিফলিত হয়। শূন্যে যেই সেই রূপ ভেসে ওঠে, অমনি তুমি দেখতে পাও—তোমার চিন্তার মূর্তি শিব-বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন অপরূপ রূপ নিয়ে। এই রূপ কোথা থেকে এল? বাঃ—আসবে না কেন? একটা গাছ—তার থেকে ফুল হয়, ফল হয়, বীজ হয়। এতটুকু বীজের মধ্যে যে এতবড় গাছ থাকে, তা দেখলে তো বুঝা যায় না! বীজটা ফুটলে দেখা যায়, কত বড় গাছ এর ভিতরে ছিল—রূপ নিয়ে বেরিয়ে এল। তেমনি এই নামের সুরের মধ্যে, ধ্বনির মধ্যে, আলোর মধ্যে যে এত সুর রয়েছে, তা ওপর থেকে বুঝা যায় না। এই যে তোমরা রয়েছ, জীবজগৎ রয়েছে—এটা কিসের রূপ? এটা আলোরই একটা রূপ, কারণ এই রূপের মধ্যে আলো রয়েছে, বাতাস রয়েছে, জল রয়েছে বলেই তা জমাট বেঁধে এই রূপ তৈরী হয়েছে। প্রকারান্তরে এই রূপ আলোরই রূপ, তেজেরই রূপ। তেজের রূপ যদি এগুলো হতে পারে, তবে সেই তেজের রূপ কেন আলাদা করে, বিরাট হয়ে সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে না? বীজ-শক্তি কেন এত বড়? বীজ হ'চ্ছে এত বড় যে, সেই বীজ-ধ্বনি একটাতে অজস্র হয়ে যায়। তার জন্যই মন্ত্র-ধ্বনি। সেই অনন্ত মহাশক্তির ধ্বনি তুমি যদি অনর্গল অবিরাম স্মরণে আন, সেইভাবেই ফুটে উঠবে—সেইভাবেই জেগে উঠবে।

মধুকর গুন্ গুন্ শব্দ করে উড়ে যায়, সেই শব্দ শুনে দেশের বাড়ীতে থালা, কুলা, কাঁসর, ঘন্টা সব বাজায়, তাতে সেই বাজনার শব্দ শুনে মধুকরগুলো এসে সেখানে বসে পড়ে ও চাক বাঁধে। ঠিক তেমনি এই দেহের মধুকরগুলিও এমন একটা ধ্বনি চায়, যেই ধ্বনিতে ওরা সেই ধ্বনির সঙ্গে মিশে যাবে। ঐ ধ্বনিটাই হচ্ছে মন্ত্র। মন্ত্রের এত প্রভাব কেন? কাঁসরের শব্দ, ঘন্টার শব্দ শুনে যেমন ঐ মধুকরেরা এসে বসে, তেমনি তুমি যদি সেই ধ্বনিকে জাগাও যা বেজে উঠবে শঙ্খধ্বনির মতন, বেজে উঠবে মহানাদে, তখন এই দেহের মধুকরগুলোও জেগে উঠবে, উঠে সেই ধ্বনির সঙ্গে গিয়ে লীন হবে। সেই খানেই বিরাট গড়ে উঠবে—বুঝলে?

খাদ্য যেমন গলাধঃকরণ করলে আপনা থেকে রক্ত-মাংস বীর্যে পরিণত হয়, তেমনি মন্ত্র বার-বার উচ্চারণ করে যাও। সব অবস্থায় যদি সেই সুরটাকে অবিরাম অনর্গল উচ্চারণ করে যাও, তাহ'লে সিদ্ধি-মুক্তি-নির্বাণের জন্য আলাদা করে আর চিন্তা করতে হবে না। এটাই হ'ল ল (law)। বলছে— বাল্যশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে এম, এ, পাশ করতে যত পরিশ্রম হয়, তার চেয়ে আধ্যাত্মিক জগতে কম পরিশ্রম করলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। বাস্তবে একটা মটরের ইঞ্জিনিয়ারিং শেখায় বা ডাক্তারি শেখায় যত পরিশ্রম, তার চেয়ে কম পরিশ্রমে ভগবদ্‌প্রেম আয়ত্ত করা যায়। তবে কেন সহজে সকলের হয় না? হয় না কেন জান? প্রথমতঃ, বেরস ঘিয়ের বড়া একটার বেশী কেউ খায় না, আর পেঁয়াজের বড়া পঁচিশ-ত্রিশটা খেয়ে ফেলছে, কারণ ঐটাতে স্বাদ বেশী পাচ্ছে। ঘিয়ের বড়াতে মুখ মেরে নেয়, বেশী খাওয়া যায় না। একটা খেলেই বলে—আর না। ভগবানের প্রেমটা হ'ল কি—ওটা বেরসের মতন, প্রথম প্রথম স্বাদ পায় না, ভাল লাগে না—রস-কস কিচ্ছু নেই, একেবারে যাচ্ছেতাই। ভগবদ্ কাজটা হ'চ্ছে কি—এটার রস প্রথমে পায় না। এটার অন্য কোন স্বাদ নেই যে, হঠাৎ সামনা-সামনি একটা কিছু দেখে আনন্দ পাবে। যেমন লেখাপড়ার দিকে প্রথমে কেউ স্বাদ পায় না, আবার গান যারা শেখে, তারাও প্রথম প্রথম সা-সা রে-রে চর্চা ক'রতে ক'রতে স্বাদ পায় না, তারপর আস্তে আস্তে অদ্ভুত আনন্দ পেতে থাকে। ভগবদ্ দর্শনের জন্যও অমনি চর্চা ক'রতে ক'রতেই আনন্দ লাভ হয়—দর্শন মেলে।

সর্বদা নাম ক'রবে, জপ ক'রবে। দিন তো ফুরিয়ে যাচ্ছে, বৃথা সময় নষ্ট না ক'রে জপ ক'রে যাও।—পারের কড়ি দরকার;বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে—কড়ি ছাড়া যাবে কেন? মনটা সব সময় বেরিয়ে যাচ্ছে,—বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই শেষ হ'য়ে যাচ্ছে। এটা অণু অবস্থায় সব সময় ফোয়ারার মতন বেরিয়ে যাচ্ছে—মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও বেরিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ১৪। শরীরটা মনের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ মানুষ যখন বড় হয়, তার ওয়েট্ তো বাড়ে?

উত্তর ঃ— বাড়ছে কোথায়? এই যে বাড়াটা, এটা তো বাড়া নয়! এটার তো অফুরন্ত ওয়েট্। যেটা বাড়ছে বলে বলছ, সেটা বাড়া কি কমা, সেটা প্রশ্ন নয়। অফুরন্ত ওয়েট নিয়ে চলছে সে। আড়াই মণ অণু-পরমাণুকে ওজন ক'রতে গেলে সমস্ত বিশ্বের ওজন বেরিয়ে যাবে। ওজনটা একমণ দুইমণ তিনমণ হ'লে কি হবে, কমতির দিকে যাচ্ছে তো—এটা তো পরিবর্তন হ'য়ে যাচ্ছে। লয়-ক্ষয়টা হ'চ্ছে ব্যবহারিক ভাষা। আড়াই মণই যাক আর ছয় মণই যাক, সেই মনের পরে কিছু নয়। মনের তো অফুরন্ত ওয়েট—সমস্ত বস্তু দিয়ে এটা তৈরী কিনা! ফুটলে এটা সাংঘাতিক। এতটুকু বটের বিচি—সেই বিচির ওজন তো এক ছটাকও হবে না। অথচ এই বিচি ফুটলে কত বড় হয়ে যায়,—পুতলে এর ওজন ধরবে? আমি তো বলব—বটের বিচিটার চার শত মণ ওজন। শুধু চারশত মণ বললেও শেষ করা যায় না। একটা বীজ চারশত মণ ওজন নিয়ে বেরিয়ে গেল গিয়ে; অতবড় একটা হাতী, যে রক্তের কণাতে ছিল—দুইশত মণ ওজন নিয়ে বেরিয়ে গেল। সুতারাং আমি কণা দেখব, অণু দেখব। অণু-শক্তির ওজন আর অনন্ত শক্তির ওজন এক।

প্রশ্ন ১৫। মন আর জ্ঞানের ভিতর পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ— মন আর জ্ঞান হচ্ছে—জল আর বরফ। জলে আর বরফে যে পার্থক্য—মন আর জ্ঞানেও তাই—শুধু নামের পার্থক্য। যেখানে মন, সেইখানেই জ্ঞান; যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই মন। মনটা মনন করছে, জ্ঞানটা স্ফুরণ করছে। বীজ থেকে ফুল পর্যন্ত যেইরকম, সেইরকমই মন থেকে জ্ঞান পরিস্ফুটিত হচ্ছে। একটা ফুল ফুটছে—অর্থাৎ মনের অঙ্কুর থেকে বীজ থেকে জ্ঞানের বিকাশ হ'চ্ছে। তাহ'লে মনটাই বড় হয়ে গেল, বীজ হয়ে গেল। কর্ম ছাড়া মন নয়; কর্ম হ'চ্ছে পথ-পদ্ধতি। পথ-পদ্ধতি দিয়েই মন। মনন করতে হ'লেই খনন করতে হবে। খননটা কর্মের মধ্যে চলে গেল,—জল বা'র হ'ল।

প্রশ্ন ১৬। কোন কিছু ধ্যান করায়, মূর্তি চিন্তা করায় সেই মূর্তি সামনে দেখা যায় কিভাবে?

উত্তর ঃ— মনে কর, তোমরা সূর্য চিন্তা করছ, সূর্য লাল হয়ে উদয় হ'চ্ছে—এই চিন্তা করছ; সেই সূর্য সামনে দেখা যায় কি করে? শরীরের যে কোন জায়গার এক্স-রে করলে সেই অঙ্গের ভিতরকার সব জিনিস প্লেটে উঠে গেল। কেন উঠে গেল?—'রে'র জন্য,—'রে' আছে বলেই সম্ভব হ'ল। যখন তোমাদের ফটো তোলা হয়, তোমরা তো দূরে এক জায়গায় বসে থাক, কিন্তু ঠিক অবিকল তোমাদের দেহ ছবি হয়ে প্লেটে উঠে গেল। এটা কেন হয়? এটাও ঐ 'রে'র জন্য। যে লেন্স দিয়ে তোমাদের দেহের ছবি প্লেটের ভিতর টেনে নিয়ে গেল, সেই লেন্সে 'রে'র শক্তি আছে বলেই সম্ভব হ'ল।

তোমরা সিনেমা দেখ, সামনে একটা সাদা পর্দা থাকে—সেই পর্দার দিকে তাকিয়ে থাক। কিন্তু সেই পর্দায় কিছুই থাকে না; যত কারিকুরি, যত কারসাজি, সব তোমার পিছনে, একটা ঘরে মেশিনে তার কাজ হয়ে যাচ্ছে। যদি বল, পয়সা দিয়ে সিনেমা দেখব, সামনে তাকাব কেন, পিছনে যেখানে যন্ত্র আছে সেই দিকে তাকাব, তাহলে তো হবে না! সামনেই তোমার তাকাতে হবে। সবই 'রে'র খেলা। তোমাদের ভিতরেও সূর্য আছে, তাই তোমাদের ভিতরে 'রে' আছে। যদি অবিরত সূর্য চিন্তা কর, সূর্য কিন্তু তার ঠিক জায়গাতেই থাকবে, চিন্তা করার দরুণ তোমার ভিতরকার 'রে', তুমি যা চিন্তা করছ, সেই চিন্তার মূর্তিতে গিয়ে পৌঁছায়। তখন ধীরে ধীরে ঐ মূর্তিকে 'রে' টেনে নিয়ে আসে। তবে 'রে'টা ঠিকমত লাগানো চাই।

মন চিন্তা ছাড়া থাকতে পারে না। তোমরা যা-যা চিন্তা ক'রছ, তা অতি সহজভাবেই ক'রে যাচ্ছ। তার কারণ, তোমরা জল হাতে নিয়ে সেই জল যখন ঢাল, তখন সে জল নীচের দিকেই পড়ে যায়, অনায়াসে পড়ে যায়। সব চিন্তা নিম্নগামী বলেই অনায়াসে তোমাদের মনে চিন্তা করে যাচ্ছে। ধর কাম-চিন্তা, এটা কেন হ'চ্ছে? তোমাদের সঙ্গে আর প্রকৃতির সঙ্গে সকলে এক যোগাযোগে আছ, তাই এটা সম্ভব হ'চ্ছে। চিন্তার দ্বারা শরীরের ভিতর রসের সৃষ্টি হয়, তাই চিন্তা ভাল লাগে। প্রকৃতির ভিতর কাম আছে বলেই সেই কামই তোমাদের কাম করিয়ে নিচ্ছে। এখন মনে কর, তুমি সূর্য চিন্তা করবে, এটা হ'ল উর্দ্ধগামী চিন্তা। জল যদি উপর দিকে ছুড়ে দাও, সে জল উপরে থাকতে চায় না, নীচে পড়ে

যায়। তাই তোমরা সূর্য চিন্তা করতে বসলে, সূর্য চিন্তাটা ঊর্দ্ধগামী চিন্তা কিনা এবং ঊর্দ্ধে থাকতে চায় না, তাই বেশীক্ষণ তোমাদের ভাল লাগে না। ভাবো—দূর ছাই, কি আর চিন্তা ক'রব? একটা সূর্য লাল হ'য়ে উঠছে, এ আর কতক্ষণ চিন্তা ক'রব? এটাতে রস-কষ কিছুই পাচ্ছি না, কি হবে চিন্তা করে?

কাম শুধু একটাই নয়, কাম সর্ব অঙ্গে। ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ—সবই কাম। যেটাতে তৃপ্তি, সেটাই কাম। তোমরা সূর্য চিন্তা ক'রতে ক'রতে চিন্তা যখন স্বাভাবিকভাবেই ঊর্দ্ধগামী হয়ে যাবে, তখন সূর্যের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ হয়ে যাবে, তখন তোমাদের মনের 'রে' চিন্তার সূর্যের গায়ে ঠিক মতন লেগে যাবে। তখন সঙ্গম অবস্থা হবে, তোমাদের শরীরে রসের সৃষ্টি হবে। তখন তোমরা আনন্দ পাবে সূর্য-চিন্তাতে, সূর্য যখন তোমাদের চক্ষের সামনে এসে দেখা দেবে। ঠিক সূর্য যে আসে তা নয়, যেমন মানুষের ফটো তোলা হয়, 'রে'র টানে লেন্সের ভিতর দিয়ে তার আকৃতি চলে যায়, সেই রকম তোমাদের মনের 'রে'র টানে সূর্যের আকৃতি তোমদের কাছে চলে যায়। এই 'রে' তোমাদের দ্বিদলচক্রেতে ফেলবে, অর্থাৎ তোমরা সূর্যচিন্তা করবে দুই ভুর মাঝখানের জায়গাতে। এটা হ'ল সিনেমার মতন, মাথার পিছনেই যত কারিকুরি, যত যন্ত্রের কাজ। দ্বিদলে মন রেখে সূর্য চিন্তা করবে, আর সামনে দেখতে পাবে—তোমার কাছে ধীরে ধীরে সূর্য উদয় হয়ে অস্ত গেল। কয়েক মিনিটেই তুমি উদয়-অস্ত দেখে নিলে, যেমন সিনেমাতে দুই-তিন ঘন্টার মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেখায়। তাই যে উদয়-অস্ত চব্বিশ ঘন্টায় হয়, তা তোমরা দুই-তিন মিনিটে দেখে নেবে। ঊর্দ্ধগামী চিন্তা যখন সহজ হয়ে যাবে, সূর্যের সঙ্গে যোগাযোগ হবে, তখন মনের ভিতর রসের সৃষ্টি হবে, তখনই হবে সঙ্গম অবস্থা। সেটা কি? সূর্যের আকৃতি তোমার কাছে চলে আসবে, আর তখন সে কি আনন্দ? সেটাই কাম।

সূর্য সাগর থেকে জল টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেই জল সোঁ সোঁ করে তোমার শরীরের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে জল তো প'ড়ে যায় না! তার 'রে' সে ঠিকমত লাগিয়েছে, চিন্তা তার ঊর্দ্ধগামী, সাগরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়ে গেছে; তাই চলে যেতে বাধ্য। একটা বট-বিচি পুতে দিলে, সে-ই হাজার হাজার বিচি হ'ল, তার থেকে একটা বটগাছ হ'ল। সেই বটগাছে আবার হাজার হাজার বট-বিচি হ'ল। সেই হাজার হাজার বিচি পুতে দাও, তার থেকে যে গাছ বেরবে তাতে আবার লক্ষ লক্ষ বিচি জন্মাবে। তোমাদের ভিতরে সূর্যকে চিন্তা করে সূর্যকে বুনে দাও, তখন দেখবে এক সূর্যের থেকে তোমাদের মধ্যে শত সূর্য হয়ে গেছে। আবার শত সূর্যকে তোমাদের ভিতরে বুনে দাও, তখন দেখবে তোমাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সূর্য হয়ে গেছে। এভাবেই তোমরা অসীম শক্তির সন্ধান পাবে এবং নিজেরা অসীম শক্তির অধিকারী হবে। তোমাদের মনের চঞ্চলতা থাকা সত্ত্বেও তোমরা যেটুকু সূর্য-চিন্তা করতে পার, তাতেও তোমাদের মনের 'রে' সূর্যে পৌঁছাবে, তাতেও কাজ হবে।

প্রশ্ন ১৭। বিভূতি কি এবং কি করে হয়?

উত্তর ঃ— এই যে বিভূতি, এটা কি করে হয়? মন—মনই হ'ল সব। মন জিনিসটা

কি? অতি সূক্ষ্ম একটি শক্তি হ'ল মন। পৃথিবীতে এই মনের এমন কোন স্থান নেই, যে জায়গায় সে বসতে পারে; বসতে গেলেই এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গলে চলে যায়। দেওয়ালে বসলে পঞ্চাশ হাত ফুটো মনে হবে; কাজেই অনায়াসে ওপারে চলে যাবে।

অতি সূক্ষ্ম মন—বিরাট তার ক্ষমতা, অসীম তার শক্তি! মন যদি মনন করে, তবেই সৃষ্টি হয়। এই মন থেকেই পৃথিবী। তোমাদের দেহও এই মন থেকেই তৈরী। তোমাদের এই মন জলে ছিল, বাতাসে ছিল, খাদ্যে ছিল, রক্তে ছিল, বীর্যে ছিল; পরিবর্তনে এসে এসে সেই মন দিয়ে তুমি তৈরী হ'য়েছ। তাহ'লে এই মন পরিবর্তনে ছিল এবং পরিবর্তনে ছিল যখন, তবে তার আগেও কোথাও ছিল নিশ্চয়। নিশ্চয়ই এক জায়গাতে ছিল, নতুবা এলো কি ক'রে?—কিন্তু কোথায় ছিল? ছিল এই মহাশূন্যে। এই পৃথিবী শূন্যে আছে—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র—সবই শূন্যে আছে। তাহ'লে পড়ে না কেন? পৃথিবীর মন দিয়ে সূর্যকে টেনে রেখেছে, সূর্যের মন দিয়ে পৃথিবীকে টেনে রেখেছে। সবাই সবার মন দিয়ে সবাইকে টেনে রেখেছে—বহু দূরে থেকেও এই মন দিয়ে একে অপরকে টেনে রেখেছে; নতুবা পড়ে গিয়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত, গুঁড়ো হয়ে যেত। কাজেই দেখতে পাচ্ছ—দূরে থেকেও এই মন দিয়ে কাজ করা যায়। এই মন যখন তোমার আমার আছে, তখন এই মন দিয়ে, যাকে বিভূতি বলে, সেই অসম্ভব কেন সম্ভব হবে না? মনটাকে সেইভাবে লাগাতে হবে। মনে কর রেলগাড়ীটাকে ইঞ্জিন একশত হর্সপাওয়ারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে,—এখন আমি বা তুমি যদি সেই রেলগাড়ীটাকে ঐ মন দিয়ে দেড়শত হর্স-পাওয়ারে পিছন দিকে টেনে রাখি, তবে রেলের সাধ্য কি রেল সামনে এগুবে? রেলের যে মন নিয়ে রেল এগুবে, সেই রেলের শক্তি হ'য়েছে তো আগুন-জল-বাষ্প থেকেই। তেমনি সেই আগুন, সেই জল, সেই বাষ্প আমার-তোমার ভিতরেও আছে। তবে আমি বা তুমি কেন পারব না রেলকে আটকাতে? শক্তি যখন আছে, সেই শক্তিকে বাড়াতে হবে। তোমাদের কি হ'চ্ছে?—তোমাদের শক্তিটা জমাট বেঁধে আছে।—জলও যা, বরফও তা,—কিন্তু বরফ জলের মতন গড়িয়ে যেতে পারে না, কেন না জমাট বেঁধে আছে বলে। তাপ দিলে সেই বরফ গলে আবার জল হয়। তেমনি তোমাদের জমাট-বাঁধা শক্তি তাপ পেলেই গলে' যাবে এবং তখন দেখবে—কি অসীম শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে।

মন অতি সূক্ষ্ম—এই দেহেতেই আছে। মন চায়— দেহকেও সে মন করে নেবে, মন চায়—দেহও তার মত সূক্ষ্ম হোক। দেহকে সে যদি সূক্ষ্ম করে নিতে পারে, তবে এই শরীর নিয়েই সে এই মহাশূন্যের ভিতর যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে। তাই দেখা যায়, কেহ কেহ সাধনা করে শরীরকে কিছু সূক্ষ্ম ক'রতে পারে—তাই জপ করতে করতে শূন্যে উঠে যায়। এই মন কত সুন্দর! কত শক্তি এই মনের! তোমাদের ভিতরে এই মন বসে' আছেন, এই মনই হ'ল কৃষ্ণ। তোমরা চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে—কি সুন্দর এই মন কৃষ্ণ হয়ে তোমাদের মধ্যে বসে আছেন, এই মনই কৃষ্ণ হয়ে, জ্ঞান হয়ে উপদেশ দিচ্ছেন—এইভাবে চল, এইভাবে কাজ কর,—তোমার মঙ্গল হবে। আবার এই মনই অর্জুন হ'য়ে, অজ্ঞান হ'য়ে

ব'লছে—আমি কাম-ক্রোধ-মোহের বশীভূত—অমি পারব না এই ভাবে চ'লতে। আবার মন কৃষ্ণ হয়ে বলছেন—তুমি পারবে, তোমার অসীম ক্ষমতা, তোমাকে এইভাবে চলতেই হবে। আবার মন অর্জুন হয়ে বলছে—আচ্ছা প্রভু, তুমি যখন বলছ, আমি তোমার কথামতই চ'লব।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই মন-কৃষ্ণকে দেখেছিলেন তাঁর দেহের ভিতরে বসে আছেন। তাই তিনি সেই মনকে 'কৃষ্ণ—কৃষ্ণ' বলে ডাকতেন। তারপর দেখলেন—তাঁর মন কৃষ্ণ হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; তখন তিনি বুঝলেন—নাম ছাড়া গতি নেই জীবের—সবাইকে এই নাম নেওয়াতে হবে, ঘরে ঘরে এই নাম বিলাতে হবে। মনই কৃষ্ণ, মনই গুরু। তাই গুরুর নির্দেশ নিয়ে চলবে। গুরু যে বীজমন্ত্র তোমাদের দিয়েছেন, তাই সব সময় জপ করবে। এই মন-শক্তিকে যদি আয়ত্ত করা যায়, বশে আনা যায়, তখন সে যা খুশি তাই করতে পারে। এই মন তোমাদের মধ্যে বসে আছেন। তিনি চাইছেন—তাঁকে তোমরা মুক্ত করে দাও, তিনি জন্মের ভিতরে আর থাকতে চান না। জন্ম নিলে মৃত্যু হবে; তাই তিনি চান—তোমরা সিদ্ধি-মুক্তি-নির্বাণে চলে যাও, তাঁকে মুক্ত করে দাও, আর যেন মনরূপ শক্তিকে কোন গর্ভে ঢুকতে না হয়। কিন্তু কয়জন সেই মনের কথা বোঝে? তাই তাঁকে আবার গর্ভে ঢুকতে হয়। যখন দেহ নিয়ে শ্মশানে দাহ করে, তখন সেই মন-শক্তি আছে বলেই দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়ে সেই শক্তি টেনে টেনে যার যার জায়গা মতন রেখে দিয়েছে।—কর্ণেন্দ্রিয় তার জায়গায় থেকে শুনছে, দর্শনেন্দ্রিয় তার জায়গায় থেকে দেখছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় তার জায়গায় থেকে গন্ধ নিচ্ছে। এক মুঠি ভিজা বালু মুঠি করে' ঢিল পাকানো যায়। কেন যায়? ঐ জল শক্তি হয়ে সব বালুকে টেনে তার শক্তি দিয়ে একত্রিত করে রেখেছে। জল যদি চলে যায় অর্থাৎ বালির জল যদি শুকিয়ে যায়, তাহ'লে তাকে আর মুঠির মধ্যে চেপে ঢিল তৈরি করতে পারবে না—তার শক্তি তখন চলে গেছে। তাই এই দেহ থেকে যখন মন-শক্তি চলে যায়, তখন এই দেহ ধূলার মতন ছড়িয়ে পড়ে—সমস্ত ইন্দ্রিয় ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়। মৌমাছি যখন উড়ে যায়, শূন্য চাক পড়ে থাকে।

প্রশ্ন ১৮। ঘুমের মধ্যে জপ চলতে থাকলে তার ফল কি, এবং কি করে ঘুমের মধ্যে জপটাকে নেওয়া যায়?

উত্তর ঃ— স্বপ্নটা হচ্ছে যোগ প্রক্রিয়া—যোগাযোগের একটি অতি পরম বস্তুকে লাভ করার জন্য অতি সহজ পথ। মনে কর—স্বপ্নে তোমাকে বাঘে তাড়া করল; তুমি দৌড়াচ্ছ আর ভাবছ—আমার যদি পাখা থাকতো, তবে আমি এখন উড়ে উপরে উঠে যেতাম। মনে করার সাথে সাথে তোমার পাখা হয়ে গেল, তুমি উড়ে উপরে উঠে গেলে।—স্বপ্নের মধ্যে কোন খট্‌কা থাকে না, ঐ মুহূর্তে খট্‌কার ছিদ্রটা বুজে যায়। স্বপ্নের মধ্যে যে মনটা থাকে—সেই ঘুমন্ত মনটাতে হয় কি, ঐ ভিতরের যন্ত্রটা প্রকাশ পেয়ে যায়। তার জন্যই তোমাকে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছে, ঘুমন্ত সমাধিতে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, ঐ অবস্থাতে যা মনে করবে, তাই হবে। ঘুমিয়ে থেকে স্বপ্নে যদি মনে কর—আমি জলের উপর দিয়ে হাঁটব, দেখবে—তুমি জলের উপর দিয়ে হাঁটছ আর ভাবছ—বাঃ, আমি জলের উপর দিয়ে

হাঁটছি। কিন্তু জেগেও যদি তুমি ঐ মনটা রাখতে পার, রেখে যদি পুকুরের উপর দিয়ে দৌড় দাও, তবে জলের উপর দিয়ে যেতে পারবে। ঐ স্বপ্নের মন যেমন ছিল, তেমন মনটা রাখা চাই। মনে কর স্বপ্নের অবস্থায় তোমার মন ষোল মাত্রায় ছিল; জেগেও যদি ঐ ষোল মাত্রায় মনকে রাখতে পার, তাহ'লেই জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে। কিন্তু হয় কি—জেগে তোমরা ঐ ষোল মাত্রায় মন রাখতে পার না। জেগে তোমাদের মনে হবে—জলের উপর দিয়ে যে হাঁটব, পারব কি? যদি ডুবে যাই!—এই এল মনের মধ্যে খট্‌কা। স্বপ্নে যখন জলে হাঁট, তখন কিন্তু তোমার মনে 'যদি ডুবে যাই' এই সংশয় আসেনি। ব্যক্তি তুমি একজনই,—অথচ স্বপ্নে জলে হাঁট, আর জাগলে জলে ডুবে যাও।—এ দু'য়ের মধ্যে কত তফাৎ দেখ তো! তুমি যে ডুবে যেতে পার, সেকথা স্বপ্নে তোমায় ভুলিয়ে রেখেছে। স্বপ্নেও তো তোমার খেয়াল থাকতে পারত যে, তুমি ডুবে যেতে পার। কিন্তু তা থাকে না। তুমি যে জলে হাঁটতে পারবে, তখন সেটাই তোমার মনে-প্রাণে জানছ—তাই অনায়াসে হেঁটে যাচ্ছ। স্বপ্নের মনে কোন খটকা থাকে না বলেই সব কিছু সম্ভব হয়। স্বপ্নে বেশী খেলে পেট ফাঁপে, বেশী স্নান করলে সর্দি লাগে। আবার দেখ, স্বপ্নে বোবায় ধরে, স্বপ্নে ভয়ে ভীতিতে মারা পর্যন্ত যায় দম বন্ধ হয়ে। যখন বোবায় ধরে, যে মাত্রায় মন উঠে তাকে বোবায় ধরেছে—'আই-আই' ক'রছে, অন্য একজন এসে ধাক্কা দিতে সে জেগে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মাত্রা থেকে নেমে গেল। এই যে তার মনটা—এই মনটা তখন এমন একটি মাত্রাতে ছিল, যার জন্য সে দম বন্ধ করে 'আই-আই' শব্দ করছে—গোঙানি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু জেগে যদি সে ইচ্ছা ক'রে 'আই-আই' ক'রে গোঙায়, তবে সে মারা যাবে না, আর লোকেও ভাববে না—ওকে বোবায় ধরেছে। যদি ঘুমিয়ে অমনি করে, অন্য লোকে মনে ভাববে—ওকে বোবায় ধরেছে—ওর বড় কষ্ট হচ্ছে। তখন তাড়াতাড়ি ডেকে ওকে জাগিয়ে দেবে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, একটা চিন্তাধারা এমন একটা স্তরে গিয়ে ঘুমন্ত সমাধিতে পরিণত হয়, যেখানে মুহূর্তের মধ্যে সেই সাধনার অবস্থায় উপনীত হয়, যখন মুহূর্তে জলে হাঁটতে পারে, মুহূর্তে শূন্যে উড়ে যেতে পারে, মুহূর্তে মারা যেতে পারে। কিন্তু ঐ সব চিন্তা তুমি জেগে কর, তখন তা হবে না। তোমারই কিন্তু মন, সেই মন নিয়েই তুমি জেগে আছ, আবার সেই মন নিয়েই ঘুমিয়ে আছ। এটা কিরকম জান? যেমন ঘোলা জল—তুমি তাতে ব্লটিং পেপার দিলে; ব্লটিং পেপার দেওয়াতে সুন্দর স্বচ্ছ জল বা'র হতে থাকল। ঘুমন্ত অবস্থা হ'ল একটি ব্লটিং পেপার, সমাধিটা হচ্ছে একটা ব্লটিং পেপার। ঐ মনটা জাগ্রত অবস্থায় ঘোলা জলের মতন ভেজালযুক্ত হয়ে থাকে, আর ঘুমালে হয় কি, ঐ মন ব্লটিং পেপারের ভিতর দিয়ে গিয়ে সুন্দর স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই তখন সেই মনে যা চিন্তা কর, তাই হয়ে যায়।

যোগীরা কি করেন?—জপ করেন। কেন করেন? সদা সর্বদা জপ করতে করতে ঘুমের মধ্যেও সেই জপটা চলতে থাকে। যত মহাপুরুষ—যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা

করেছেন কি, ঐ ঘুমের মধ্যে যেটা হয়, সেইটাকে জাগ্রত অবস্থায় আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁরা দিন রাত জপ ক'রতে ক'রতে ঘুমিয়ে পড়েন,—ঘুমিয়ে পড়েও জপটি তাঁদের চলতে থাকে এবং তাতেই হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি আরম্ভ হয়ে গেল।

পাহাড়ের থেকে যে জলটা নীচে পড়ে, তাতে চাকা লাগিয়ে দেয় ; সেই চাকা লাগানোতে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি হয়ে কত সুবিধা হয়ে গেল। কিন্তু ঐ ইলেক্‌ট্রিসিটি আলাদা ভাবে তৈরী করতে কত কিছু ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়। আর ওখানে ঝরণার জলে লাগিয়ে দিয়েছে, কোন ঝঞ্ঝাট নেই।—চাকা চলছে, আর আলো জ্বলছে। কত সুন্দর জিনিস দেখ তো!

আমাদেরও ঐ রকম করতে হবে। ঐ হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটির মতন আলো জ্বালাতে হবে। আমরা যে ছয় ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকি, সেই ঘুমের মধ্যে কোনমতে জপটাকে যদি ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তা হলেই হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি আরম্ভ হয়ে গেল। সাধকরা কি করেন? দিন রাত জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন, আবার জেগেই জপ করতে থাকেন। এমনি করতে করতে দেখা যায়, ঘুমের মধ্যেও যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চ'লতে থাকে, সেই রকম জপও চ'লতে থাকে। ঘুমের মধ্যে যদি কোন রকমে জপটাকে ফেলে দেওয়া যায়, তাহ'লে ঐ ঝরণার জলের হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিসিটি আরম্ভ হ'য়ে যাবে। ঐ চাকা ঘুরলে আর রেহাই নেই, তখন চ'লবেই। তাই এই ঘুমটার মধ্য দিয়ে চাকা ঘুরাতে পারলেই আর আলোর জন্য চিন্তা ক'রতে হবে না। তাতে কি হবে? তাতে জাগ্রত অবস্থায় যে জপ একবার কর, ঘুমের মধ্যে সেই জপ একবার ক'রলে লক্ষ লক্ষ গুণ জপ হ'য়ে যায়। তাই জাগ্রতে একবার জপে যে ফল হয়, ঘুমের মধ্যে তার ফল হবে বিশ লক্ষ জপের সমান। আবার ঘুমের পর যদি স্বপ্নে জপ কর, স্বপ্নের জপে আরো বিশ-লক্ষ গুণ ফল,—অর্থাৎ স্বপ্নে একবার জপ করলে চল্লিশ লক্ষ জপের কাজ হয়। ঘুমের মধ্যে যেই একবার জপে বিশ লক্ষ হ'চ্ছে, সেই একবার জপ যদি স্বপ্নের মধ্যে কর, তবে আরো বিশ লক্ষ যোগ হয়ে চল্লিশ লক্ষ হবে। চল্লিশ লক্ষ জপ যদি প্রতি একেতে পাও, তবে চিন্তা করে দেখ তো, কতদূর তুমি এগিয়ে গেলে! চল্লিশ লক্ষ জপ কি সোজা কথা?—প্রতি একেতে তা পেয়ে যাচ্ছ। জাগ্রত অবস্থায় জপ ক'রছ, কত পরিশ্রম করছ, আর ঘুমের মধ্যের জপে কোন পরিশ্রম নেই, অথচ শক্তি তার কত বেশী! ঘুমের মধ্য দিয়ে তেজ বেশী বেড়ে যায়। তোমরা চিন্তা করে দেখ—ঐ ঘুমন্ত সমাধির জগৎটা এই জাগ্রত জগতের চেয়ে কত সহজ! ভগবান তোমাদের কত সহজ পথ দিয়ে দিয়েছেন—তোমাদের রোজ এই ঘুমন্ত সমাধিতে রেখেছেন, আর তোমরা এইটা নষ্ট করছ। স্রষ্টা তোমাদের এমন সমাধি শিখিয়ে দিয়েছেন,—বাসে ট্রামে ট্রেনে যাও—ঐ সমাধি।—এমন যে সমাধি, তাই নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলছি। সমাধিটাকে আমরা উপভোগ করি, অথচ ঐ সমাধিকে যে কত বড় কাজে লাগান যায়, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ভগবানকে পাওয়ার জন্য ভগবান নিজেই আমাদের এমন সহজ পথ দিয়ে দিয়েছেন, অথচ আমরা সেই পথে না গিয়ে কি ক'রছি? আমরা আপথে কাজ করছি। আপথটা কি?—আমরা অমুক আসন, তমুক আসন ক'রে কাঠখোট্টা হয়ে ব'সে সাধনা

করি। অত তো সাধনার প্রয়োজন নেই! যে সাধনায় আমরা গর্ভে ছিলাম, সেই সমাধির সাধনায় যখন আমরা সব সময় আছি, ঐটাই আমাদের নেওয়া দরকার। ঐ ঘুমটাকে তোমাদের কাজে লাগাতে হবে। যখন ঘুম আসবে, তখন চেষ্টা করবে, যাতে জপ করতে করতে ঘুম আসে। ভুলে যাও ক্ষতি নেই, হোক বা না-হোক, চেষ্টা করে যাও। কিছুদিনের মধ্যে দেখবে কাজে লেগে গেছে। একবার যদি কাজে লেগে যায়, তবে তার চেয়ে ভাগ্যবান আর নেই। এইটাই সহজ পথ। যত মুনি-ঋষি এই সমাধির ভিতর দিয়েই আদেশ পেয়েছে, নির্দেশ পেয়েছে, সবকিছুর সমাধান পেয়েছে। সেই ঘুমটাকে যদি তোমরা কাজে লাগাতে পার, তবে চিন্তার পক্ষে সহজ হবে, কত সুন্দর কাজ হবে! কি কাজ হবে? ঘরের মধ্যে ব'সে হাত বাড়িয়ে জল বা'র ক'রতে পারবে, হাত বাড়িয়ে ফল বা'র ক'রতে পারবে,—ঘরে বসে' দার্জিলিং-এর কমলা আনতে পারবে—লাফিয়ে লাফিয়ে সব জিনিসপত্র আসতে আরম্ভ করবে। কেমন করে আসে, সেটা পরবর্তী কথা। কিন্তু এসে পড়ে—অদ্ভুত ভাবে সব এসে পড়ে। এসে পড়ার যে নীতি—সেটা ঐ একমাত্র পথ। তাই তোমরা শোবার আগে বসে' বসে' জপ ক'রবে,—ঘুমে ধরুক, বসে' বসে' টল, তাতে কিছু না,—শুয়ে শুয়েও জপ কর, জপ ক'রতে ক'রতে ঘুমিয়ে পড়। কখন ঘুমিয়ে গেছ, তা তুমি জানতেও পারবে না। এইভাবে করতে করতে দেখবে—ঘুমের মধ্যে জপ চ'লছে। ঘুমিয়ে যে জপ চ'লছে, তা তো তুমি বুঝতে পারবে না, কিন্তু জেগেই যদি দেখ তোমার জপ চ'লছে, তবেই বুঝবে—ঘুমের মধ্যে তোমার জপ চলছিল।—এই অভ্যাসটা তোমরা কর।

প্রশ্ন ১৯। মূলাধার বড়, না সহস্রার বড়?

উত্তর ঃ— বাবা বলছে ছেলেকে—আমি বাবা, না তুমি বাবা? ছেলে আবার তার ছেলেকে বলছে—আমি বাবা, না তুমি বাবা? আবার সেই ছেলেও তার ছেলেকে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করছে। এই ভাবেই চললো আর কি।—দেখা যাবে সবাই বাবা।

প্রশ্ন ২০। নিকৃষ্ট জীবজন্তুর কিভাবে উদ্ধার হবে? তাদের কি ক্রমোন্নতি হবে না?

উত্তর ঃ— সাগরের গর্তটা যখন দিয়েছে, তখন সেটা ভরেও দিয়েছে। তেষ্টাটা যখন দিয়েছে, তেষ্টা নিবারণের জন্য জলও দিয়েছে। তেষ্টা যখন পায়, তখন কেউ কি বলে দেয় যে, তুমি জল খাও? তেষ্টাই তো টেনে নিয়ে যায় জলের কাছে। সুতরাং ভগবান যখন নিজে স্ব-ইচ্ছায় এখানে এসেছেন, এবং নিজেকে নিজে প্রকাশ করছেন নানা রকমে, তখন সেই রকমের তেষ্টাটাও—চাহিদাটাও এখানেই বিদ্যমান। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট-র কোন প্রশ্ন নেই এখানে, শুধু এইটুকুই মনে রেখো—তেষ্টার জন্য তিনি সবাইকে তৈরী ক'রে দিয়েছেন;তাঁর কাছে পৌঁছানর জন্য যে রকম যা দরকার, তিনি সেই রকমই সব সাজিয়ে দিয়েছেন। কি ভাবে যে যাচ্ছে, সেটা অদ্ভুত! বুঝা যায় না, কিন্তু টেনে নিয়ে যাচ্ছে। টেনে নেওয়ার পথ কত রকম যে আছে!—অফুরন্ত পথ আছে—টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তবে গুরু কি করেন? আরো সহজ করে দেন, বলেন—যে জল ওখান থেকে টেনে নিয়ে আসবে, যেখানে বসে আছ সেখানেই খোঁড়, সেখান থেকেই সে জল বা'র হ'তে থাকবে।

প্রশ্ন ২১। কথায় বলে—ষাঁড়ের লেজ ধ'রে বৈতরণী পার হয়।—সেটা কি?

উত্তর ঃ— ষাঁড়ের লেজ ধরে' বৈতরণী পার হয়। ষাঁড় মানে এই ষাঁড় নয়—সার বস্তু— খোদার সার—মানে খোদ কর্তা, তাঁর যে সার—তাঁর যে সার বস্তু—তিনি যে সার বস্তু দিয়েছেন, তোমরা সেই সারকে ধর, মানে তোমরা সেই শাঁসকে ধর—আসল বস্তুকে ধর। খোদার সার—মানে ঈশ্বর যেই সার বস্তু দিয়েছেন, যেই সার বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়, যেই সার থেকে গাছ ভাল হয়, সেই সারকে ধরতে বলেছে।

শিব বলছেন জীব-জগৎকে—তেমরা পাপের মধ্যেই থাক, আর আবর্জনার মধ্যেই থাক, স্রষ্টা সবাইকে এই আশীষ বাণী দিয়েছেন—যে কোন মুহূর্তে তোমাদের দেবদর্শন হতে পারে, নির্বাণ-নির্বিকল্প হ'তে পরে, সিদ্ধি-মুক্তি হ'তে পারে। তোমাদের পূর্ব জন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতির উপর এ জন্মের সিদ্ধি-মুক্তি নির্ভর করছে না। কর্মফলে মানুষের জীবনের ধাপে ধাপে অবস্থার ব্যতিক্রম হ'তে পারে। কিন্তু যে ভাবেই থাক, যে কোন মুহূর্তে গোবরে পদ্মফুল ফুটতে পারে। ধাপার মাঠে আবর্জনাতে কত বড় বড় কপি হয়, ফুল হয়!—আবর্জনাতেই পরম সার হয়। তোমরা এই আবর্জনার পরিবেষ্টনে আছ বলে ভয় পেয়ো না যে, তোমাদের হবে না। এই আবর্জনাই সার হয়ে ফুটে উঠবে, এই আবর্জনাই মহাসারে পরিণত হবে—তা তো তোমরা জান না। এই সার থেকেই ফুটে উঠবে ফুল। ষাঁড়ের লেজ ধরে যে বৈতরণী পার হতে বলেছে—সেটা এই সার।—এই আবর্জনার—এই সংসার-ক্লেদের সার। এই সারের লেজ ধর। যে আবর্জনার মধ্যে, যে ক্লেদের মধ্যে তোমরা রয়েছ, সেই ক্লেদই হচ্ছে সার—এই সারেরই লেজ ধরতে বলেছে—অন্য ষাঁড় নয়।—সারের লেজ ধ'রে বৈতরণী পার হ'য়ে যাও। এই সংসার আবর্জনার মধ্যে অপরূপ সার রয়েছে! এখানে ঘি-দুধ-মাখন ঢাললেই শুধু হবে না, এখানে এই আবর্জনা ঢাললেই ফল হবে। শিব কি করলেন? সেই সারকেই বাহন করলেন—সেই অসার হচ্ছে আবর্জনার ক্লেদ। রক্ত-মাংস, পচা-গলা—দেহের এই যে সার, এই সারকে ধর। এরই প্রতীক স্বরূপ ষাঁড় আমার বাহন। এই জাগতিক ক্ষেত্রে, রক্ত-মাংসের শরীরে এখানে পচাগলা,—এখানে মুহূর্তের মধ্যে মানুষের পরিবর্তন হ'য়ে যায়। এই সারই আমার বাহন,—এই বাহনকে অবলম্বন করে আমি সব জায়গা পার হ'য়ে যাচ্ছি। শিব ব'লছেন—আমি তোমাদের মতন সাধারণ হ'য়ে অসাধারণ শক্তি লাভ করেছি সারের উপরে বসে'। তোমরাও তো দিন-রাত সেই সারের উপরে বসছো—সারের উপর দিয়ে তোমরাও পার হয়ে যাচ্ছ—তোমরাও সারকেই বাহন করেছ, আমি একাই কেবল সারকে বাহন করিনি। তোমরা রাস্তাঘাটে পাদুকার আবর্জনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছো— সারকেই তো বহন ক'রছ। এই অসারই হ'চ্ছে পরম সার; অসার থেকে যেই সার, তার লেজ ধরে বৈতরণী পার হ'য়ে, যেখানে নির্বাণ-নির্বিকল্প-দর্শন-সিদ্ধি-মুক্তি, সেই মহামন্ত্রের দরজা খোলা আছে—সেইখানে যাও।

যেখানে সমস্ত কিছুই সার,—এই অসারকেই সার করে নিয়ে তার উপর আশ্রয় করে তোমরা মহামন্ত্র জপ করে জীবনযাত্রা চালিত কর। তোমাদের মন্ত্রের তেজে তোমাদের ভিতরের সূর্য যখন ফুটে উঠবে, তখন এখানকার রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য—সব কিছুর

সমাধান হয়ে যাবে, তখন এইসব অসার বস্তু সারে পরিণত হবে। তার জন্যই ধ্যান-ধারণা-জপ-তপ। তোমাদের মধ্যে সেই সূর্য সব সময় রয়েছে, তোমরা বুঝতে পারছ না—সূর্য মেঘে আবৃত আছে বলে। কিন্তু মেঘ সূর্যকে আটকিয়ে রাখতে পারে না; এই মেঘের পিছন থেকেই সূর্য ফুটে উঠবে। সমস্যা-দ্বন্দ্বরূপ যে মেঘাচ্ছন্নের মধ্যে তোমাদের সূর্য লুক্কায়িত, সেই মেঘ ঐ সূর্যের তেজেই অপসারিত হবে। তোমরা সব অবস্থায় পবিত্রতার মধ্যে থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর, সব অবস্থায় মনকে শুদ্ধ রেখে অচল অটল রেখে অগ্রসর হও; তবেই দেখবে—এই মেঘ কেটে যাবে,—এই ফগ্ কেটে যাবে,—দেখবে, কি সুন্দর আলো হয়ে সূর্য উঠছে।

তোমাদের কার মধ্যে যে কি আছে তা তোমরাও জান না। এক বাড়ীতে একটা বড় পাথর পড়ে ছিল—সবাই সেই পাথরে পা ধুতো। এইভাবে বাপ-ঠাকুর্দা সবাই ঐ পাথরটাতে পা ধুয়ে এসেছে। একদিন এক অভিজ্ঞ লোক এসে বলছে—তোমরা যে এই পাথরে পা ধুয়ে আসছ, এটা তো সাধারণ পাথর নয়! এই পাথরটার মধ্যে হীরা আছে। তারপর হাতুড়ি দিয়ে সেই পাথরকে ভেঙে দেখে, তার মধ্যে মস্ত বড় একটা হীরা রয়েছে।—দেখা গেল, রাজার রাজত্বের ধন সেই পাথরে রয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আবর্জনার মধ্যেই আলো আছে, অদ্ভুত স্নিগ্ধ আলো। এই আবর্জনার মধ্যেই অসীমের রূপ লুকিয়ে আছে; তোমরা তাকে খুঁজে পাবে।

প্রশ্ন ২২। যা চাইলে চাওয়া-পাওয়া শেষ হয়, যা জানলে সব জানা শেষ হয়—সেটা কি?

উত্তর ঃ— ঐ প্রশ্নের উত্তর ঐটাই। জানাও দরকার, পাওয়াও। জানা জিনিসটা কি? কি জানতে হবে? আমরা যে জানতে চাই—কি জানতে চাই?—আমরা যে-বস্তু থেকে তৈরী, সেই বস্তু কার থেকে তৈরী, কিভাবে তৈরী, সেটা জানা দরকার। জানার শেষ নেই যত জানতে চাইবে, ততই আরো জানার মধ্যে ডুবে যাবে। ঐ জানার যে আনন্দ, সেই আনন্দটাই হচ্ছে পাওয়া।

এই দেহ-যন্ত্র প্রকৃতির নিয়মে এমনভাবে তৈরী যে, এটা জানবার জন্যই তৈরী। এই স্বাদ-সোয়াদ, দর্শন-স্পর্শন—এগুলো দিয়ে কি হয়? আরো বেশী জানবার জন্য এই যন্ত্রের অনুভূতির হামাগুড়ি দিয়ে আরো বেশী জানবার জন্য এগিয়ে যাই; যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জানার উদরটি না ভরবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জানার জন্য এগিয়ে যাই। যখন জানার উদর ভরে যাবে, পরিপূর্ণ হবে, তখন কি হবে? তখন দেখা যাবে—আমি নিজেই জেনে রয়েছি, নিজেই জানার একটা পাত্র হয়ে আছি এবং আমার এই জানার পাত্রটা জানা দিয়েই গড়া। ঐ পাত্রটা কি রকম?—ঐ পাত্রটা সমস্ত বুঝ দিয়ে—জানা দিয়ে—চৈতন্য দিয়ে এমন ভাবে গড়া যে, ঐটার আর নূতন করে জানার প্রয়োজন হবে না। তার জন্যে করতে হবে কি?—সর্ব অবস্থায় নামটা করতে হবে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, ঘাটে-মাঠে সেই গুরুপ্রদত্ত নাম জপ ক'রতে হয়, স্মরণ ক'রতে হয়। স্মরণে স্মরণে ঐটা স্ফুরণ হয়, স্ফুরণ হ'লেই সমস্ত বিশ্বের যে চাহিদা, যে জানা, যে পাওয়া—যা জানলে সব জানা হয়ে যায়—ঐ কথাটা

তোমার মধ্যে এসে তখন জাগবে। এই জাগার এবং জানার সব কিছু তোমার মধ্যে কস্তুরির মতন, ডিমের মতন সুপ্ত রয়েছে—গুপ্ত রয়েছে। ঐটাকে ফুটাতে গেলে একটু চেষ্টার প্রয়োজন।

প্রশ্ন ২৩। গুরুপূর্ণিমা বলে কেন?

উত্তর ঃ— সংক্ষেপে বলছি। —চাঁদ একদিন রেখার মতন হয়, আবার, তোমরা দেখেছ, সেই চাঁদ পূর্ণ হয়ে যায়। পূর্ণ হওয়াই হ'ল পূর্ণিমা। তোমাদের ভিতরে ঐরকম সব কিছু শক্তি প্রতিপদের রেখার মতন হয়ে আছে, গুরু তাঁর নিজের শক্তি দিয়ে সেটাকে পূর্ণ করে দেন বলে গুরুপূর্ণিমা।

প্রশ্ন ২৪। দীক্ষা নিলে কি বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকতে হয়?

উত্তর ঃ—বাধ্যবাধকতার মধ্যে কেন থাকবে? তুমি যখন লেখাপড়া শিখেছ, তখন তুমি এই A B C D ছাব্বিশটা অক্ষর পড়েছ, ক খ গ ঘ এই ছত্রিশটা অক্ষর পড়েছ—তবেই না তুমি সব শিখেছ? এখন তুমি কত ভাব, কত ভাষা, কত প্রেম, কত কাব্য রচনা করতে পার—কত কি প্রকাশ করতে পার! এই সব ক'রছ ঐ ছাব্বিশটা-ছত্রিশটা অক্ষর নিয়েই তো!

প্রশ্ন ২৫। সংখ্যা রেখে জপ, আর সংখ্যা না রেখে জপ—দুটোর প্রভেদ আছে কি?

উত্তর ঃ—এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যে দৌড়ায়—তার যতখানি পরিশ্রম, আর রাস্তায় ক্রমশঃ এগিয়ে যে দৌড়ায় তারও ততখানিই পরিশ্রম হয়। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যে স্কিপিং করে—তার পরিশ্রম, আর রাস্তায় যে দৌড়ায়, তার পরিশ্রম—দুই জনেরই সমান পরিশ্রম হয়। যে দৌড়ায়—সে এগিয়ে এগিয়ে সব জিনিস দেখে, আর যে দাঁড়িয়ে স্কিপিং করে—সে এক জায়গাতে থেকেই সব দেখে (শক্তির দিক থেকে)।

জানতে জানতে অগ্রসর হওয়া, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—এসবই জপের দ্বারা সম্ভব। এই জপের দ্বারা তোমরা নিজেরাই সব কিছু জানতে পারবে—জ্ঞানের দ্বার খুলে যাবে। তোমরা যত-জপ করবে, তোমাদের মনে তত জ্ঞান ফুটে উঠবে।

প্রশ্ন ২৬। আজ্ঞা-চক্রে অনন্ত কোটি সূর্যের তেজ আছে বলেছিলেন,—কিন্তু আজ্ঞা-চক্রে যে এতো অগ্নি, তা তো বুঝা যায় না?

উত্তর ঃ—প্রথমে একটা ধান ছিল—বুঝলে? আর আজ পৃথিবীতে কত গোলা ভরা ধান! একটা সরিষা দিয়েছিল মাত্র পৃথিবীর জন্য—ছিটিয়ে দেবার জন্য। ঠিকমত পুতলে একটা সরিষা দিয়েই পৃথিবীতে রাখার মত জায়গা করতে পারবে না। এক-একটা সৃষ্টির মধ্যে কতগুলো বাচ্চা আছে জান? একটা লোকের বাচ্চার জন্য এই রকম কয়েকটা পৃথিবী লাগবে। দুইটা ইলিশ মাছের খোল্‌তা—যদি ফোটে, তবে নদীতে জায়গা দিতে পারবে না। এত সূর্যের কণা এই আজ্ঞা-চক্রে! সূর্যের বীজ আছে—অফুরন্ত বীজ। সুতরাং এ তো তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে। এত বড় জিনিসটা—এই পৃথিবীটা যে ঘুরছে, তা টের পাও? এটাই

তো টের পাও না। পৃথিবীটা বন্ বন্ করে ঘুরছে—টের পেলে কি কেউ বসে থাকতে পারবে? এইটাই টের পাও না, আর আজ্ঞা-চক্রের আগুন টের পেলে তো হয়েই যেত। তাড়াতাড়ি টের পাওয়ার জিনিস কি? ম্যাট্রিক পাশ করতেই দশ বছর লাগে, আর এত বড় ভাষাটা—সময় তো লাগবেই।

প্রশ্ন ২৭। আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের রাজনীতিতে এবং এই বর্তমান পরিস্থিতিতে কতটুকু দেওয়ার আছে?

উত্তর ঃ—এখানে গোড়াতেই একটা ভুল অনেকেই করে থাকেন—আধ্যাত্মিক বা ধর্ম-বিষয়কে এখানকার সব কিছু থেকে আলাদা করে ভাবেন। রক্ত মাংস মজ্জা নিয়ে যে দেহ, সেই দেহগত আধ্যাত্মিক বা ধর্ম সেই দেহকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। আবার এই দেহ পঞ্চভূতেই তৈরী—যেমন জল, বাতাস, মাটি, তাপ ইত্যাদি ; সুতরাং তাদের বাদ দিয়েও চলবে না। আধ্যাত্মিক বলে যা কিছু—আধিভৌতিক থেকেই। সেই আধিভৌতিকের আদির অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুর বস্তুত্বকে অনুসন্ধান করে সন্ধান পাওয়াই আধ্যাত্মিকের একটি কাজ। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুর অণু-পরমাণু দিয়েই এই জীবদেহ গড়া—এই অণু-পরমাণুই অণিমা নামে অভিহিত। অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি জীবজগৎ সৃষ্টির পূর্ব পরিচয় মাত্র—সুতরাং দেহে অণিমা, লঘিমা, গরিমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত। যেইভাবে অতি সূক্ষ্ম অবস্থার ভিতর দিয়ে, অতি সূক্ষ্ম হয়ে, যে পথ দিয়ে আমরা এখানে এসেছি, সেই পথ দিয়ে পুনঃ আমরা অতি সূক্ষ্ম হয়ে কেন চলে যেতে পারব না? আসার অবস্থায় আমিই ছিলাম, যাবার অবস্থায় কেন আমি যেতে পারব না? নিশ্চয়ই পথ আছে। ডিমে তা দিয়ে পাখী বাচ্চা ফোটায়, সেই তা দিয়ে যন্ত্রের মাধ্যমে হাজার বাচ্চা ফোটান যায়। অতি গরমে রৌদ্রে দিলেও ফুটছে না, সিদ্ধ করলেও ফুটছে না—তা-এর মাত্রাটুকু জানা থাকলে যে কোন সময় ফুটিয়ে দেওয়া যায়। যে সূক্ষ্ম অবস্থায় আমরা একদিন ছিলাম, সেই তা-টুকুনুর মাত্রা এই স্থূল দেহে প্রয়োগ করলে সূক্ষ্মে পরিণত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অতি সাধনার দ্বারা সেই সূক্ষ্ম বস্তুর তা-টুকুনু কি করে আনা যায়, সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণত হয়ে সূক্ষ্ম বস্তুকে কি করে জানা যায়, সেই পথ খুঁজছেন। সব কিছুই এই বাস্তবের বিষয়বস্তু দিয়েই যে যে-বিষয়ে নিবিষ্ট হয়ে যা করছে সেটাই সাধনা, তা আধ্যাত্মিকের ছোঁয়াচ ছাড়া নয়। সাগর থেকে যে শাখাগুলো নদনদী নাম নিয়েছে, সাগর না হলেও সাগরত্ব তাদের মধ্যে রয়েছে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় ভগবদ্ দর্শনের সুযোগ সুবিধা না হলেও সেই মহাসাগর-রূপ চিন্তা থেকে যে অজস্র শাখা এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন নামে নামকরণ হয়ে, তা সেই মহার্ণবেরই মহাপ্রবাহ। সেই আধ্যাত্মিক বা ধর্মের স্পর্শ সর্ব বিষয়বস্তুতে বিদ্যমান। সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের ব্যক্তিদের এখানকার সব কাজে হস্তক্ষেপ করে' যাতে স্রোতের জল আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করা সমীচীন। নালা-গহ্বরে জল জমে যাওয়ার ফলেই আজ এই অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে—সেই জল যাতে সাগরের স্পর্শে আসতে পারে, আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের তাই করা সমীচীন। তার দৃষ্টান্ত পায়ের নীচে, মাথার উপরে। পায়ের নীচে সাগর,

মাথার উপরে সাগর—দুটো এক সুরেই supplied হচ্ছে। প্রকৃতি স্বয়ং আকাশে থেকেও সেবার কার্যে সব সময় নিয়োজিত ও ব্যস্ত ; আমরা যখন তারই, সেই আকাশস্থিত মন নিয়ে সবার যোগাযোগে সব কিছু ঠিক রাখাই আমাদের কাজ।

প্রশ্ন ২৮। '*ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা*' —তাই তো মহাপুরুষরা বাস্তবকে এড়িয়ে যেতে চান। ঠিক নয় কি?

উত্তর ঃ ভারী চমৎকার কথা বললে। বাস্তবেরই তৈরী দেহ, মন, মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি, এই বুদ্ধি ও জ্ঞান থেকেই অনুভূতি—তার থেকেই শাস্ত্র। অস্বীকার যদি করতে হয়, আর মিথ্যা যদি বলতে হয়, তবে সবটাই বাদ পড়ে যাচ্ছে, মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। এক লক্ষ টাকার একটা পাই-পয়সা বাদ দিলে গণনায় ভুল হবে। ব্রহ্ম সত্যের নিকটে যে কোন বিষয়বস্তুকে বাদ দিলে ভুল হবে। যাঁরা এই চিন্তা করেন, তাঁরা প্রকারান্তরে ভুলই করে আসছেন। যিনি ভাবছেন, চিন্তা করছেন, যা কিছু বলছেন—এই মিথ্যারূপ দেহ থেকে ; মিথ্যার থেকে যে কথা বলবেন সবই মিথ্যা হবে। ব্রহ্মের বেলা একটা ভাববেন, জগতের বেলায় আর একটা ভাববেন—এটা কখনও হয়? এটা এক জায়গা থেকে দুটি উক্তি মাত্র। যতক্ষণ দেহে রক্ত সঞ্চালিত আছে, কোন মহাপুরুষ বাস্তব এড়াতে পারেন নি, পারবেনও না ; এ শুধু বড় বড় বোল আওড়ান ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে একদিন ঠিকই পারবেন, যেদিন খাটিয়াতে উঠবেন।—ওটাই একমাত্র এড়ানো।

প্রশ্ন ২৯। বহু সাধু সন্ন্যাসীর কাছে গেছি, অভাব-অনটনের কথা জানিয়েছি, পরমার্থের কথা জিগ্যেস করেছি, শেষে জিগ্যেস করেছি—কিছু দেবার আপনাদের আছে কি? তাঁরা বললেন—প্রারব্ধ, তাই ভুগতে হবে ; নিষ্ঠা সহকারে কাজ কর, ভগবৎ নাম কর, তবে আনন্দ পাবে। তাতে মন ভ'রলো না। আপনার কাছে জিগ্যেস করছি—কোন কিছু হওয়ার মত পথ আছে কি? আপনার কি নির্দেশ?

উত্তর ঃ—একটা কথা মনে রাখবে—মনোকষ্টে আমরা কাঁদি, হাসি না। যে কোন ব্যথা পেয়ে, আঘাতজনিত হোক বা রক্তপাতজনিত হোক, আমরা চীৎকার করি,—তাতে ব্যথার কিছু লাঘব হয় না কি? হয় বলেই—কান্নাও রয়েছে, হাসিও রয়েছে। যানবাহন যেখান দিয়ে চলে—গাছ, পাতা, বাড়ী সব ধূলোয় ভরে যায়,—আবার প্রকৃতির ব্যবস্থায়ই ওরা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এতটুকু চক্ষু—তারও রক্ষার ব্যবস্থা আছে ; কত ধূলো গিয়ে এতে পড়ে, রক্ষা করার কিছু যদি না থাকতো, ধূলোর স্তূপ হয়ে যেত। এসব ধূলো থেকে স্বভাবজাত রক্ষা করার বিষয়বস্তু দ্বারা রক্ষা পেয়ে আসছে, চোখের জলে সে তাকে ধূয়ে দিচ্ছে, antiseptic হিসাবে তাকে রক্ষা করে দিচ্ছে। এ রকম বহু antiseptic আমাদের দেহে আছে—প্রকৃতি থেকে আমাদের রক্ষা করিয়ে নিচ্ছে। রক্ষা করা, পালন করা—প্রকৃতিরই নিয়ম। পথ বেছে নেওয়ার বুদ্ধিতেই পথের খোঁজ আসে। অর্থ ও পরমার্থ—এই দুইয়েরই অভাব পূরণ করছে আমাদের নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি। বুদ্ধিজীবী লোক তার দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে ; জীবিকা নির্বাহ শুধু ডাল-ভাত খাওয়াতেই শেষ হয় না, তার উর্ধ্বে আরও কিছু

খাবার আছে—সেটা সম্পূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। মনে যখনই কোন অনুশোচনা আসে, তা বিনা কারণে হয় না। পথে পৌঁছবার জন্যই অনুশোচনা, অনুতাপ। শরীরের চুলকানির সাথে সাথে আমাদের হাত-পা-অঙ্গুলিগুলি সেইভাবে নড়তে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না চুলকানি দমন করতে পারি, নখ-অস্ত্র ব্যবহার করি। তবে দেখা যাচ্ছে, এ অস্ত্রগুলো বিশেষ প্রয়োজনেই হয়েছে। প্রয়োজনের সাথে সাথে মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যখন প্রকৃতি প্রদত্ত দান, সেখানে ভাববারই প্রয়োজন হয় না। ভাববার মত ভাবনা যখন তোমার মধ্যে রয়েছে, তখনই ভাবতে হবে—ওটা অঙ্গস্বরূপ। অভাবের মূলেই যে ভাবনা! তাই অভাবগুলো fulfil না হওয়া পর্যন্ত ভাবনার মাত্রা ক্রমশঃই বেড়ে চলছে। সেই অভাবগুলো পরিপূর্ণ হওয়ার জন্যই এই ভাবনা। সময়মত, সময়ানুযায়ী ঠিক fulfilment হয়ে যাবে। আট বছরের বাচ্চা ষাট বছরের পিতাকে বলছে—"আমার চুল পাকছে না কেন?"—বলে কাঁদতে আরম্ভ করে দেয়। পিতা তাকে বললেন—"আমার মাথায় যখন পাকা চুল দেখছ, সময়মত তোমারও পাকবে, তাই অযথা কেঁদে তোমার লাভ নেই!" পূর্ব জন্মের ফলে বা প্রারব্ধে কি করেছ, কি ছিলে—সে সব কথা বলতে আমি নারাজ। এখনকার অবস্থা নিয়ে তোমার সাথে আমার কথা। এখানকার যে অভাব পূর্ণ করতে চাইছ, সেই রাস্তার কথাই আমি বলছি। —সেই রাস্তা তোমার কাছেই। সেই রাস্তার উপর আস্থা স্থাপন কর—সেটা কল্পনারাজ্য নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব। তুমি যে শান্তির কামনা করছ, যে তৃপ্তির সন্ধানে আমার কাছে এসেছ, সেই তৃপ্তির ভাণ্ডার তোমার ভেতরে রয়েছে। এখানকার সব কিছু বিষয়বস্তুকে তৃপ্তির মূলাধারে ফেলে দাও। ব্যায়ামে যেমন বাহুবল এবং মনোবল হয়, "তৃপ্তিতে আছো"—এই ব্যায়ামটা সদাসর্বদা তোমার ভাবনার মধ্যে এনে রাখ। কথাটা শুনতে এখন ভাল লাগবে না, কিন্তু অভ্যাসে পরিণত কর, —দেখতে পাবে জীবনে যা কিছু আসছে-যাচ্ছে—সবই একটি পরিতৃপ্তির তৃপ্তি। এইভাবে কিছুদিন চলার পর conception-এর (উপলব্ধির) দরজাটা খুলে যাবে, তখন আপনিই প্রতি বস্তুতে সচেতন হয়ে যাবে এবং প্রকৃতির ভেতরকার উদ্দেশ্যটা clear হয়ে যাবে। তারপর এখানে যে-কোন ঘটনার সম্মুখীন হবে—তার ভেতরকার তত্ত্ব, রহস্য এবং উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে। বুঝের মধ্যে এলেই তখন অঙ্ক মিলে যাওয়ার মত ভাল লাগবে। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে মিলে যাওয়ার successটা তোমায় মুগ্ধ করে ফেলবে। এই মুগ্ধ হওয়ার প্রতি মুহূর্তে যে একটা নেশা, সেটাই হবে সবচেয়ে বড় নেশা। এই মুগ্ধ অবস্থাটা তৃপ্তির আর এক অবস্থা। এই Universe-এর (বিশ্বজগতের) mathematical calculationটা (যথাযথ গণনা) তখন তোমার নখদর্পণে এসে পড়বে। প্রতি মুহূর্তে এই মিলানোর পথই হবে শ্রেষ্ঠ পথ। জীবজাতি প্রতি মুহূর্তে এই calculation-এই (গণনায়) গোল পাকাচ্ছে। মিলে না বলেই হা-হুতাশ করছে, আবার সম্পূর্ণ মিলতির মধ্যে থেকেও তারা গলতি করছে। এই গণিতের গণনার ভুলেই 'যত ভীমরতি'। আজকে তোমার যে ভীমরতি—গণনার ভ্রান্তিতে ;গণিত তোমার হাতে, গণনা তোমার হাতে, গুণতে যাতে ভুল না হয় তার চেষ্টা কর। প্রকৃতির নিয়মই হ'ল—যাতে গুণতিতে মিলতি হয়। তাই

তোমার ভাবনার ভাগাভাগিতে না গিয়ে যোগ কর। এই যোগই হ'ল যোগ ; শাস্ত্রের যে যোগ—এই একই কথা।

প্রশ্ন ৩০। এখানকার কমিউনিষ্টরা কোন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেশে না দেখছি—এটা কেন? নিশ্চয়ই এদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা আছে। —আপনি কি বলেন?

উত্তর ঃ— তুমি দেখছি ওদের উপর বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে কথা বলছ। একটা লোক দা নিয়ে দৌড়াচ্ছে—তুমি ভাবছ তোমার গলা কাটবে, —এটা যেমন অমূলক, তোমার চিন্তাধারাটা সেই রকম।

আগে ভেবে দেখ—এখানকার ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলো 'ঈশ্বর আছে' এই নিয়ে বসে আছে, আর ওরা "ঈশ্বর নেই" এই নিয়ে বসে আছে—দুটোই ধারণার বশবর্তী, প্রত্যক্ষভাবে কেউ কাউকে প্রমাণে প্রমাণিত করতে পারছে না। যারা 'আছেন' বলে বসে আছে, তারা যদি একটা ধর্মপ্রতিষ্ঠান হয়, তবে যারা 'নাই' বলে ধরে আছে, তারাও একটা আর এক ধরণের ধর্ম প্রতিষ্ঠান হবে না কেন? মেলা-মেশার দিক থেকে এখানে আপত্তি কোথায়? তারা যে মিশতে চায় না, এটা কি করে স্বীকার করব? মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা উভয়ের মধ্যে সহজগতিতে থাকলে নিশ্চয় মিশবে। তারা ভাবছে, "নাই" বলে ভেবে নিলে আমাদের কাজের সুবিধা হয়, "আছে" বলে ভেবে নিলে কাজের অনেক অসুবিধা হবে। "আছে'র কবলে পড়ে সবল নষ্ট হয়ে যায়—এই চিন্তা ক'রেও ট্রেনিং-এর সময়টা মনে হয় এড়িয়ে থাকতে পারে।

"আছেন"-ওয়ালারা ভাবছে, ওদের "নাই"-এর কবলে পড়লে ইহকাল পরকাল দুই-ই যাবে। উভয়ের দিক থেকেই ভাববার বিষয় আছে। যাঁরা "ঈশ্বর আছেন' বলে ভেবে যাচ্ছেন, তাঁদের পাপ-পুণ্য থার্মোমিটারের মত ওঠা-নামা করছে। এটা করলে পাপ হবে, এটা করলে পুণ্য হবে—এ দুটোই মনগড়া ও ধারণার বশে। পাপ-পুণ্যের বিচার ঈশ্বরের কাছ থেকে সাথে সাথে পেলে দুনিয়ার সবাই মানতো; পূর্ব জন্মের ভয় দেখিয়ে সেটা প্রমাণ হয় না। ফড়িং-এর ভেতর শলা ঢুকিয়ে দেওয়ার ফলে আর এক জন্মে অন্ধ হয়েছে—ধর্মশাস্ত্রে এরকম দৃষ্টান্ত বহু আছে, কিন্তু সেটাতে প্রমাণ হয় না। কসাইরা হরদম কেটে মাংস বিক্রী করছে, তাদের গতি নিশ্চয়ই নরলোকে—নরকে; আর মন্দিরে দেবতার সম্মুখে যে কসাই হরদম বলি দিচ্ছে, তাতে তার কোন পাপ হচ্ছে না,—তার গতি ঈশ্বরলোকে—স্বর্গে! দুজনেই তো কসাই, দুজনের যে দুই গতি—এর ব্যাখ্যাকার কে? এখানকার লোকই তো! এখানে পাপ বলে যেটা মনে করছে, তাদের সে পাপ গঙ্গাস্নানে নষ্ট হয়, তীর্থে গেলে নষ্ট হয়। দান-ধ্যান-বিধির ব্যবস্থাও আছে। মন্ত্রগুলোও সে রকম,—'ভগবান, আমায় শুদ্ধ করে নেও; হে সূর্য, তোমার তেজে আমায় শুদ্ধ কর; হে জল বাতাস, আমাকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার কর'—সবটাই যেন রামা-শ্যামাকে ডেকে কাজ করানোর মত। ক্ষণে বাতাস, ক্ষণে জল, ক্ষণে সূর্য, ক্ষণে ভগবান—সবাইকে ডেকে নিজেকে শুদ্ধ করে নেয়। অত সমস্ত ঝঞ্ঝাটে গিয়ে পাপ-পুণ্যের ওঠা-নামাতে যাওয়ার দরকার কি? মন্ত্রের অনুস্বার বিসর্গে, নানা

রকমের স্তোক বাক্যে নিজেকে প্রতি মুহূর্তে অপবিত্রতার হাত থেকে পবিত্রতায় আনা যায় এই তৃপ্তি মনগড়া বিধিব্যবস্থার তৃপ্তি। এখানকার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা যে সমস্ত মন্ত্রগুলো পাঠ করছেন, তা' অতি সাধারণ—যাতে এখানকার অনুশোচনা, অনুতাপের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকতে না হয়; তাই ক্লেদ পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-বিধিও আছে। 'ঈশ্বর আছেন' এই চিন্তা করে করে, তার বিধি ব্যবস্থা মানতে মানতে ১১০ ডিগ্রীতে পৌঁছতে হিমসিম খেয়ে যাওয়ার উপক্রম,—১০ ডিগ্রী উঠতে পারলে ভগবদ্ দর্শন, সিদ্ধি মুক্তি নির্বাণ সবটাই হয়। ১০ ডিগ্রী উঠার যে নিয়ম-কানুন—সেটা হ'লো 'আজ নগদ, কাল বাকী'। বাজারে গিয়ে শিশু বয়সে প্রথম ধাক্কাটা খেলাম— ভাবলাম আজ আর নেব না, কাল এসে বাকীটা নেব। পরের দিনও দেখি একই লেখা,—এর আর কোন পথ নেই। এই নিয়ম-কানুনে কেউই উঠতে পারবে না। অনেক বর্জন করে উঠতে হয়—কিন্তু কোনটাকেই বর্জন করতে পারে না। তার মধ্যে কামকে আবার বর্জন করতে হবে, যেটা কোন দিনই কারও হবে না, সুতরাং ১০ ডিগ্রীতে পৌঁছা আর হবে না। পাপ বাসায় বাস করার সাহস তখনই পায়, যখন বাসা তৈরী পায়। আমাদের মধ্যে 'শুচিবাই' ঢুকেছে—এটা পাপ, সেটা পাপ—এই-সেই করেই বাসা করেছি, পাপ আর ছাড়ছে না—এই দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে দিন কাটছে। ছেপ ছিটিয়ে শ্লেট কত মোছা যায়? সেটাই আরেকটি অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়—ছেপ অশুদ্ধ, এটা করা উচিত নয়। শাস্ত্রের যত বিধি ব্যবস্থা— আমাকে কোন কিছুতেই পাপ স্পর্শ করতে পারবে না—এই ব্যবস্থার জন্যেই সব কিছু করেছে। এক গাড়ী টাকা নিতে অসুবিধা, একটা চেক নিতে কোন অসুবিধা নেই। মূল্য যখন একই, বোঝাই করে টেনে টেনে নিলে কি আমার মূল্যটা বেশী বাড়বে? তিন মাইল উপরে পাহাড় বেয়ে, ক্লান্ত, গলদঘর্ম ও পরিশ্রান্ত হয়ে একটা প্রণাম ঠুকে এলাম, আর একজন পাহাড়ের পাদদেশে তিন মাইল উপরের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে প্রণাম করল, আর একজন ফ্যানের তলায় গদীতে বসে সেই উদ্দেশ্যে প্রণাম করল—এখন কার কি হ'লো? মাপ-যন্ত্র থাকলে সেটা অনায়াসে বা'র করা যেত। নাই যখন, ব্রতকথার মত অনেক মাহাত্ম্যকথা আছে—তা' দিয়ে বিচার হয় না। সেই রকম বিধিব্যবস্থা অনেক আছে, সমাজ জীবনে বাস্তবের উন্নতির পথে এই ব্যবস্থা অনেক কাজে লেগেছে। সবটাই দেখা যাচ্ছে একটা ধারণার বশে চালিত করা হচ্ছে। ধারণার বশে চালিয়ে ১১০ ডিগ্রীতে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে—সেই ধারণার বশেই যারা 'ঈশ্বর নাই' এবং তাদের 'এই জীবনই শেষ' বলে ভেবে যাচ্ছে, তাদের তো কোন পাপ-পুণ্যের বালাই নেই। যাদের জন্ম-জন্মান্তর নেই, যাদের ঈশ্বর নেই, তারা তো ১১০ ডিগ্রীতে বসে আছে। শাস্ত্রের কথায় যদি ১০ ডিগ্রী-ওয়ালাদের স্বর্গলোকে বাস হয়, তবে 'নাই'-ওয়ালাদের বাসের অসুবিধা কোথায়? যারা 'আছেন' বলে গেছে—কর্মের দিক থেকে, সমাজ জীবনের পথে, কর্ম জীবনের পথে তাদের অনেক গাফিলতি এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও অনেক আশ্রমবাসীরা আজকাল দান-ধ্যান করার সাথে সাথে ব্যবসাও করে থাকেন—তাঁরা কর্মের দিকেও একটু একটু নজর দেওয়ার চেষ্টা করেন,—তাতে বেশী কিছু হয় না। মানার ফলে অনেক বিপদ

আছে। তাদের নিজেদের নিয়ে অনেক ব্যস্ত থাকতে হয়,—কখন slip খেয়ে যায়, ফস্‌কে যায়! যারা মানে না—তাদের নীরস, কর্কশ, রুক্ষ বলে মনে হয়—কিন্তু সত্যিকারের আবেগ তাদের যথেষ্ট থাকে, আমি বিশ্বাস করি। যারা ঈশ্বর মানে—অক্লান্ত পরিশ্রম করে, যখন কোন সুরাহা হয় না তখন তাদের বেশীর ভাগ ব্যক্তি ভেক ধরা শুরু করে; এর পরিণতি হচ্ছে সম্প্রদায়— নিজেরাই তখন ভগবান হয়ে বসে এবং সমাজকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। আজকের অধিকাংশ সাধু-গুরুদের মধ্যে কয়জন ভগবানের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে—একটা এক্স-রে যন্ত্র থাকলে দেখিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু তারা এমন ভেক ধরেছে, যেন তারা ঈশ্বরের সঙ্গেই কথাবার্তা বলছে,—'ঈশ্বর আছেন' এই sentiment- এর সুযোগ নিয়ে সবাইকে আকর্ষণ করছে। তার পরই যার যার দল ভারী করবার চেষ্টা করছে এবং দলগত বিবাদ তখনই শুরু হচ্ছে। যারা সত্যিকারের 'ঈশ্বর আছেন'—এটা মেনে চলছে, কিন্তু তারা ভেক-এ নেই—এরকম লক্ষে দু-চারটিও পাওয়া যাবে না। পরিশেষে বেশীর ভাগ বেশেই পরিণত হয়, আর সুযোগ নেয়। যে সাধু-গুরু ভেক ধরেছে, সে ভাবছে— আমার কিছু না হলেও ওর হয়েছে; আবার উনি ভাবছেন—আমার কিছু না হলেও তাঁর হয়েছে। এই রকম চলছে। সঠিক প্রমাণ কেউই দিতে পারেনি—আজগুবি কথাতে সঠিক প্রমাণ হয় না।

আবার যারা সত্যিকারের ঈশ্বর মানে না, তাদের সংখ্যাও বিরল; এদের মধ্যেও আছে—মানে না বলে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মানে। তারাই এই দলে গোলমাল করে, মানে না বলে মুখে তারা খুব আস্ফালন করে। দেখলে সকলে ভাববে—ঠিকই মানে না,—কিন্তু বাস শনি-বাড়ীর পাশ দিয়ে গেলে চোখ বুজে প্রণাম সেরে নেয়, হাত তুললে যদি কেউ দেখে! ঐ যে একটু চোখ বুজিয়েছিল, তাও আবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নেয়, কেউ দেখলো কিনা। এই রকম দুমনা ব্যক্তি যে দলেই থাকে, সেই দলেই নানা ঝঞ্ঝাট-বিপদ্ ঘটায়। কিন্তু দুজনের দুটো দিক যদি সত্যিকারের ঠিক থাকে, তবে উত্তর মুখে একজনের গতি আর দক্ষিণ মুখে আর একজনের গতি হলেও, হাঁটা পথে দু'জন একদিন মিলবেই। দুজনের বিপরীত পথ ও মত, কিন্তু মিলন এক। তাই সত্যিকারের যদি তাদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা থাকে, তবে যে কোন ব্যক্তির সাথে মিলতে তাদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু উভয়ের দলের মধ্যেই যদি 'দোমনা' থাকে, তবেই যত গরমিল। নিষেধাজ্ঞা—গড়ার মুখে খারাপ নয়। গাছ যে পর্যন্ত ছাগ বা গরুর মুখের নাগালের মধ্যে থাকে, সে পর্যন্ত বেড়া দেওয়াটা খারাপ নয়।

জনৈকের প্রশ্নঃ— আপনি দেখছি 'ঈশ্বর মানা'র চেয়ে 'না-মানা'র সমর্থন করছেন বেশী। ঠিক কিনা?

উত্তরঃ— দেখ বাবা, তুমিও দিল্লী যাবে, আমিও যাব। যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, ততই ভাল। মানার পথে যদি তাড়াতাড়ি হয়—তাতেও আমার আপত্তি নেই, না-মানার পথে যদি তাড়াতাড়ি হয়—তাতে আমার আপত্তি নেই।

প্রশ্ন ৩১। আমরা তো এখন এই বুঝেই আছি যে, এখানকার ভাবনা যে ঠিকমত ভাববে, সেই ঠিক। এটা ঠিক কিনা—আপনার নিকট জানতে চাই।

উত্তর ঃ— জন্মের সাথে মৃত্যুর সম্পর্ক; উদয়ের সাথে অস্তের, জোয়ারের সাথে ভাটার, ভোগের সাথে ত্যাগের, 'হ্যাঁ'র সাথে 'না'র এবং 'না'র সাথে 'হ্যাঁ'র সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। আলো ছাড়া অন্ধকার নয়—অন্ধকার ছাড়া আলো নয়। দুঃখের সাথে সুখের সম্পর্ক—সুখের সাথে দুঃখের সম্পর্ক। ইহকালের সাথে পরকালের সম্পর্ক, আবার পরকালের সাথে ইহকালের সম্পর্ক। এখানকার সাথে সেখানকার সম্পর্ক, সেখানকার সাথে এখানকার সম্পর্ক। আবার, শব্দ-বিন্যাস ভাব-বিন্যাস থেকে,—ভাব-বিন্যাস শব্দ-বিন্যাস থেকে। শব্দ ও ভাব জল আর বরফের মত—একই বস্তুর দুটো নাম।

পৃথিবী এক, তার থেকে সৃষ্ট বস্তু অনেক। কোন বিষয়বস্তুই সে-ছাড়া নয়। এখানকার সুখ, এখানকার ভোগ যে বলছি—'এখানকার' এই শব্দটি সেখানে না থাকলে এখানে ব্যবহৃত হত না। 'এই জীবনই শেষ, এই জীবনই সবকিছু'—আরেকটা জীবনের সাথে মিশ্রিত না থাকলে এই কথাটি আসত না।

বাড়ীর পাশের খাল, বিল বা নদীর জলকে স্পর্শ করলে সাগরকেই স্পর্শ করা হয় সন্দেহ নাই। সাগর আছে বলেই এগুলোর অস্তিত্ব। সন্তান পিতা ছাড়া নয়। সমূহ ইন্দ্রিয়ের গোচরে ও তৃপ্তিতে আছে বলেই ইন্দ্রিয়গুলো, সীমাবদ্ধ বিষয়বস্তু এবং যাবতীয় যা কিছু, সীমানায় থেকেই সীমানার বাইরের কথা বলে। সীমানার কথাটাই সীমানার বাইরের কথা।

সব কিছু শব্দ, কথা ও ভাব থেকে এইটুকুই বুঝতে হবে যে, ভোগ বা উপভোগ বা তৃপ্তি, খুশি বা আনন্দ যা কিছু—এখানে পেলে আর পাওয়ার কিছু থাকবে না এমন যদি হোত, তবে না হয় 'এখানেই শেষ', 'এখানেই সব কিছু'—এটা বলা সাজতো। যেমন, তেষ্টার সময় এক গ্লাস কি দু' গ্লাস জল পান করা হ'লো। তাতে তেষ্টার যে নিবারণ—তা' চিরকালের জন্য নয়। কিছুক্ষণ পরই তাই আবার তেষ্টা—আবার চাই জল। সাগরের জল সবটা পান করলেও তেষ্টা নিবারণ কোন দিনই হবে না। এমনি করে ভেতরের বহু রকম তেষ্টাও বহুমুখী হয়ে আছে। কোনটারই চিরকালের জন্য পূরণ হচ্ছে না। তবে এই ক্ষণিকের আভাসগুলি বিরাটের আভাসেরই ইঙ্গিত বা পূর্বাভাস। এই বাস্তবের যে সুখভোগ এবং এখানকার যা কিছু—এটাও নিশ্চয় সেই আভাসেরই একটি আভাস, এটা নিশ্চয় বলা চলে।

জন্মটা মৃত্যুরই ইঙ্গিত, কারণ প্রতি মুহূর্তেই তার পরিবর্তন আছে। প্রতি মুহূর্তেই আমরা জন্ম-মৃত্যু সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে উপভোগ করে চলছি। পরিশেষে সব রোগ-শোক-তাপ একত্র হয়েই হয় জীবনাবসান। অবসানের পথে ওগুলো ব্যথারই গান। একটা হাঁচি বা কাশি, একটু সর্দি বা জ্বর—এমনিতে খুব বেশী কিছু নয়। কিন্তু এরাই একত্র হয়ে তিল তিল করে মৃত্যুর ইঙ্গিত দিচ্ছে; গণতি করলে দেখা যাবে—একদিনের একটা হাঁচি বা কাশি মৃত্যুর গণতিতে ঠিকই ছিল। একটি পাই পয়সার এমনিতে কোন মূল্য নেই, কিন্তু ষোল আনা পূরণ করতে হলে তাকে বাদ দিলে চলবে না।

প্রতিটি ভাব, শব্দ ও অর্থ শিশুর স্বভাবজাত কান্নার সুরের মত বের হয়ে আসছে। আবার এক একটি ভাব, শব্দ ও অর্থ আরেকটি'কে ভর করে বেরিয়ে আসছে পিতা পুত্রের

সম্পর্কের মত। পৃথিবী, সূর্য ও গ্রহ-উপগ্রহের মত বহু বহু একক একত্র হয়েই একটি বৃহৎ সংখ্যা হয়—বৃহৎ চিন্তা সামান্য চিন্তাগুলো একত্রিত হয়েই হয়।

একই মস্তিষ্ক—তা থেকেই মন, আর তার থেকে কত ভাবনাই না ভেবে আসছি! আমাদের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সীমানা থেকেই এর শুরু, তারই চোট কত! ক্ষুদ্র বীজশক্তিই একদিন বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়, আর অজ্ঞ ব্যক্তিরা এখানেই ঝোলে।

এই বৃহৎ শূন্যময় আকাশে কত অগণিত গ্রহ রয়েছে জানিনা, কত মাথা সেই সব গ্রহে রয়েছে জানিনা। তবে যার আশ্রয়ে সবাই আশ্রিত, সেটা ফাঁকা হলেও একটা আঁকার মাঝে নিশ্চয়ই আছে। চৈতন্য ও প্রাণের যে পরিচয় প্রতি বস্তুতে আমরা পাচ্ছি—জীবজগৎ তারই প্রমাণ। যার মাঝে ঐ সব অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ বাস করছে, তার শক্তি তাদের চেয়ে বেশী—এটা ভাবতেই হবে। তার মানে, এই যে ফাঁকা আকাশ—যে আকাশের শেষ নেই—তা থেকে আমাদের আভাস দিয়ে যা বুঝতে পারি, তাতে এইটুকুই বুঝি যে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার—কোনটারই শেষ নেই। এই যে আনন্দ, ভালবাসা, প্রেম ও সুখ-শান্তির লালসা—যার জন্য সমস্ত জীবজগৎ একমুখী হয়ে এগিয়ে চলছে, সেটা যে অবলম্বনকেই আশ্রয় করে চলুক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

বসন্তের পাখী ও বসন্তের ফুল বসন্তকেই অনুসরণ করে চলছে। পৃথিবীর আলোর গতির সাথে নিজের গতি মিলিয়ে যদি চলা যায়, তবে চিরদিন আলোই পাওয়া যাবে। অন্ধকারের বেলাতেও ঠিক তাই।

পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তনের গতি আছে বলেই পরিবর্তন হচ্ছে। যখনই কোন পরিবর্তন হবে, তখনই ভাবতে হবে—আরেকটা কিছু না থাকলে পরিবর্তন হয় না। এখানকার যা কিছু, সব বৃহৎ বস্তুর বিষয়বস্তু দিয়ে গড়া, সাধারণ প্রমাণেই তা প্রমাণিত হয়। এখানকার সুখভোগ এখানেই শেষ—এটাই প্রচলিত হয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের জীবনে খুঁজতে গেলে কোন কিছু ঘুঁজে পাওয়া যায় না। কে আমি—খুঁজে পাওয়া যায় না; কে দেখে, কে শুনে, কে বোঝে—কোনটাকেই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই খুঁজে না পাওয়া কার আভাস? সেই বৃহৎ মহাশূন্য বা আকাশেরই আভাস পাচ্ছি। আমাদের জীবনের যা কিছু—খুঁজতে গেলে সবটাই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুর শেষ নেই, মহাশূন্যের শেষ নেই, আমাদের এখানকার যা কিছু তারও শেষ নেই। এই যে ইহকালের যা কিছু—এই ইহকালই হচ্ছে পরকালের তরী। ভবসাগর পার হতে হলে এই তরীকেই আশ্রয় করতে হবে।

প্রশ্ন ৩২। আমাদের এখানে যাঁরা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র নিয়ে সাধনা ক'রছেন তাঁরা কি সাম্যবাদের সাধনাই ক'রছেন? আপনি সাম্যবাদ বলতে যা বোঝাচ্ছেন—তাঁরা তো সেটাকে নাস্তিক্যবাদই বলেন। সুতরাং তাঁদের কি সাম্যবাদী বলা চলে?

উত্তর ঃ— যে কোন যানবাহনে পৃথিবীর উপর যতক্ষণ বিচরণ করা যায়, ততক্ষণ দেশের পর দেশ পাওয়া যায়—লেখনীতে তার অনেক সংবাদই দেওয়া যায়। পৃথিবীর ঊর্দ্ধে যখন যেতে হয়, তখন পৃথিবীর পর পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে যখন বিচরণ করবে,

তখন তার কি বর্ণনা করবে? কেবল শূন্য—কেবল শূন্য। একই ব্যক্তি যখন পৃথিবীতে বিচরণ করছিল, তখন তার লেখা এক রকম ছিল; সেই ব্যক্তিই যখন মহাকাশে বিচরণ করছে, তখন তার ভাব ভাষা সব অন্য রকম। কোন্‌টা ঠিক? এই পৃথিবীতে যাঁরা দেব-দেবতার সাধনা-আরাধনা করছেন, তাঁরা একরকম কথা বলছেন; এর ঊর্দ্ধে বিচরণ করতে পারলে তাঁরা বুঝবেন—এটা শুধু মানচিত্রের মত। বাচ্চা বয়সের খেলনার মত—রান্না শিখলে, খেলনার রান্না আর থাকে না। চিন্তা যখন আরও প্রসারতায় চলে যাবে, দেব-দেবীর মূর্তিগুলো তখন খেলনার মত মন থেকে সরে যাবে। গানের শব্দগুলো, বিরহ-বৈরাগ্যের পদগুলো ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সুরে ডুবে যায়; তারপর শুধু সুর—সুদূরের সুর—সেখানেও শূন্যেই যেন লীন।

শুধু সাধু-সন্নাসী-ধার্মিক কেন, প্রত্যেক মানুষ, সমস্ত জীব মহাশূন্যের যাত্রিক হয়ে মহাশূন্যে বিচরণ করছে পৃথিবীরূপ স্পুটনিককে অবলম্বন করে। শূন্যে যাদের গতি, যাদের আশ্রয় শূন্যে, সর্ব দিকে চিন্তা করলে দেখা যাচ্ছে, তারা শূন্যকে পূরণ করতে করতেই চলেছে; কিন্তু শূন্য শূন্যই থেকে যাচ্ছে। আশা আকাঙ্ক্ষা সব সেইরূপ। ক্ষুধা পূরণ করার তাগিদে ছুটে চলেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কোন ক্ষুধা পূরণ হচ্ছে না। পূরণ করার প্রয়োজনের তাগিদে সব কিছু সজীব হয়ে উঠেছে। সজীবতা তার আভাস। বেদ-বেদান্ত গ্রন্থাদি মহাশূন্যে আশ্রিত বিষয়বস্তুরই তথ্য। আর তথ্যই তত্ত্ব। তত্ত্বের যে অস্তিত্ব—তার তত্ত্বে যখন যাওয়া যায়, তখন সর্বহারা হয়ে এক বিরাট ফাঁকার মধ্যে পড়তে হয়। সেই ফাঁকায় যখন সব কিছু হারিয়ে যায়, তখন সব বস্তুর অস্তিত্ব 'নাই' হয়ে যায়। পরিশেষে ভেতর থেকে একটা 'নাই নাই' ভাব জাগতে থাকে। সেটাই 'নাস্তিক' ভাব। এই 'নাই নাই' থেকে কোথায় যেন একটা কি 'আছে' বলে মনে হয়—সেই ভাবনাতে আরও ভাবতে থাকে। তারপর ভাবতে ভাবতে এইটুকু ভাবনায় আসে—'নাই' কথাটা কেমন করে বললাম? যে ভাবনা-চিন্তা দিয়ে 'নাই'-কে স্বীকার করে আসছি, সেটা তো আছে! 'আছে' খুঁজতে খুঁজতে 'নাই' হয়ে যায়, আবার 'নাই খুঁজতে খুঁজতে 'নাই'-টাকেই 'আছে' বলে ভেবে নেয়। অতদূর ভাবতে অসুবিধা হয় বলেই—ঐ ভাবনায় যাতে কেউ ভাবতে না যায়—তাই 'নাস্তিক' কথা দিয়ে অঙ্কের ফলটা আগেই জানিয়ে দেয়। সেটাই নাস্তিক্যবাদ। জীব চায় অবলম্বন। অবলম্বন-বিহীন চলা খুব অসুবিধা। মহাকাশ এমন একটা দর্শন যে, 'আছে' বললেও আচ্ছা, 'নাই' বললেও আচ্ছা। দুটো মুখই দেখা যায়। জগতের পরিধির মধ্যে যেটা অতি সহজলভ্য, সেটাকেই বেশীর ভাগ অবলম্বন করছে। একটু বিচার করলেই আমরা সমান দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রতিটি অণুতে পরমাণুতে উপলব্ধি করছি। সমান দৃষ্টি যেখানে, সাম্যবাদ সেখানেই। সাম্যবাদকে শুধুমাত্র নাস্তিক্যবাদ বললে চলবে কেন?

প্রশ্ন ৩৩। আপনি তো বললেন, এখনকার সাম্যবাদের মূল নীতিগুলি বৈদিক সাম্যবাদেও ছিল। কিন্তু এখনকার সাম্যবাদীরা অর্থাৎ কম্যুনিষ্টরা তো ধর্মের নাম শুনলেই অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। ওদিকে বৈদিক নীতি তো ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এদিক থেকে এই দুই সাম্যবাদকে মেলাব কি করে?

উত্তর ঃ— কম্যুনিষ্টরা যে-ধর্মকে মানে না, সে ধর্ম প্রকৃত-ধর্ম নয়; ধর্মের বিকৃত রূপকে তারা মানে না। কারুরই তা মানা উচিত নয়। বেদ যে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ধর্মের অর্থ হচ্ছে—যা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সমান ভাবে ধারণ করে আছে, সেই ধারণক্ষমতাই হ'লো ধর্ম। এই ধর্মকে সকলেই মানে—সকলকেই মানতে হবে।

বেদ হচ্ছে জ্ঞান। বিদ্ শব্দ থেকে এর উৎপত্তি—যার অর্থ হলো 'জানা'। বেদ হ'লো এমন একটি মাইক্রোসকোপিক যন্ত্র, যার মধ্য দিয়ে তাকালে জগতের সত্যরূপটাকেই জানা যায়। বেদের ধর্ম হচ্ছে প্রকৃতির সত্যরূপকে জানিয়ে দেওয়া। প্রকৃতির সেই সত্যরূপকে তো কম্যুনিষ্টরা কখনই অস্বীকার করে না। তারা কি সূর্য্যকে মানে না? অগ্নি দেখলে কি তারা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে?—তা নয়। এই সূর্যই বেদে "পূষা" নামে অভিহিত। বায়ু, জল, বিদ্যুৎকে কি তারা তাচ্ছিল্য করতে পারে? বেদে এদেরই বন্দনা করা হয়েছে মরুৎ, বরুণ, ইন্দ্র নামে। বেদে অশ্বনীকুমারদ্বয়কে বলা হয়েছে—তারা সর্বত্র একত্র বিচরণ করে; কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণের দুইটি অশ্ব তাদের বাহন। এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্যেরই দুই গতির রূপ। সূর্যের আলো ও ছায়া এদের দুই অশ্ব। এরা সর্বদাই গতির মধ্যে আছে। সূর্যের গতির উপর নির্ভর করে দিন ও রাত্রির আসা-যাওয়া বা বিভিন্ন ঋতুর বিবর্তন—একথা কি কম্যুনিষ্টরা অস্বীকার করতে পারে? এখনও কোন শক্তি বা force-কে বোঝাতে গেলে সেই Horse power-ই বলে। Space and time বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের দুইটি মূল নীতি বলে গৃহীত বেদে তাদেরই বলা হয়েছে ব্যোমদেব এবং যমদেব—অনন্ত আকাশ আর মহাকাল। এছাড়া নদী, ওষধি, বনস্পতি প্রভৃতি তেত্রিশটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুই ছিল বেদের দেবতা। এই তেত্রিশটি অতি-প্রয়োজনীয় ও নিত্য-স্মরণীয় বস্তুর প্রতিটি শক্তি ছিল এক কোটি বস্তুর সমান। সেটাই বিকৃত হ'তে হ'তে আজ তেত্রিশ কোটি দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং সেই বিকৃত রূপকে যদি কেউ মানতে না চায়, তবে তো দোষের কিছু নেই!

বেদের সমস্ত কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক। একদল স্বার্থান্বেষী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বেদের প্রকৃত ধর্মকে একটি মনগড়া কাল্পনিক অর্থ দিয়ে বিকৃত করে তুলেছে। ধর্মকে জানার বস্তু থেকে টেনে এনে ভয়ের বস্তু করে তুলেছে। তারই ফলে আজ সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন; ভয় দেখিয়ে তাদের পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। তথাকথিত সাধু সন্ন্যাসী মহন্তরা ধর্মের নামে একচ্ছত্র ব্যবসা চালিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে। এইসব তথাকথিত ধর্মের দালালরা পুঁজিবাদী শোষণবাদীদেরই শ্রেণীভুক্ত। যারা ধর্মের প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করে ধর্মের নামে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করছে, তারা সমাজের বন্ধু নয়। এদের প্রচারিত ধর্মকেই সাম্যবাদীরা মানতে চায় না—এই আফিং-এর প্রভাব থেকে নিজেদের মোহমুক্ত রাখার জন্যই তারা ধর্মকে বর্জন করেছে। এই বিকৃত ধর্মকে আমিও মানি না। বেদের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে এদের দূরে সরিয়ে দিতেই হবে।

প্রশ্ন ৩৪। আপনি বলেছেন, এই মহাশূন্যের থেকে জীব-জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। জীবের ভিতর তো চৈতন্য আছে; মহাশূন্যে কি চৈতন্য আছে, প্রাণ আছে?

উত্তর ঃ— এই যে জীব-জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সবার ভিতরে যে চৈতন্য আছে, প্রাণ আছে—জল-মাটি-তেজ-বাতাস থেকেই তো এই প্রাণ এবং চৈতন্য এলো! যে বাতাস, যে জল, যে সূর্য না হ'লে জীব-জগৎ মরে যায়, যাকে মৃত্যু বলা হয়। আর আমরা বেঁচে আছি এই জল বাতাস সূর্য আছে বলেই। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—আমাদের প্রাণ যারা রক্ষা করছে, তাদের তবে প্রাণ নিশ্চয় আছে। তাদের যদি প্রাণ না থাকে, তবে আমরা তাদের থেকে কি করে প্রাণ পাচ্ছি? তারা প্রাণহীন হ'লে আমরা তবে তাদের থেকে কি করে প্রাণ পাই! তাই তাদের ভিতর প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে। আর এরাই তো বহন করে আছে পৃথিবীর মালমসল্লা। এই পৃথিবীর সব প্রাণ তো এরাই বহন করে আছে, এদের উপরেই তো সবাই নির্ভরশীল। যাদের উপর আমরা নির্ভরশীল তাদের প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে, বুঝ আছে। ওদের যে বুঝ আছে, প্রাণ আছে, তা দেখলে বুঝা যায় না, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বুঝতে পারা যায়, তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে চৈতন্য আছে, প্রাণ আছে, বুঝ আছে। তাদের সাড়া না থাকলে আমরা বাঁচতুম না, তাদের প্রাণের সাড়া আছে বলেই আমরা প্রাণ পেয়েছি।

এই বাতাস মাটি সূর্য, যাদের থেকে আমরা প্রাণ পেয়েছি, তারাই তো শুধু শেষ নয়, তার পরেও তো আরো আছে। তার পরে কি? তার পরে কি? এই ভাব থাকতে পারে না, সমাধান ছাড়া থাকতে পারে না; সমাধান আছেই। তাহ'লে বাতাস মাটি সূর্য—এরা প্রাণ পেলো কোথা থেকে! সূর্য তো তার নিজের সৃষ্টি নয়, সূর্য নিজে অন্যের শক্তির দ্বারা গঠিত, বাতাস মাটি গ্রহ উপগ্রহ সব অন্যের শক্তির দ্বারা গঠিত। কার শক্তির দ্বারা গঠিত? এর মূল কে, এর আদি তবে কোথায়? সে আদি হ'লো এই মহাশূন্য, যেটা 'নাই হয়ে আছে'। এই নাই-এর ভিতরে পৃথিবী গ্রহ উপগ্রহ সূর্য চন্দ্র সব ঝুলে আছে।

আমাদের চৈতন্য এসেছে বাতাস মাটি জল সূর্য থেকে, তাই তাদেরও বিশেষ চৈতন্য আছে। আবার তারা যার থেকে এসেছে তিনি মহাচৈতন্যে ভরা, তাঁর ভিতরে মহাবুঝ আছে, তিনি সমস্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থল, তাই তিনি মহাপ্রাণবন্ত।

এই যে গ্রহ উপগ্রহ সূর্য চন্দ্র পৃথিবী সবাই আপন আপন কক্ষে থেকে একে অন্যের আকর্ষণে আছে, এই আকর্ষণশক্তিটা কার উপর দিয়ে গেছে? তোমরা যখন একজনকে ডাক দাও, সেই শব্দ তিরিশ হাত দূরের থেকে অন্যে শুনতে পায়। তিরিশ হাত দূরও যা, তিরিশ লক্ষ মাইল দূরও তাই। কার উপর দিয়ে এই শব্দটা চলে যাচ্ছে? চলে যাচ্ছে তো এই মহাশূন্যের উপর দিয়েই। সব গ্রহগুলি যে একে অন্যের আকর্ষণে রয়েছে, সেই আকর্ষণটা তো সেই 'নাই' এর ভিতর দিয়েই গিয়েছে। তাই যাঁকে আশ্রয় করে সব গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী সূর্য চন্দ্র রয়েছে, তিনি তবে তাদেরও ঊর্ধ্বে। যিনি সবার ঊর্ধ্বে, ঊর্ধ্বরেতা যিনি, তিনি তবে নিশ্চয় আরও সচেতন, তাঁর ভিতর তবে মহাচৈতন্যে ভরা, তিনি সবারই প্রাণকেন্দ্র। যাঁর নিয়মে সৃষ্টি, যাঁর দৌলতে সৃষ্টি, তাঁর স্মরণ স্তব পূজা করছে বাতাস পৃথিবী গ্রহ উপগ্রহ সূর্য চন্দ্র। আমরা করছি এদের পূজা, এদের থেকে আমরা প্রাণ পেয়েছি।

পৃথিবী আশ্রয় নিয়েছে, সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ আশ্রয় নিয়েছে শূন্যের মধ্যে। কিন্তু শূন্য বলে তো কেউ নেই! 'নাই' এর মধ্যে অনন্ত 'নাই' এর সন্ধান যখন 'নাই' হয়ে যাবে, সেই অনন্ত 'নাই'ই তো চৈতন্যময় হয়ে আছে। বেদ বলেছে—এই যে মহাশূন্য, এই যে অনন্ত ফাঁকা জায়গা, এটাই তো মহাচৈতন্যে ভরা, সব সাড়ার সাড়া। সেই সাড়াওয়ালাই তো সব কিছু বহন করে আছে! শূন্য বহন করে আছে বাতাসকে, আলোকে, সূর্যকে, ধ্বনিকে। কিন্তু যিনি সমস্তকে বহন করে আছেন, তাঁকে খুঁজলে তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় না, তিনি 'নাই' হয়ে মিশে আছেন। তাই আত্মহারা হওয়ার মত কত সুখ তাঁকে ভাবলে বল তো?

তোমার তৃপ্তি, ধ্যান, ধারণা এই ফাঁকার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। তোমার চিন্তা কথা বুদ্ধি-বৃত্তি সমস্ত ফাঁকার মধ্যে উড়ে যাচ্ছে, ফাঁকার মধ্যে মিশে যাচ্ছে। আমাদের চেতনার সাড়া ঐ মহাচৈতন্য থেকে এসে পড়েছে।

তোমাদের সুরের ধ্বনি যখন অনন্ত মহাকাশের ধ্বনির সঙ্গে মিশবে, এক হ'য়ে যাবে, তখনি বেজে উঠবে মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত; তারপর তত্ত্ব খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাবে তত্ত্বজ্ঞকে, সুর খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাবে সুরজ্ঞকে। এই ভাবেই পেয়ে যাবে দর্শন অনুভূতি সিদ্ধি মুক্তি নির্বাণ, অণিমা লঘিমা গরিমা শক্তি । নামের মধ্যেই রয়েছে সব। নামের মধ্যে আরো কি রয়েছে? রয়েছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাতায়াত, জীবের কেন আসা, কেনইবা যাওয়া— সব কিছুর সমাধান পেয়ে যাবে নামে, জপে। তাই শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ করবে।

দেখ, একটা সাধারণ কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি কিভাবে শূন্য থেকে সৃষ্টি, আবার শূন্যেই লয়। একটা গরু কচি ঘাস খেলে তার দুধ হয়; তবে দেখা যাচ্ছে ঘাসে দুধ আছে। এমনি ঘাস দেখলে বোঝাই যায় না—তাতে দুধ আছে। যন্ত্রের মাধ্যমে ঘাস থেকে দুধ পাই। কোন্ যন্ত্র? গরুর দেহযন্ত্র।

গরুকে যদি বল—গরু, তুমি দুধ পেলে কোথায়?—আমি তো জানি না, আমি ঘাস খেয়েছি, ঘাস বলতে পারবে।—ঘাস, তুমি দুধ পেলে কোথায়?—আমি তো জানি না, আমি মাটি থেকে রস টেনে খাই, মাটি বলতে পারবে।—মাটি, তুমি দুধ পেলে কোথায়?—আমি তো বাতাস আছে বলে আছি, তাই বাতাস বলতে পারবে।—বাতাস, তুমি দুধ পেলে কোথায়?—আমি তো সূর্য আছে বলে আছি, তাই সূর্য বলতে পারবে।—সূর্য, তুমি দুধ পেলে কোথায়?—তা তো আমি বলতে পারবো না, আমি তো মহাশূন্যের মধ্যে আছি এবং দাউ দাউ করে' দিবারাত্র জ্বলছি, শূন্য আছে বলেই আমি আছি।

শূন্যের থেকে সৃষ্টি, শূন্যেই লয়। তাই 'ধ্যায়েৎ শূন্যম্ অহর্নিশম্।'

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা

(দ্বিতীয় ভাগ)

ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

১। সংসারের ঝামেলায় অথবা বিক্ষিপ্ততায় কি আমাদের জীবন নষ্ট হয়? ৫৯—৬৩

২। আমাদের এই যে এত চাওয়া, এটা-সেটা-চাই—চাওয়ার শেষ নাই, এত চাহিদা কেন হয়? ৬৪—৬৯

৩। এই পৃথিবীতে সবাই চায় সুখ-শান্তি। কিন্তু দেখা যায় তা হয় না। পিতার বর্তমানে পুত্রের মৃত্যু, স্ত্রীর বর্তমানে স্বামীর মৃত্যু। —স্রষ্টা কি আঘাত দেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন? ৬৯—৭৬

৪। এই জগৎটা মহামায়ার খেলা,—মহামায়া কি? ৭৬—৮৪

৫। আমরা যে এসেছি অর্থাৎ জীবজগৎ যে এসেছে, এই আসার প্রয়োজনীতা কি? ৮৪—৯২

৬। আসলে যাওয়ার প্রশ্ন আসে, আর যদি আমরা না-ই আসি, তবে তো আর যাওয়ার প্রশ্ন আসে না। ৯২—৯৩

৭। তাদের উদ্ধারের কি হবে? ৯৩—৯৪

৮। এই যে মহাশূন্য, তার থেকে জীব-জগৎ সৃষ্টি—এই ফাঁকার ভিতর আঁকা কি ক'রে এল? ৯৪—১০০

৯। ব'লছেন—অগণিত পৃথিবী আছে। এখান থেকে যারা যায়, তারা কি সেইসব পৃথিবীতে যায়? আপনি বলেছেন—মাত্রা মতন সবার জন্ম হয়। এই মাত্রাটা কি ক'রে হয়? ১০০—১০৯

১০। আত্মা সম্বন্ধে কিছু বলুন। মৃত্যুর পর আত্মা চ'লে যায়; কে চলে যায়, কেন যায়; কোন্ আত্মা কি ভাবে কোথায় থাকে—আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন। ১০৯—১১৮

১১। অবতাররা পৃথিবীতে কেন আসেন? আপনি বলেছেন জন্মই হচ্ছে মুক্তির পথ।—এটার অর্থ কি? ১১৮—১২২

১২। গুরুকে গতিদাতা বলে কেন? গতির পথ কি? কি কারণে তিনি এই গতির পথ ক'রে দেন? এই গতির পথে চলার বিশেষত্ব কি? ১২৩—১২৮

১৩। আপনি বলেছেন, সবাই অতি সহজে ভগবানকে পায়। সেটা কি ক'রে সম্ভব? জন্মসিদ্ধ গুরু, বসে সাধনা ক'রে গুরু, আর গৃহগুরু—এঁদের মধ্যে পার্থক্য কি? ১২৮—১৩৫

১৪। ওঙ্কার ধ্বনি ও প্রণব ধ্বনি কি এবং তার অর্থ ই বা কি? এটা স্ত্রীবাচক না পুরুষবাচক? ১৩৫—১৩৭

১৫। আমরা যে জপ-ধ্যান করি, সে সময় সমূহ যে চঞ্চলতারূপ বাধা বিঘ্ন আসে এটার কারণ কি? আসনে ব'সে জপ-ধ্যানের নিয়ম কি? আপনি বলেছেন—চিন্তা ক'রলে তোমার কিছু অংশ চিন্তাতে ব্যয় হয়ে গেল। কিছু অংশ আমার যে চ'লে গেল, তা তো বুঝতে পারি না? ১৩৭—১৪৭

পৃষ্ঠা

১৬। নামের উপকার কি? মিনিটে লক্ষ লক্ষ নাম কি ক'রে হয়? নাম আর বীজে পার্থক্য কি? ১৪৮—১৫৩
১৭। বেদ কি? বেদ কোথা থেকে এল? ১৫৩—১৫৫
১৮। জপে বসলে নানা বাজে চিন্তায় মন চলে যায়—এটা কেন হয়? ১৫৫
১৯। সপ্তচক্র কি? এই সপ্তচক্র জাগলে কি কি অনুভূতি আসে? সহস্রার কি ক'রে জাগে? ১৫৬—১৬১

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা
(দ্বিতীয় ভাগ)

প্রশ্ন ঃ—সংসারের ঝামেলায় অথবা মনের বিক্ষিপ্ততায় কি আমাদের জীবন নষ্ট হয়?

উত্তর ঃ—আমাদের জীবনের চলার পথে অনেক বাধাবিঘ্ন আসে। আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে যত বাধাই আসুক না কেন, কোন বাধাবিঘ্নতেই এই আধ্যাত্মিক জীবন নষ্ট হতে পারে না। অর্থাৎ তোমার যে জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা, অন্য কোনো আজে বাজে চিন্তাতে ঐগুলি নষ্ট হয় না। তোমার ধ্যান-জপের কাজ ঠিক থাকবে, এটাই হলো আধ্যাত্মিকের নিয়ম। বাস্তবে যত বাধাই আসুক না কেন, সে বাধা আধ্যাত্মিকের পথ আটকাতে পারে না। এখানে যেটা বাধা বলে মনে করে— আমাদের মন শত দিকে যাচ্ছে, মন আমাদের চঞ্চল—তাতে যদি বাধা হতো তবে ঋষিদের, দেব-দেবতাদের কি করে সন্তান হলো? তাঁদের তবে কি করে দর্শন হলো? কি করে তাঁদের সিদ্ধি লাভ হলো? তাঁদের তো তাতে আটকায় নি! এখানে যে কথা প্রচলন আছে, বৃত্তির ব্যবহারে ভগবানকে পাওয়ার পথে অন্তরায় হয় বলে যেটা বলা হয়, সেই বলাতে কেবল শারীরিক মানসিক যা ক্ষতি, সেটা দেহের সঙ্গেই সম্পর্কিত। আর তার জের প্রতি মুহূর্তে মনের ভিতর ছোবল দিচ্ছে—সন্দেহ দ্বন্দ্বে মনকে ঘিরে রেখেছে। কোন কোন মহাপুরুষ নির্দেশ দিয়ে গেছেন—এটা কোরো না, সেটা কোরো না। কিন্তু তাঁরা নিজেরাই সেটা ক'রে গেছেন এবং ক'রে যাওয়াতে তাঁদের কিন্তু দেব-দর্শনে কোন বাধাবিঘ্ন হয়নি। অথচ আমাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা—প্রাণী হত্যা করলে পাপ বলা হয়েছে, মাছ-মাংস-মুরগী কাটলে দোষ বলা হয়েছে! প্রণী হত্যা তবে কোন্ মহাপুরুষ না করেছে? লাউ-কুমড়ারও প্রাণ আছে, গাছেরও প্রাণ আছে। তা কাটলেও প্রাণীহত্যার পাপই হবে। একটা পিঁপড়া মারলেও প্রাণী হত্যা হয়। তবে তো প্রাণী হত্যার থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

কথা হ'লো, যেটা প্রয়োজনের মধ্যে পড়বে, সেটা দোষের নয়। প্রয়োজনের বাইরে যেটা, সেটাই হ'লো দোষের। আমাদের যতটুকু প্রয়োজন, সেটা সেইভাবেই সাজানো রয়েছে; তার বাইরে যা করতে যাবে, সেটাই দোষের।

বলা হয়, কাম ক্রোধ লোভ এগুলো থাকলে দেব-দর্শন হয় না। তাই যদি হবে, তবে তো দেবতার দরজায় কেউ যেতে পারে না। মনের ভিতরে তো বাইরের কার্যকলাপ ঠিকই চলছে, লজ্জাতে না হয় বলে না। একজনকে ভালবাসলে, যেটা কাম বলে এখানে, সেটা বাইরের ক্ষয়। আর মনে মনে চিন্তা করা, চিন্তা করে ভাল লাগা—এটাতে ভিতরের ক্ষয়। এ দুটোতে কোনই পার্থক্য নেই। বাইরে ব্যবহার করলে যে ক্ষয়, আর মনে মনে চিন্তাতে যে ক্ষয়, এই দুটোতেই ক্ষয় সমান, পার্থক্য কিছু নেই। একজন মনে কর একজনের দিকে

তাকিয়ে আছে, এই বাইরেরটা তুমি বাধা দিতে পার; কিন্তু মনে মনে তাকানো—এটা তুমি আটকাবে কেমন কোরে? অপরাধ যদি হয়, তবে দুটোই অপরাধ। যাঁরা এসব কথা বলেন, তাঁদের জানিয়ে দিতে হবে—চিন্তা করলেই খারাপ হয় না, এর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্ক নেই—এগুলোর সাথে ধ্যান ধারণা জপ তপের কোন সম্পর্ক নেই।

তোমার মন বাইরে দৌড়াবেই—মনকে কেউ আটকিয়ে রাখতে পারে না। এটাকে সামলানোর পথ তবে কি? গেরুয়া প'রে, তিলক কেটে মনকে আটকিয়ে রাখতে চায়, যাতে মন বাইরে যেতে না পারে। কিন্তু যতই মনের উপরে বোঝা চাপিয়ে রাখ না কেন, মন এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মারবেই। এতে যদি আধ্যাত্মিক কাজ আটকাত, তবে আর কেউ উঠতে পারতো না।

আমাদের ভিতর থেকে এই যে দর্শন-ঘ্রাণের ইন্দ্রিয়গুলো জাগছে, এই ইন্দ্রিয়গুলো কি করছে? এগুলো সব সময় আমাদের চাওয়াটাকে শুদ্ধ করে দিচ্ছে, সমস্ত সজাগ করে দিচ্ছে। এখানকার খণ্ড খণ্ড ব্যবহারিক কাম-ক্রোধ-লোভ-ভালবাসা, ইন্দ্রিয়গুলো যা কিছু গ্রহণ করছে, স্বাদে সোয়াদে ব্যবহার করতে করতে চলেছে, আধ্যাত্মিকের বেলায় এর কোন দাম নেই। এখানকার সাধু-গুরুরা অনেকে বলবেন—এগুলো ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে এগুলো যদি ব্যবহারে না আসে, তবে কোন কাজই হয় না। প্রকৃতির নিয়মে সব সতেজতা বজায় রাখার জন্যই ওগুলো ব্যবহার হচ্ছে। প্রতি ইন্দ্রিয় যাতে সচেতন হয় তার জন্যই ওগুলো, সত্যিকারের সাড়া যাতে আসে তার জন্য এই ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা। বৃত্তির নিবৃত্তি যদি এখানে না থাকতো তবে ভগবানকে ডাকা যেতো না। বৃত্তির নিবৃত্তিতেই আমরা অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি। এই নিবৃত্তিই হচ্ছে তৃপ্তির একটা ধারা, তা কামের দিক দিয়েই যাক আর লোভের দিক দিয়েই যাক বা যে দিক দিয়েই যাক। এতটুকু সময়ও তুমি তৃপ্তি পাচ্ছ কিনা সেটা দেখ। এই তৃপ্তি কত রকম স্বাদে সোয়াদে, কত রকমভাবে, দৃশ্যে অদৃশ্যে, সৃষ্টিতে আমাদের ভিতর দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। আমাদের যন্ত্রগুলো আছে কিনা তা বোঝাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। সৃষ্টির রহস্য হ'লো—তুমি তোমার স্বাদ আর তৃপ্তি নিয়ে অনন্ত বিশ্বের স্বাদ খুঁজে পাবে। অনন্ত বিশ্বলোকে অনন্ত স্বাদ রয়েছে, সেই স্বাদের ধারা অনুযায়ী যাতে অগ্রসর হ'তে পার, তার জন্যই এখানকার তৃপ্তি। এসব দিয়ে ভগবান বা দেবতার বিচার হয় না। মহাপুরুষরাও বিয়ে করেছেন, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র আছে। সূর্য স্বয়ং কি করছেন? সূর্য তাঁর নিজস্ব তাপ-উত্তাপ বিকিরণ দ্বারা, নিজস্ব শক্তির দ্বারা সৃষ্টির মাধ্যমে মাত্রার ভিতর দিয়ে গভীর সঙ্গম করছেন। এই সঙ্গমে প্রকৃতি-পুরুষের মাধ্যমে সূর্য নিজে আছেন। আকাশ-বাতাস-জল-স্থল সঙ্গম করছে। কিভাবে সঙ্গম করছে? নব নব রূপে রূপান্তরিত হ'য়ে সঙ্গম করে যাচ্ছে। সেই ধারা আমাদের সবার মধ্যেই আছে। আমরা একটা ধারা অবলম্বন করে এগিয়ে যাচ্ছি। তাহ'লে সৃষ্টির ধারা সকলের মধ্য দিয়ে কার্যকরী হচ্ছে। আমরা যাতে সজাগওয়ালাকে এই সজাগ দ্বারা সজাগ রাখতে পারি, তার জন্যই কাজ। মহাপ্রভুর স্ত্রী ছিল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভালবাসতেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে কি তিনি স্বামী-স্ত্রীর মত

ভালবাসতেন না? মহাপ্রভুর কাম-ক্রোধ-লোভ সব ছিল, তবু তিনি ভগবান হয়েছেন। আর এখানে সাধুরা বলছেন—এ সবে ভগবান পাওয়া যায় না।

মাত্রার মধ্যে যেটা থাকবে, সেটা দোষের নয়। মাত্রাছাড়া হওয়াটাই দোষের। এখানকার কথায় তোমরা যাবেই না। অসার থেকে সার হয়। বিশ্বের সব জিনিষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে—তার থেকে ভালটা টেনে নাও।—'এ ক'রলে ভগবান পাওয়া যাবে না', 'সে ক'রলে দোষ হবে'—এই সব নিয়ে মাথা ঘামাবে না, এসব নিয়ে সন্দেহে দ্বন্দ্বে যাবে না। তোমাদের মনের মধ্যে যত আজেবাজে চিন্তাই উঠুক না কেন, তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না,—কিন্তু যদি সন্দেহে দ্বন্দ্বে যাও, তা হ'লেই ভয়ের। 'আমার মনে এতো আজেবাজে চিন্তা—আমার কিছু হবে না'—এই সন্দেহেই যাবে না। সন্দেহই নামিয়ে দেয়, সন্দেহতেই হুচোট খায়। মনের ভিতর কি হচ্ছে-না হচ্ছে সেদিকে খেয়াল ক'রোনা। তোমরা চির পবিত্রতার মধ্যে রয়েছ। কতকগুলি বিরুদ্ধশক্তি আছে সেইগুলি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, ঐগুলিকে মেসেঞ্জার বলে। যেমন রক্তের মধ্যে শ্বেত-কণিকা রক্ত-কণিকা থাকে, শরীরে কোন জার্ম (germ) ঢুকতে থাকলে ঐ কণিকাগুলো ভীষণভাবে যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করার জন্য। তোমাদের মধ্যেও বিরুদ্ধ শক্তি আসবার চেষ্টা করবে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার জন্য। এই বিরুদ্ধ শক্তি বাতাসেই থাকে। তোমাদের ভিতরে যখনই ফুটতে আরম্ভ করবে, তখনই এই বিরুদ্ধ শক্তি আসবে। জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষের ভক্ত-শিষ্যদের পিছনে বিরুদ্ধশক্তি আসবেই—মেসেঞ্জার আসবেই। কারণ, অল্পেতেই সিদ্ধি লাভ, অল্পেতেই মুক্তি কিনা, তাই মেসেঞ্জার এসে বাধা দিতে চায়।

জীবনে একটি কথা মনে রাখবে—সেটা হ'লো, গুরু, পিতা এবং মাতা এঁদের বিরুদ্ধে যদি কেউ কোন কথা তোমাদের বলে, তবে সে কথা বিশ্বাস ক'রো না, সে কথা শুনে মা-বাবা-গুরুকে অবিশ্বাস ক'রো না, তাঁদের সন্দেহ ক'রো না।

কৃষ্ণের এক ভক্ত কৃষ্ণকে সন্দেহ ক'রলো—কৃষ্ণ কেন এতো মেয়েদের নিয়ে থাকেন—গোপিনীদের নিয়ে থাকেন, কৃষ্ণ কেন রাধাকে নিয়ে থাকেন? এই কথা সেই ভক্ত নারদের কাছে বললো। নারদ কিন্তু কৃষ্ণকে ভালভাবেই জানে, তবু সেই ভক্তের সন্দেহ দেখে তার দ্বন্দ্ব দেবর্ষি আরও বাড়িয়ে দিল। ফলে ভক্তটি আর কৃষ্ণের কাছে যায় না। কৃষ্ণ বুঝতে পেরে বললেন— তোর মাথাটা আরও পরিষ্কার কর্। সেই ভক্তটি তবু কৃষ্ণের কাছে যায় না। তাতে কৃষ্ণের কি এলো গেলো? কৃষ্ণ যে ভগবান সেই ভগবানই। তাই দেখ, এইভাবে বিরুদ্ধ শক্তি এসে গুরু-শিষ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ক'রে বিভেদ সৃষ্টি ক'রে দেয়।—এটাই মেসেঞ্জার।

অবতার যাঁরা, মহাপুরুষ যাঁরা, তাঁরা কখনো এতোটুকু অন্যায় কাজ ক'রতে পারেন না—কখনো তা করেন না। লোকে তাঁদের যাই বলুক, লোকের কথায় তাঁদের দেবত্ব নষ্ট হবে না। অবতার যাঁরা, তাঁদের দেবত্ব ঠিক থাকবে। কৃষ্ণের কাছে গোপিনীরা আসতো ব'লে যে যাই বলুক, কৃষ্ণ জানতেন—তিনি ভগবান।

আমার কাছে কতো ছেলে-মেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দেখেছ তো তোমরা? দেবতা জ্ঞানে, পিতা জ্ঞানে তারা সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই দেখে কোন একজন গিয়ে যদি বলে—দেখলাম বালক ব্রহ্মচারীর কাছে মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে—সেই কথা শুনে যদি আর একজনের সন্দেহ হয়, তবে সে কথার কোন মানে হয় না। আমার সন্তানরা আমার কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাতে আমি একদিনও চিন্তা করিনি—আমি অপবিত্র হয়ে গেছি। আমি সূর্যের মতনই স্বচ্ছ হ'য়ে সর্ব্বদা রয়েছি। আমি জন্মের থেকে যে সুর নিয়ে এসেছি, সেই সুর, সেই সত্য জগতের কাছে জানাচ্ছি। আমার জ্যাঠা, খুড়া, পিসে, মেসো, বড় ভগ্নিপতি এবং মাষ্টাররা সকলে আমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে। তাদের অনেকেই এখনো জীবিত আছে। আট বছর বয়স থেকে আমি দীক্ষা দিচ্ছি।

রাধা-কৃষ্ণের মিলনকে এখানে যে অপব্যাখ্যা করেছে—সেই রকম সেটা নয়। রাধার যে প্রেম, রাধার যে ভক্তি, কৃষ্ণ সেই প্রেমকেই আলিঙ্গন করেছেন, সেই প্রেমকেই রাধা রূপে সম্মুখে দেখতেন, রাধা তখন কিন্তু অনেক দূরে। আবার রাধা সব সময় কৃষ্ণকে কাছে পেতেন। কৃষ্ণকে যখন রাধা কাছে পেতেন, তখন কিন্তু রাধা কৃষ্ণের থেকে অনেক দূরে আছেন। তবে তিনি কি করে কৃষ্ণকে কাছে পেতেন? মনে কর কৃষ্ণ এক লক্ষ মাত্রা। রাধা কৃষ্ণ-ধ্যানে কৃষ্ণ-জ্ঞানে, কৃষ্ণকে ভালবেসে লক্ষ-মাত্রা হয়ে গেছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে যেই রাধার মাত্রা এক হলো, অমনি তিনি তাঁর কাছে কৃষ্ণকে সব সময় দেখতে পেতেন। যেভাবে আয়নাতে মুখ স্পষ্ট দেখা যায়, সেই রকম রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আয়না হয়ে গেছেন, তাই তাঁর মধ্যে সব সময় কৃষ্ণকে দেখতে পেতেন; কৃষ্ণ হয়তো তখন পাঁচশত মাইল দূরে আছেন। রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতেন—হাসতেন, তাই শুনে আয়ান-জটিলা-কুটিলার সন্দেহ হতো। তারা তখন রাধার ঘরে এসে চুপি দিত। রাধা লক্ষ মাত্রা হয়ে কৃষ্ণের মাত্রার সঙ্গে এক মাত্রা হ'য়ে মিশে গিয়েছিল, তাই এক মাত্রা হওয়াতে কৃষ্ণকে কাছে দেখতো আয়নার মতন। আর আয়ান-জটিলা-কুটিলা তারা লক্ষ মাত্রা হতে পারেনি, কিন্তু কাছাকাছি ছিল। তারা সত্তর-আশি হাজার মাত্রায় ছিল, তাই তারা কৃষ্ণকে দূরে দেখতো। কিন্তু বুঝতে পারতো না, তাই রাধাকে দিত গঞ্জনা;—ভাবতো, সত্যি বুঝি কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে বসে গল্প ক'রছে।

সত্তর-আশি হাজার মাত্রাতে তারা ছিল বলে কৃষ্ণকে তারা অনুভব করতো, ধরতে পারতো না। মনে কর, এই দেওয়ালটা পাঁচশত মাত্রাতে আছে—তুমি যদি পাঁচশত মাত্রাতে যাও, তবে তুমিও দেওয়াল হয়ে যাবে। মনে কর একটা হরিণ চল্লিশ মাত্রাতে আছে, কেউ যদি চল্লিশ মাত্রাতে যায় তবে সে হরিণ হয়ে যাবে।

সেই যে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন, রাধা এদিক ওদিক ক'রতেন—কৃষ্ণ আকাশের রং-এ মিলিয়ে গাছে বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন—এসব কথা কেন এলো? রাধা কৃষ্ণ-চিন্তায়, কৃষ্ণ-ধ্যানে কৃষ্ণের মত হ'য়ে গেছেন, তাই সব সময় কৃষ্ণকে দেখতেন। রাধা-কৃষ্ণের যে প্রেম, এই প্রেম হচ্ছে—প্রকৃতি খুঁজছে কোথায় সে অনন্ত মহাসুর বাজছে; সেই অনন্ত মহাধ্বনির

সুর যখন রাধা শুনতে পেলো, তখন মনে হ'লো আকাশ যেন কাছে নেমে এসেছে, এসে বলছে—তুমি আমায় খুঁজছ? ঐ সুর তুমি সব সময় শুনতে পাবে, আমি তোমাকে পাগল করে দেব। তাই রাধা পাগলিনী হয়ে গেলেন, পাগলিনী রাধা নাম পেলেন।

পার্ব্বতীও সেই ডুগডুগীর আওয়াজ শুনতে পেতেন, ত্রিশূল হাতে শিব দাঁড়িয়ে আছেন দেখতে পেতেন। তাঁরাই শুধু দৃষ্টান্ত নন। এই যে বাতাস হু হু করে বয়ে যাচ্ছে— এই গর্জ্জন কোথা থেকে এলো? আকাশের ঝড় এই ছোট গর্ত্ত দিয়ে (নাকের ছিদ্র দিয়ে) বয়ে যাচ্ছে এতটুকু খাল-গঙ্গা, তা দিয়ে বান হয়ে যায়—এটা কোথা থেকে এলো? আমাদের মহাসাগর সামনে,—এই এতোটুকু নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে বান বয়ে যায়—এর মধ্যে রয়েছে মহাশূন্যের বান। আমরা তারই সাধনা ক'রবো।

কৃষ্ণ আকাশ, সৃষ্টির ধারাতে রাধা—তাই রাধা প্রকৃতি,—পুরুষ-প্রকৃতি। রাধা-কৃষ্ণের মিলন—প্রকৃতি পুরুষের মিলন। এতো বড় বিরাটকে ধারণায় আনা অসুবিধা, তাই নিয়ে এলো মূর্ত্তির মাধ্যমে।

ভগবান বলেছেন—আমি একা শুধু ভগবান নই, সবাই ভগবান, ভগবানের ভগবত্তা সকলের মধ্যেই আছে। ভগবান বলেছেন—আমি যে দ্বার দিয়ে এসেছি, তোমরাও সেই দ্বার দিয়ে এসেছ। যে কামের দ্বার দিয়ে ভগবান এসেছেন, সেই কামের দ্বার দিয়ে জীবজগৎ এসেছে। মনে রাখবে কামকে কখনো বাদ দেওয়া যায় না। এখানে যারা বলে 'কাম ত্যা কর', তারা কামের অর্থ জানে না। কাম সর্ব অঙ্গে—দর্শন-স্পর্শন-ঘ্রাণ-স্বাদ সবই কাম। কা না থাকলে ভগবানকে ডাকা যেত না। কাম হ'চ্ছে ভগবান, কাম হচ্ছে চেতন, কাম হ'চে তৃপ্তি—সর্ব অঙ্গের তৃপ্তিটাই কাম। ভগবানকে ডেকে যে তৃপ্তি, সেটাও কাম। কাম হ'চ্ছে নুন—নুন না দিলে যেমন তরকারী বিস্বাদ হয়, তেমনি কাম না থাকলে সব বিস্বাদ হয়ে যেতো। নুন যেমন ইচ্ছামত এক খাবলা দেওয়া যায় না, মাত্রা মতন যেমন নুন দিতে হয়, তেমনি মাত্রা মতন থাকবে। একটা ফুল শুঁকে বললে—বাঃ চমৎকার!—এটাই কাম। একটা জিনিষ দেখে ভাল লাগলো, বল্লে—বাঃ— কি সুন্দর! এটাও কাম। যে কোন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিটাই কাম। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক,—সবই ইন্দ্রিয়। ভালোবাসাটাই হলো কাম। কৃষ্ণের ভালবাসা—কৃষ্ণের প্রেম, সেই প্রেমের কাছে সবাই ধরা দিল,—এই ভালবাসা দিয়ে কৃষ্ণ সবাইকে উদ্ধার করে দিলেন। রাধা-কৃষ্ণের মিলন যে কি, তা এখানে জানে না, তাই অপব্যাখ্যা করে। কৃষ্ণের প্রেম, কৃষ্ণের ভালবাসা কত শুদ্ধ-পবিত্র ছিল, তা জানে না। শুধু মানুষ নয়, এই প্রেম দিয়ে তিনি জীব-জন্তুকে পর্যন্ত উদ্ধার করে দিয়েছেন।

দ্বার হ'লো দুটো—নিম্নদ্বার আর ঊর্দ্ধদ্বার। নিম্ন দ্বারে মূলাধার—ভগবান বসে আছেন। গুহ্যদ্বার আর হিসির দ্বার (প্রস্রাব দ্বার), তার মাঝখানে ভগবান বসে আছেন ঊর্দ্ধদ্বারে মুখ রেখে ঊর্দ্ধমুখী হ'য়ে। ভগবান বসে আছেন হাত জোড় করে সহস্রারে মুখ রেখে—সহস্রারে ওঠার জন্য।

তোমরা নাম কর'বে, জপ ক'রবে—তবেই পাবে সেই ভগবানের সাড়া।

প্রশ্ন ঃ—আমাদের এই যে এত চাওয়া, এটা সেটা চাই—চাওয়ার শেষ নাই, এত চাহিদা কেন হয়?

উত্তর ঃ—সবার এত চাহিদা কেন হয়? এই শূন্যের কখনো শেষ নেই। কোটি কোটি মাইল—আরো কোটি মাইল গেলেও শূন্য শেষ হয় না। এই শূন্যকে পৃথিবী দিয়ে, গ্রহ-নক্ষত্র দিয়ে,—পৃথিবীতো একটা নয়, অনন্ত পৃথিবী—কোন কিছু দিয়েই ভরতে পারে না। স্রষ্টা এতো সবকিছু দিয়েছেন, কিন্তু তবু যে আরো চাহিদা থেকে যাচ্ছে, তার কারণ হ'চ্ছে, এমন একটি চাহিদা পূরণের স্থান আছে, সেই স্থানে না যাওয়া পর্যন্ত চাওয়ার শেষ নেই। এই শূন্যকে পূর্ণ করার জন্য পৃথিবী, সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র সবাই সেই ঊর্দ্ধমুখী হ'য়ে শূন্যকে পূরণ করতে চাইছে, কিন্তু পূরণ আর হ'চ্ছে না। কোন কিছুই শূন্যকে পূরণ ক'রতে পারছে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, একটা জিনিস শূন্যকে পূর্ণ করে রেখেছে। সেটা হচ্ছে শব্দ। শব্দ এই শূন্যের ভিতর অবিরাম বয়ে চলেছে। সে শব্দ শোনা যায় না;কিন্তু শোনা না গেলেও বুঝতে হবে, শব্দ এই শূন্যের ভিতর পূর্ণ হ'য়ে রয়েছে। বাবার বাবাকে দেখেছ, তাঁর বাবাকে দেখনি বলে তো, তাঁর বাবা নেই—একথা বলা চলে না। না দেখলেও বাবার বাবা, তাঁর বাবা—পর পর এ ভাবে আছেই। এখানে সবাই যে শব্দ ব্যবহার ক'রছ, তার থেকেই বুঝতে হবে এই মহাশূন্যে শব্দ অবিরাম বয়ে যাচ্ছে। এই শব্দই রূপের পর রূপ নিচ্ছে। রূপের কারণই হ'চ্ছে শব্দ-ধ্বনি। সেই শব্দ-ধ্বনিই হ'চ্ছে কীর্তন, নাম, জপ। এই ধ্বনিতেই জীব জগৎ সবাই একসুরে রয়েছে, এই ধ্বনিই জগতে রূপ নিয়েছে। এই ধ্বনিই মহাশূন্য থেকে জমাট বেঁধে রূপ নিয়েছে। ধ্বনি রূপ নিয়েছে বলেই রূপের কোন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। খুঁজতে গেলে সবই ফাঁকা। মন থেকে সৃষ্টি, তাই মন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত। মন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়েই ভাব-ভালবাসা-প্রেম জন্মালো, তারপরই সৃষ্টি আরম্ভ হল। সেতারে এসরাজে একতারাতে যেমন তার থাকে—সেই তারে যেমন সুর থাকে, সেই তার বাজালে যেমন সুর বের হয়, তেমনি আমাদের দেহের তার হচ্ছে এই নাক-চোখ-মুখ-কান;এগুলো হলো তার। নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকলে—বাঃ! কী সুন্দর গন্ধ!— এটা একটা ধ্বনি। চোখ দিয়ে দেখ্লে—বাঃ! কী সুন্দর দৃশ্য!—এটা একটা ধ্বনি। মুখে ডাক দিলে—এদিকে এসো, এটা যেমন ধ্বনি, হাতের ইসারাতে ডাক দিলে সেটাও ধ্বনি। এই সব ধ্বনি জমাট বেঁধেই এই দেহ তৈরী। এই ধ্বনি দিয়েই আমরা সকলের সঙ্গে আদান-প্রদান ক'রছি, ধ্বনিরই ব্যবহার ক'রছি। ভাষার মাধ্যমে বুঝাটা যেমন ধ্বনি, আবার হাতের ইসারাতে বুঝানোটাও ধ্বনি। ধ্বনি যে কত রকম ভাবে ব্যবহার হচ্ছে! শব্দে, ভালবাসায়, আদরে—সবই ধ্বনির কাজ। চোখ, নাক, কান, মুখ—সবই ধ্বনির কাজ। যে ধ্বনি দিয়ে সব বস্তুর সৃষ্টি, সেই ধ্বনি, যেখানে কিছু নেই শুধু ফাঁকা, সেই ফাঁকা থেকেই জমাট বেঁধে রূপ নিয়েছে। ধ্বনিটা কি রকম ভাবে এসেছে? যেমন দুধে মাখন থাকে, সেই দুধকে ঘ্যাস ঘ্যাস করে টানলে (মন্থন ক'রলে) যেমন মাখন বের হয়ে দুধেই দলা হয়ে ভাসে, তেমনি তোমরা দুধের মতন হ'য়ে এসেছ। এখন এই যে ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ তোমাদের টান চলছে, কেমন টান?—হায়-হুতাশ, রোগ, শোক, ঝন্‌ঝাট। এমন কেউ নেই

যার রোগ-শোক নেই। পিসি, মাসি, ছেলে, খুড়া, জেঠা—কারো না কারো কেউ না-কেউ মরেছে। এই টানাতে তোমরা মাখন হ'য়ে সেই শূন্যে, যেখান থেকে দুধ রূপে এসেছিলে, সেই শূন্যেই আবার ভাসবে। আঘাত না দিলে মাখন হয় না, তাই জীবনে আঘাতের খুব প্রয়োজন আছে। আঘাত একভাবে না-একভাবে জীবনে থাকবেই।

একটা বীজ পুতলে সেই বীজে গাছ হ'য়ে আবার হাজার বীজ হয়। তাহ'লে একটা বীজের থেকে কতো সৃষ্টি হ'ল! সেই রকম এই শূন্যের একটাই শব্দ, তার থেকে এই অনন্ত জগতের অনন্ত সৃষ্টি, এক সুর থেকে সবার সৃষ্টি, তাই সবার সঙ্গে এক সুরে সবাই গাঁথা। কিন্তু আমরা এখানে কি ক'রছি? সেই এক সুরকে বেসুরো করে ফেলছি। যেমন 'জনগণমন'—গান হচ্ছে সেতারে, বেহালায়, তানপুরা সরোদ এস্রাজ হারমনিয়ামে;—যদি সবাই এক সুরে গাইতে থাকে, তবে সুন্দরভাবে 'জনগণমন' গান হবে এবং সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আর যদি সব যন্ত্রে এক সুর না দিয়ে যার যেখানে খুশি টিপ দেয়, তবে বেসুরো বাজবে। কেউ শুনবে না, সবাই চলে যাবে। সুরটাও ঠিক তেমনি। তোমার ব্যবহারিক জীবনে সবার সঙ্গে যদি সুর মিলিয়ে চ'লতে পার, সেটাই হ'লো সুন্দর। বাবাকে বাবার সম্মান দিয়ে তাঁর পূজা কর, মাকে মার সম্মান দিয়ে তাঁর পূজা কর, স্ত্রীকে স্ত্রীর সম্মান দাও, ছেলে-মেয়ে সবাইকে যার যা প্রাপ্য তাই দাও,—এটাই হ'ল সুরে মেলানো। অনেক বউ আছে স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হয়, অনেক মা আছে বউ-এর দ্বারা, ছেলের দ্বারা নির্যাতিত হয়, আবার অনেক বউ আছে শ্বাশুড়ি-শ্বশুরের দ্বারা নির্যাতিত হয়। কাজেই কারো সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে না। এটা অপরাধ। সবাইকে ভালবাসবে, সবার সঙ্গে মিল রেখে চলবে—দেখবে খুব ভাল লাগবে। আমার এক শিষ্য, সে তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা থাকে। সে ছয়শত টাকা বেতন পায়, আর তার মা লোকের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে করে খায়, ছেলে আর বৌ তাকে দেখতে পারে না। সেই বউ একদিন একটা দামী শাড়ী পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি তাকে বলেছি—তুমি এই দামী শাড়ি পরে এসেছ, তোমার লজ্জা করছে না,—তোমার শাশুড়ি ভিক্ষে করে খায়! তাদের ব'ললাম—তোমরা যদি মায়ের উপর এই রকম ব্যবহার কর, তবে তোমরা আমাকে পাবে না। আমাকে পেতে হ'লে মাকে ভালবাস, মাকে ভালবাসলে আমি খুশী হব। সেই থেকে ছেলে আর বউ মাকে যে কী সেবা করে, তা আর কি বলবো! তার মা এসে আমাকে বললো,—আমি যে এখন কত সুখী? ছেলে-বউ আমার জন্য সর্বদা ব্যস্ত,—কি খাওয়াবে, সেবা করে। কখন খাবো, না খাওয়া পর্যন্ত ওরা খায় না, প্রাণ দিয়ে আমার বউমা এবং ছেলে আমার সেবা করে। আমি সেই ছেলে-বউকে বললাম—তোমাদের মুক্তি হবে, তোমাদের সিদ্ধি হবে, তোমরা সুরকে ঠিক রেখেছ।

এই সুরের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে মিলতি আছে, ধ্বনির সঙ্গে মিলতি আছে। মিলতি না হ'লে যেমন বাজনা ভাল লাগে না, এটাও হচ্ছে তেমনি সঙ্গৎ। প্রত্যেককে ভালবাসবে। আগে ঘর দেখবে, তারপর আত্মীয়-স্বজনকে দেখবে, পরে পাড়া দেখবে, তারপর গ্রাম দেখবে। এই ভাবে ছড়িয়ে পড়। যার যেমন সাধ্য সেই ভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

সবার সঙ্গে যে প্রেম-ভালবাসার বন্ধন—এটাই হলো তৃপ্তি এবং সুরে সুর মিলিয়ে থাকা; আর এটা না হ'লে সেটা হ'লো বেসুরো,—তাল কেটে যাওয়ার মতন। কণা কণা মাটি নিয়েই চর পড়ে যায়। কণা কণা সুরকে তাই ধরে রাখবে। অন্য প্রসঙ্গ বলি।—সূর্যের ভিতর সব সময় একটা ধ্বনি আছে, সূর্যের তেজ যে প্রতিটি কণিকার ভিতর দিয়ে তেজ সরবরাহ করে, সেই তেজ ক্রমশঃ ক্রমশঃ কণিকার ভিতর দিয়ে এই পৃথিবীতে আসছে। প্রতিটি তেজ কণিকাতে শব্দ আছে, ধ্বনি আছে। ঐ ধ্বনিত বিষয়বস্তুই সুর। সুর কি করে?—লাঘব করে। মনে রেখো, প্রতিটি তেজ-কণিকাতে শব্দ আছে—ধ্বনি আছে। তেজ কণিকার থেকে যে জিনিস আবির্ভূত হয়, সেই জিনিসকে আশ্রয় ক'রে একটা বিষয়বস্তু বহির্গত হয়। সূর্যের ভিতর সব সময় যে ধ্বনি হচ্ছে, সেই ধ্বনি আমাদের ভিতর আছে। আমাদের সঙ্গে তাই সূর্যের সম্পর্ক আছে। যেখানে সম্পর্ক থাকে, সেখানে যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকে। তবে গ্রহ-উপগ্রহে কেন যেতে পারি না? দর্শনে যেতে পারি, অনুভূতিতে যাচ্ছি, কিন্তু তাতে তুষ্ট হওয়া যায় না, আমাদের বুঝটা সজাগ হয় না। যে জিনিস মনের মধ্যে চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দর্শনে, অনুভূতিতে আসে, সেখানে সহজে যাওয়া যায়। সে সমস্ত বিষয়বস্তু থেকে আমরা এই জগতে এসেছি, এই দেহ যোগাযোগ সূত্রে সেই-সব বিষয়বস্তু দ্বারা গঠিত আছে বলেই দেহের রূপান্তর হ'চ্ছে, পরিবর্তন হ'চ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পরিবর্ত্তনের সাথে, ব্যক্তিত্বের সাথে, নিজের বুঝের সাথে বুঝ না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলছে। আমরা যদি সেই সূত্র ধ'রে অগ্রসর হই, তবে সব জায়গাতেই আমাদের গতি হবে। এই বাড়ীর দেওয়াল বেয়ে ওঠা আর সিঁড়ি দিয়ে ওঠা ভিন্ন রকম। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে বাড়ী যত তলাই হোক না কেন, উঠতে পারবে। যাওয়ার গতি যদি ঠিক থাকে, বুঝ যদি ঠিক থাকে, যেতে পারবে। সেই মহাজগতে এমন সিঁড়ি রয়েছে, তা দিয়ে ঐ সিঁড়ি ধ'রে ধ'রে আমরা সহস্রারে ঠিকই পৌঁছাতে পারবো। সিঁড়িকে বাদ দিয়ে যদি এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করি, কোন দিনই পৌঁছাতে পারবো না। তাই আমাদের চিন্তাধারা, মূলাধার-সহস্রার এই যে সপ্তচক্রের মাঝ দিয়ে দেহেতে মানচিত্রের পরিচয় দিয়েছে, সেই পরিচয়ের মাধ্যমে যদি যায়, সিঁড়ির ধাপে ধাপে যদি অগ্রসর হই, আমরাও পৌঁছাবো। সমস্ত যোগীরা, ঋষিরা এই যোগসূত্র ধ'রে ধ'রে পৌঁছে গেছে। আমরাও তারই পথিক। আমরাও সেই পথ ধ'রে অগ্রসর হবো মহাতীর্থে। সেই সিঁড়ির পাশে তোমরা বসে আছ, সেই সিঁড়ির পাশে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ। তোমরা খুঁজে খুঁজে এগিয়ে যাও; খুঁজে পাবে। সেই সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যাও। সুতরাং নাম কর, জপ কর। সংসারের সব কিছুই সাময়িক। বুঝিয়ে দিচ্ছে—এই ইন্দ্রিয়ের মাতোয়ারা সাময়িক—সব মুছে যাবে।

সূর্য যে জিনিষ সৃষ্টি ক'রতে পারে, তা আবার লয় ক'রতে পারে। সেই সূর্যশক্তি নিয়ে যাঁরা আসেন, তাঁরা সবাইকে কোল দিয়ে দোষমুক্ত ক'রে জানার পথে, মুক্তির পথে নিয়ে যান। তোমরা সেই পথের পথিক। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে সেখানে পৌঁছাবে। তোমরা সূর্যের সাথে, আলোর সাথে যুক্ত হ'য়ে আছ। তাই এই ভবরোগ থেকে এক মুহূর্তে রোগমুক্ত হ'য়ে

যাবে। যে বিষয়বস্তু হ'তে জীবাণু সৃষ্টি হয়, রোগ সৃষ্টি হয়, সেই বিষয়বস্তু হ'তেই রোগ নিবারণ হয়। এই যে অণিমা-লঘিমা অষ্টসিদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, এঁরা মহাতীর্থের সঙ্গে যুক্ত ক'রে ভবরোগ হ'তে মুক্ত ক'রে আলোর পথে নিয়ে যান; যে সমস্ত বিষয়বস্তু আটকিয়ে রেখেছে, সেই সমস্ত বিষয়বস্তু হ'তে মুক্ত করে নিয়ে যান। সুতরাং তোমরা সেই ভাবেই আছ। যাবে নিশ্চিন্ত থাক, কাজ ক'রে যাও। **বীজ যখন দিয়েছি—ফুটবেই। দরজা তোমাদের খোলা, দর্শন তোমাদের হবেই। কাজ ক'রলে একটু তাড়াতাড়ি হয়, আমার একটু লাঘব হয়। নতুবা একটু দেরী হয়। তবে বীজ তোমাদের ফুটবেই। তোমরা জপ ক'রবে, ঘুমের আগে ব'সে জপ ক'রবে। ঘুমের মধ্যে যখন জপ চ'লতে থাকবে টিক্ টিক্ ক'রে, তখনই সার্থক হবে, তখনই যোগাযোগ হবে।** যোগাযোগের পথ এমনিভাবে রয়েছে, এমন সুন্দরভাবে রয়েছে তোমাদের কাছে! সাগরের দ্বারে দ্বারী হ'য়ে রয়েছ; দ্বার তোমাদের কাছে, চাবী তোমাদের হাতে, একটু খুলে দাও—দেখবে সামনেই সাগর। এই জাগ্রত অবস্থা ঘুমের সাথে মিশিয়ে দাও, তাহ'লেই দেখবে সাগরে পৌঁছে গেছ; দেখবে কি অপূর্ব সুন্দর, কতো আনন্দ পাবে! এটা পাওয়া অতি সহজ। ঘুম-সমাধিটা এতো সুন্দর সমাধি,—এই সমাধি স্রষ্টা তোমাদের দান করেছেন। এই সমাধিটা কাজে লাগিয়ে দাও, তার ভিতরে নামটা দিয়ে দাও। দেখ, এই যে বাড়ী ক'রতে ভিত গাঁথে, কুড়ি তালা বাড়ী ক'রতে মাটির নিচে দুই তালার খরচই চলে গেল। কেন গেল? কুড়ি তালাকে ধ'রে রাখার জন্য। ভিত পাকা হলে কুড়ি তালাকে বহন করে। মন্ত্রও তাই বার বার উচ্চারণের দরকার। মন্ত্র সাধতে সাধতে অনন্ত শক্তির রেশ বা সুর যে বয়ে যাচ্ছে, সেই সুর বিরাটের সুরের সঙ্গে বিশে যাবে। সা-রে-গা-মা আগে শিখে সাধা হয়ে গেলে পরে যেমন 'জনগণমন' গান শেখে, গানে কিন্তু তখন সা-রে-গা-মা-বলে না, 'জনগণমন' -তেই সা-রে-গা-মা মিশে থাকে, তেমনি বীজমন্ত্র বার বার উচ্চারণ ক'রতে থাকলে সাধা হ'য়ে যাবে এবং বিরাটের সুরের সঙ্গে মিশে যাবে। 'জন-গণমন'-গানে কি ক'রে সা-রে-গা-মা মিশলো তা যেমন বুঝার দরকার নেই, সাধা হ'য়ে গেলে সেটা যাবেই, তেমনি মূলমন্ত্র বারে বারে সাধতে সাধতে সুরের যে রেশ বয়ে যায়, সেই সুর বা রেশ মহাসুরের সঙ্গে মিলে যায়। কেমন কোরে যায়, সেটা বোঝার দরকার নেই—সেটা যাবেই।

অণিমা-লঘিমা-গরিমা সব মানুষের মধ্যেই আছে, সর্ব শক্তি নিয়েই মানুষ আবির্ভূত। জল-বাতাস-মাটি হ'তে জীব সৃষ্টি হ'য়েছে, সেই সব বিষয়বস্তুর অণিমা শক্তি আছে, তাই জীবের মধ্যেও অণিমার শক্তি আছে। সেই অণিমা শক্তিকে সাধনার বলে—সিদ্ধির বলে অণিমার অণু হ'য়ে মিশে যাওয়া যায়। সাগর অণু হ'য়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছ না। যখন বৃষ্টি হয়ে, শিলা হয়ে পড়ে—তখন বোঝ। সেই সূর্যশক্তি যদি আমাদের মধ্যে প্রবাহিত ক'রে সমস্ত রক্ত-মাংস-মজ্জাকে টেনে টেনে অণু ক'রে নিয়ে যাওয়া যায়, তবেই মিশে যাওয়া যায়। অণিমা শক্তি দিয়েইতো আমাদের দেহ গড়া, তবে কেন আমরা অণু হ'তে পারবো না? একবার আমি ছোট থাকতে দেশের বাড়ীতে ঘরে বসে আছি। সেই ঘরে

আমাকে পড়াতেন মাষ্টার মশায় কৃষ্ণধন সাহা, এখন তোমাদের সামনেই তিনি বসে আছেন। এই মাষ্টার মশায় এবং আমার জ্যাঠামশায়ও ছিলেন, আরো কয়েকজন ছিল,—আমি সবাইকে ব'ললাম—আমাকে আপনারা ধরে রাখুন, কিন্তু দেখবেন—আমি ঘরে বসে আছি, আবার বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তারাতো ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে খিল এঁটে দিয়ে আমাকে আসনে বসিয়ে সকলে জড়িয়ে ধ'রে রেখেছে। আমি আর এক আমি হ'য়ে বারান্দায় গিয়ে ডাক দিলাম—জ্যাঠামশায়, আপনারা আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন, আমি কিন্তু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ঘর তখনও ভিতর থেকে খিল বন্ধ করা। জ্যাঠামশায় বল্লেন—তুমি ক্যাম্‌নে গেলে? ব'ললাম—এটা অণু শক্তির কাজ। আমার মাষ্টারমশায়ের কাছে তোমরা গল্প শুনেছ, তাই ব'ললাম। আমার বয়স তখন ৫/৬ বছর ছিল। কতোরকম বিভূতি তখন আমার আপনা আপনি হোয়ে যেত! এই যে আমার ছোট বেলার অণুশক্তির কথা শুন্‌লে, এই শক্তি কিন্তু সবার মধ্যে আছে, তোমাদের মধ্যেও আছে। মনে রাখবে, যারা অণিমাশক্তি থেকে আসে, আবার অণিমাশক্তিতে মিশে যায়, তাদের মধ্যে অণিমা অর্থাৎ অণুশক্তি আছে। তোমরাতো আর এতোবড় হ'য়েই মায়ের পেট থেকে আসনি! পেটে আসার আগেও তো ছিলে। অণু হয়েই ছিলে। তাই অণুশক্তি তোমাদের সবার মধ্যে আছে। মনে রাখবে—যারা অণু হয়ে আসে, অণু হয়ে যায়, তাদের মধ্যে অণুশক্তি আছে। এই শক্তিকে তোমরা যদি বাড়াতে পার, তবে তোমরাও যা খুশি তাই ক'রতে পারবে। দেখনা, জল আর বরফ—সবইতো জলই। কিন্তু জলের মতন বরফ পারে কি গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে? জল জমাট বেঁধে শক্ত হ'য়ে আছে। তোমাদের শক্তি জমাট বেঁধে আছে। নামেই সেই শক্তি জাগে। সদা সর্ব্বদা নাম করবে। ভুলে যেওনা, আমরা পথিক—যাত্রিক হয়ে এসেছি।

একটা কুটাও সঙ্গে নিতে পারব না। আমাদের এই দেহও রেখে যেতে হবে। নিন্দা অপমান কিছুই থাকবে না। তাই মহাকীর্তনের মহানাম নিয়ে এগিয়ে চল। এই নামের মাহাত্ম্য কত দেখবে। —স্বয়ং স্রষ্টা এসে তোমাদের নিয়ে যাবেন।

দেখ, এই পৃথিবীর বুকে যত মহান এসেছেন, এই দেহ নিয়েই তাঁরা এসেছেন, এই রক্ত থেকেই তাঁরা এসেছেন। তবে কেমন করে তাঁরা মহান হ'লেন—দেবতা হ'লেন—অবতার হ'লেন? জীব-জগতের প্রতিটি বিষয়বস্তুতে দেবতার দেবত্বশক্তি সর্ম্পূণভাবে বিদ্যমান আছে। যে বীজের থেকে তাঁরা দেবতা হয়েছেন সেই বীজকেই সাধনা ক'রতে হয়, সেই বীজকে সেবা ক'রতে হয়। বীজ স্মরণের উপর থাকলে নষ্ট হয় না। তবে কেন পূর্ণশক্তি বীজ প্রস্ফুটিত হয় না? যদি বীজের ধর্ম নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়, তবে প্রস্ফুটিত হবে—হতে বাধ্য। এই দেহেই আপনি বিকাশ হবে, আপনি স্ফুরণ হবে, এটা অনিবার্য্য। জপের যে কতো বড় শক্তি!—জপেই সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বাণ, দর্শন সব হয়। একদিন আমি রাত্রি বারটার সময় গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ ক'রে জ্যাঠামশাইকে, ঘরে একটা আলোর শিখা ভেসে আস্তে আস্তে নেমে আসছে—এটা দেখালাম। আপন সুরে মগ্ন হ'য়ে গেলেই ভিতরে ফুটতে থাকে।

জপ ক'রতে ক'রতে তোমার সুর যখন অনন্ত মহাশক্তির সুরের সঙ্গে এক সুর হ'য়ে

যাবে, তখন আপনি ফুটতে থাকবে, রূপ ভেসে আসতে থাকবে। দেখ, একটা সৃষ্টি নিম্নমুখী, আর একটা সৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখী। নিম্নসৃষ্টিতে পৃথিবী জীবজন্তুতে ভরে যাচ্ছে। আবার ঊর্ধ্বসঙ্গমেও সৃষ্টি হয়; সে সৃষ্টি অপরূপ, সেটা সন্তানের মতনই সৃষ্টি। সে সৃষ্টি হ'চ্ছে—সূর্য উদ্ভাসিত হ'য়ে আলোকিত হ'য়ে তোমার সম্মুখে আসবে অপরূপ রূপ নিয়ে। আজ্ঞা-সহস্রার স্মরণেই ঊর্ধ্ব সৃষ্টি হয়। দুটোই কিন্তু তোমার সৃষ্টি, দুটোই সঙ্গম, দুটোই কাম। তৃপ্তিই কাম। চক্ষু বুজে ভগবানকে ডাকৃছ, ডেকে আনন্দ পাচ্ছ, তৃপ্তি পাচ্ছ—এটাও কাম। তাই দেখ, দুরকম সৃষ্টিতে কতো পার্থক্য! নিম্নসৃষ্টিতে তোমার সন্তান তোমাকে প্রণাম করে, আবার ঊর্ধ্বসৃষ্টিও সন্তান তুল্যই, কারণ তুমি সৃষ্টি ক'রেছ। সেই ঊর্ধ্বসৃষ্টিতে তুমি জোড়হাত ক'রে তাঁকে প্রণাম ক'রছো। দেখ, দুই সৃষ্টিতে কতো পার্থক্য!

প্রশ্ন ঃ—এই পৃথিবীতে সবাই চায় সুখ শান্তি। কিন্তু দেখা যায় তা হয় না। পিতার বর্তমানে পুত্রের মৃত্যু, স্ত্রীর বর্তমানে স্বামীর মৃত্যু।—স্রষ্টা কি আঘাত দেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর ঃ—রংটং পাহাড়ে এক সাধকের সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা হয়েছিল। আমি সাধককে ব'ললাম—আধ্যাত্মিকের প্রথম সূত্রই হচ্ছে—কি ভাবে এই সংসারকে সাজানো যায়, এই বাস্তব সংসারকে কত ভাবে সাজাতে পারে। সাজাতে সাজাতে নিজেই সেজে যায়। নিজেকে সাজাতে হ'লে এটা সাজাতে হবে। আপনি তো সংসার সাজান নি, আপনি মায়া-মোহ কাম-কাঞ্চনের প্যাঁচে পড়েন নি, আপনি তো রোগ-শোক আঘাত-প্রতিঘাতে পড়েন নি! আপনি তো সব কিছুকে ফাঁকি দিয়ে সংসার থেকে ব'ার হয়ে এসেছেন। ফাঁকি দিয়ে বার হ'লে ভগবানকে কি ক'রে পাবেন? ফাঁকি দিলে কি ভগবানকে পাওয়া যায়? যে ভগবান সংসার সৃষ্টি ক'রেছেন, যে ভগবান রোগ-শোক সৃষ্টি ক'রেছেন, যে ভগবান আঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি ক'রেছেন, তাঁর সেই সব কিছু ওলোট-পালট ক'রে দিয়ে গাট্টি বোঁচকা বেঁধে বনে পালিয়ে এসেছেন—তাতে কোন্‌টার উপদ্রব না ভুগছেন? সবটারই তো উপদ্রব আছে। জ্বর, কাশি, দেহের রোগকে ফাঁকি দিতে পেরেছেন? কোন বৃত্তিকে ফাঁকি দিতে পেরেছেন? ঘরের থেকে না হয় ফাঁকি দিয়ে এলেন, দেহের ঘরকে ফাঁকি দিতে পেরেছেন কি? সাধক বললেন—না সেটা পারি নি, কিন্তু দেহের কোন বাধা-বিঘ্ন আমাকে আয়ত্ত করতে পারে নি, দেহের গতি আমার কোন ক্ষতি করতে পারে নি। আমি বললাম—দেহের ক্ষতি করতে পারে না বলছেন, কিন্তু আপনাকে কিছু বললে তো চটে যান। আপনার রাগ আছে; রাগটা তো এখনো র'য়েছে, তবে ক্ষতি করতে পারে না কেন বলছেন? তিনি বললেন—হ্যাঁ, রাগ আছে। বললাম—রাগ আছে, খুশি আছে, সবই তো আছে, এখনো তো সবই আছে। ঘা-আঘাত কখনো খেয়েছেন? সংসারে থেকে ঘা-আঘাত খান। সেখানে থেকে সব জিনিসপত্র নিন। ভগবানের দেওয়া খাদ্য কপি-বেগুন-দুধ-ছানা খাবেন, আর আঘাত-ব্যথা নিতে চাইবেন না? এগুলো তো ভগবানেরই দেওয়া। এগুলো যখন এসেছে তখন নিতে তো হবেই। কপাল খারাপ হলে এগুলো আসে না। কে না আঘাত পায়? কত ভাগ্যবান সবাই! আঘাত

পায়, শোক পায়, ভাল লাগে না, সমস্যা—এগুলি কি কপাল খারাপ হ'লে পায়? এটাই তো ভগবানের বড় দান যে, আমাদের জীবনের মধ্যে আঘাত চলছে, প্রতিঘাত চ'লছে, রোগ শোক দুঃখ চলছে, সমস্যা দ্বন্দ্ব সন্দেহ চলছে—এ হেন নেই যে না চলছে! কেন চলছে? বীজ থেকে ফুলটা তো ফোটে! তা'হলে আমাদের মধ্যে তো ফুল ফুটছে—এগুলি তো ফুল। কোন ফুল দেখা যায়, কোন ফুল দেখা যায় না। কেবল ফুটে আছে দেখাটাই দেখা নয়; ভাবের ভিতর যেটা যেটা প্রস্ফুটিত হয়, সেটাও ফোটা। আমাদের মধ্যে ভাবের ভিতর দিয়ে প্রস্ফুটিত—এটা প্রত্যক্ষ। সবাই কি আর মুখে ডাকে—এই, এদিকে আয়? চিৎকার ক'রে কি সবাই ডাকে? হাতের ইসারাতে ডাকলে কি আর সে লোক আসে না? মাথা দিয়ে ইসারাতে ডাকলে কি আসে না? এইভাবে ডাকলে কি ডাকার কাজ হয় না? ও ভাবেও ডাকার কাজ হয়। ওতে যদি ডাকার কাজ হয়, তবে ফুল ফুটে আছে—সেটা দেখাই শুধু ফোটার কাজ নয়। ঐ যে আমাদের মধ্যে দুঃখ গজালো—একটা ফুল ফুটলো, আঘাত যে হ'ল—একটা ফুল ফুটলো, শোক যে হ'ল একটা ফুল ফুটলো, বুঝিনা যে হ'ল—একটা ফুল ফুটলো, অভাব যে হ'ল—একটা ফুল ফুটলো, ভাল লাগে না যে হ'ল—আর একটা ফুল ফুটলো। কত ফুল দেখ! কত বাগান আমাদের আছে! এক বাগানে তো অনেক গাছ থাকে। তেমনি কত গাছ আমাদের বাগানে! এই দেহটার মধ্যে জ্বালা-যন্ত্রণার সীমা নাই—ফুল ফোটাবার জন্যই এসব জ্বালা-যন্ত্রণা। এমন সৃষ্টির মধ্যে দেবতা এমন সুন্দর জিনিষ দিয়েছে! ঘুম থেকে উঠে দেখি ছেলেটা মারা গেল, কিংবা বাপ মরে গেছে।—এদিকে বিয়ে, ওদিকে মৃত্যু,—আরে সর্বনাশ! কি এক ঝঞ্ঝাট! বিয়ের বাদ্যও যাচ্ছে, আবার মড়ার বাদ্যও যাচ্ছে। চলছে সমানে। এটা কি? এইগুলি আগে শিখুন। তখন সাধক বলছে—এইগুলি শিখলে আমরা দেবতা কি ক'রে পাব? আমি বললাম—দেখুন, এই ঘা-আঘাতে কি সুর পায়? আঘাতগুলো কেন? প্রথমতঃ আমাদের নামিয়ে দিয়ে স্রষ্টা বা ভগবানের এই ছেঁচা-গুতা খাওয়ানোর ঠেকাটা কি? এই ছেলে মরে, বাপ মরে, স্বামী মরে,—এই ছেঁচা-গুতা কেন খাওয়াচ্ছে? এটার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? নিয়ম মতই তো যাওয়া উচিত ছিল! বয়সের সাথে সাথে চলে যেত, সেটাই সবচেয়ে ভাল হ'ত। আগে বাবা, পরে মা, তারপর বয়স অনুসারে সবাই যেতো,—তা হ'লে তো কোন অসুবিধা হ'ত না। কিন্তু তাতো নয়। বাপ রইল, ছেলেটা ফট্ করে মরে গেল। কেন যাচ্ছে? এই উদ্দেশ্যটা কি, সেইটা আগে দেখুন। গাছের তরকারী খাবেন, কপি খাবেন, লাউ খাবেন, শিম-বেগুন খাবেন, মাছ-দুধ ছানা-মাখন খাবেন, আর ঘা-আঘাত নিতে চাইবেন না, শোক নিতে চাইবেন না, দুঃখ নিতে চাইবেন না? এগুলো তো খাওয়াই। এও তো নেওয়ার বস্তু। এগুলো যখন এসেছে, তখন নিতে তো হবে। স্রষ্টা কেন দিল এগুলো? মাছ-তরকারী-দুধ-ছানাতে যদি শরীরে রক্ত হ'তে পারে, তাহ'লে শোকে, রোগে, দুঃখে কি উপকার হ'তে পারে, সেটা কি খোঁজ করে দেখেছেন? সাধক বললেন—এটার গভীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানার আছে। বললাম—জানুন, এটা কেন হয়। কেন মরে যায়, কেন আঘাত হয়—এটা জানুন ভাল করে আগে।

আমাদের জীবনের চলার পথে মৃত্যু যখন আসে, মৃত্যু আসবার আগেই হাঁচি, কাশি, ফোড়া এই রকম নানা কিছু বয়সের শুরু থেকে আরম্ভ হ'য়ে যায়। এই যে হাঁচি দিচ্ছে,, কাশি দিচ্ছে—এটা মৃত্যুরই এক তিল। এসব কেন হচ্ছে? এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসুস্থতাগুলো একত্র হ'তে হ'তে একদিন বৃহৎ অসুস্থতায় পরিণত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা কণা অসুস্থতাই বৃহৎ রূপ নেয়। আমাদের জীবনের চলার পথে প্রতি মুহূর্তে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাত-প্রতিঘাতগুলো আমাদের জীবনে এসে এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা জানা সত্ত্বেও বুঝতে পারি না যে, আমরা মরে যাব। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই বুঝিয়ে দিচ্ছে—আমরা থাকবো না। আমরাই শ্মশানে নিয়ে দাহ করছি, তবু কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করি না যে, আমরাও মরে যাবো। প্রত্যেকেই যে আমরা মরব, সেই কথাটাইতো আমাদের মধ্যে সজাগ নয়। আমাদের প্রতি মুহূর্তে সজাগ ক'রে দেওয়ার জন্য, আমাদের প্রতি মুহূর্তে সচেতন ক'রে দেওয়ার জন্য এই যে মৃত্যুটা, তার আগ-পাছ যে ইঙ্গিতটা র'য়েছে—কেন? আমাদের সাথে এখানকার যে সম্পর্ক—সাময়িক সম্পর্ক। তারা আসে শুধু অতিথি হিসাবে। আসে শুধু চলে যাবার রাস্তায়; মাঝখানে শুধু আসার পথিক হিসাবে এসে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ যাদের আমরা আপন ক'রে ধ'রে রাখি, তারা আছে মাত্র। কিন্তু বিশ বছরের ট্রেনিং নিতে এখানে এসেছিল। যে ব্যক্তি দুই বছরের ট্রেনিং নিতে বিলাত যায়, তার সেখানে দশ বছর থাকার কোন কারণ নেই। এই দেশ থেকে গভর্ণমেন্ট দু'বছরের খরচ করে ট্রেনিং-এ পাঠালেন। দু' বছর সেখানে থেকে খুব আনন্দ করে সবার সঙ্গে চেনা-জানা করে যেই দুই বছর পূর্ণ হ'ল, অমনি টিকিট কেটে চলে এল। আমাদের বিলাতের সঙ্গে সম্পর্ক ঐ ট্রেনিং পিরিয়ডটুকু—দুই বছর। তাই এই পৃথিবীতে যে আমরা সবাই এসেছি, কিসের জন্য এসেছি? প্রত্যেকে ট্রেনিং নিতে এসেছি। কারো ষাট, কারো সত্তর—এটা গড় প্রতি সবাই ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। এই পৃথিবীর ন্যায় অজস্র পৃথিবী আছে। এইটা এবং সেইসব পৃথিবী হ'ল ট্রেনিং সেন্টার—শুধু গড়বার জন্য, তৈরী হওয়ার জন্য। কুমার-বাড়ী যে মাটি ছানা হয়, তা মূর্তি তৈরী করার জন্য। সেই রকম ট্রেনিং সেন্টার হ'ল গ'ড়বার জন্য। এই ট্রেনিং-এর জায়গায় কি পূজা চ'লতে পারে? এখানে যত ব্যক্তি আসছে,—সবাই আমরা এসেছি ট্রেনিং নিতে—কেউ সত্তর বছরের জন্য, কেউ পঞ্চাশ বছরের জন্য, কেউ বার বছরের জন্য, কেউ কুড়ি বছরের জন্য। এক একজন মেয়াদ নিয়ে এসেছি। এ্যাক্সিডেন্টেই হোক আর অসুস্থতায় হোক, ঠিক যে যেমন যাওয়া দরকার চলে যাচ্ছে। আমরা কি করছি? ট্রেনিং-এর জন্য তাদের আমরা আপ্যায়িত করছি কি করে? এদের আনছি কি করে? ইন্দ্রিয়ের নেশায় আমরা কি করলাম? ইন্দ্রিয়ের এমন একটা নেশা, এমন একটা চাহিদা যে সেই চাহিদাকে আমরা এইদিক দিয়ে পূরণ করতে চাইছি। ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে ওদের টেনে আনছি। ওরা ইন্দ্রিয়ের গতি দিয়ে, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে। ওদের দরজাই হ'চ্ছে ইন্দ্রিয়ের দরজা। ইন্দ্রিয়ের গতি ছাড়া ওরা আসতে পারে না, চলতে পারে না। আমাদের এই যে বৃত্তি—কামবৃত্তি, কাম ইচ্ছা—ইচ্ছার সঙ্গে যে নারী-

পুরুষের মিলনে যে ইচ্ছাবৃত্তি আসছে, প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে যে ইচ্ছা—তার যে একটা সঙ্গম-ইচ্ছা বা প্রাণের ইচ্ছা—এই ইচ্ছাশক্তির বৃত্তির নিবৃত্তির দরজা দিয়ে কি হয়? ঐসব ট্রেনিং-এর যত বিষয়-বস্তু, ওরা আসতে শুরু করে দেয়। কেন আসে? তাতে হয় কি, উন্মাদনার উন্মত্ততায়, বৃত্তির নিবৃত্তিতে প্রতি মুহূর্তে সূর্যের তাপের সাথে, আলোর সাথে যে একটা তাপ সৃষ্টি হয়, সেই তাপের মাত্রায় সেই সমস্ত ট্রেনিং-এর বস্তু সেই মাত্রায় এসে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হয়ে এখানে কেউ তিরিশ কেউ চল্লিশ—এক একটা পিরিয়ডের মেয়াদ কাটাচ্ছে। এখানে এসে কি করে? এখানে এসে যে যতটুকু ট্রেনিং নেওয়া দরকার কখনো নেয়, কখনো নেয় না। কখনো হয়, কখনো হয় না—আবার যাবার সময় ঠিকই চলে যায়। কিন্তু হোক বা না হোক, সে আর দেখে না, যাওয়ার সময় ঠিকই চলে যায়। স্রষ্টা বলছেন—যে প্রকৃতি তোমাদের তৈরী করবার জন্য এমন সচেতন, সেখানে তোমাদের গড়ার জন্য পাঠালাম।—তোমরা কাজ কর বা না-কর, সে তোমাদের ইচ্ছা; কিন্তু আমি পাঠালাম তোমাদের প্রতি মুহূর্তে কাজ করার জন্য। তোমরা যদি নিজেকে তৈরী না করে পৃথিবী থেকে চলে যাও তবে তোমাদের আবার, বার বার গ'ড়বার জন্য আসতেই হবে। তোমরা যে এখানে থাকবে না, এটা তোমরা প্রতিমুহূর্তে যখন বুঝতে পারছ, তখন তোমাদের যদি কিছু করে নেওয়ার থাকে, তাড়াতাড়ি করে নাও। আর মুহূর্তের জন্যও সময় নষ্ট করো না। যেমন ট্রেন ছাড়ার বাকী আছে পঁচিশ মিনিট,—তখন খেতে বসেছ, —গরম ডাল দিয়েছে, খেতে খেতে আর বাকী আছে তিন মিনিট,—তখন খাওয়া ফেলে দিয়েছ দৌড়—আর সময় নেই, গাড়ী ছেড়ে দেবে।—তখন বেশী খাওয়ার চিন্তা থাকে না, ট্রেনে যাওয়ার প্রস্তুতি থাকে, কিন্তু ঐ খাওয়ার নেশায় থাকলে ট্রেন চলে যায়। আমাদের জীবনের গতি চলে যাচ্ছে। গতি যেখানে চ'লে যাচ্ছে, সেখানে গতির সঙ্গে এক-গতি ক'রে গতির সঙ্গে গতি মিলিয়ে চলাই হচ্ছে বড় সাধনা। কিন্তু গতির সঙ্গে তো গতি মেলানো হয় না। আমরা গতির সঙ্গে বেগতি করছি। আমাদের গতির সঙ্গে গতি করতে গেলে কি করতে হবে? তৈরী হ'তে হবে। প্রকৃতির প্রকৃত তত্ত্বকে আমাদের জানতে হবে যে, আমরা কেন এলাম? এই সৃষ্টির কারণ কি?—কারণ খুঁজে বার করতে হবে। কারণ খুঁজতে গেলেই আসবে সিদ্ধ অবস্থা—তন্ময়তা আসবে, গভীরতা আসবে, আসবে প্রাণের স্পর্শ। এই রকম সুন্দর সৃষ্টি, অপরূপ সৃষ্টি, এই রকম যাঁর নিয়ম কানুন, তাঁর বুঝ বা চিন্তার তো কোন অভাব নেই? তিনি একজন বিরাট জ্ঞানী বা পূর্ণ। আমরা যদি তাঁরই শরণাপন্ন হই, তাঁকে যদি স্মরণ করি, তবে স্বাভাবিক ক্ষেত্রে আমরা তাঁর সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালভাবে জানতে পারব এবং অনায়াসে তাঁর সঙ্গে মিশে এক সুরে চলে যেতে পারবো।

এই প্রসঙ্গে কথাবার্তার পরে সেই সাধক আমাকে ব'ললেন—আমাদের তো আরেক ধারা হ'য়ে গেছে; ঐ ধারাতে তো আমরা যাইনি। ব'ললাম—ঐ ধারাতে না যাওয়ার ফলে হয়েছে কি, আমাদের সমাজে অনেক দিক্‌ভ্রম হ'য়ে গেছে। আমাদের সহজ চিন্তা হ'চ্ছে সংসারটাকে যে যত বেশী ভালবেসে গুছাতে পেরেছে, দেবতার সন্ধান সে তত বেশী খুঁজে

পাবে। কিন্তু এখানে বলছে, যে যত বেশী সংসারে আবদ্ধ হ'য়েছে, তত বেশী মরেছে। এটা হ'ল এখানকার কথা। কিন্তু সংসারের মধ্যে যে যত বেশী সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিতে পেরেছে সে তত বেশী আনন্দ পাবে। কেন পাবে? তুমি চিন্তা করে দেখ—মাকে যদি ভালবাস, মাকে যদি খুশী কর, তোমার মধ্যে একটি তৃপ্তি সব সময় থাকবে। বাপকে ভালবাসলে, বাপকে খুশী করলেও তোমার মধ্যে তৃপ্তি পাবে। ছেলেপিলেকে, স্ত্রীকে ভালবেসে তাদের খুশী ক'রলেও তোমার তৃপ্তি। বলেছে—অজস্র অজস্র কণাশক্তি নিয়ে পৃথিবী। অজস্র অজস্র টুকরো তৃপ্তি নিয়েই হ'চ্ছে মহাতৃপ্তি। একটা গ্রন্থ পাঠ ক'রে যেমন তৃপ্তি, প্রকৃতির দৃশ্য দেখে তৃপ্তি, মা-বাবাকে সেবা করে তৃপ্তি, ছেলে-পিলে-স্ত্রীকে সেবা ক'রে তৃপ্তি, ঘর-বাড়ী সাজানোতেও তৃপ্তি। আস্তে আস্তে ক'রে পাড়া আসল, গ্রাম আসল,—ছড়িয়ে গেল। তোমার তৃপ্তির দিকটা আরও বড় হ'য়ে যাচ্ছে। এই যে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তৃপ্তির দিকে বড় হয়ে, বিরাট ভাবে তৃপ্তির ধারাটা ব্যাপ্ত হয়ে চলছে—এটা হচ্ছে সেই পরম তৃপ্তিরই সুর। পরম আনন্দ যে কথাটা, সেই পরম আনন্দ, পরম তৃপ্তি শুধু আকাশে তাকিয়ে থাকলেই হয় না। এই তৃপ্তির সন্ধান—যে কোন বৃহৎ বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রতে গেলেই কণাশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ না ক'রলে বৃহতের সন্ধান হয় না। অজস্র মধুকর নিয়েই একটা মৌচাক গড়ে ওঠে এবং অজস্র মধুকরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আহরণের মত তৃপ্তি আহরণ ক'রেই সেই বিরাট মৌচাক হয়, সেই মহান মৌচাক হয়—সেই মহান তৃপ্তির মৌচাক হয়। সেই মৌচাক হ'চ্ছে পরমানন্দের তৃপ্তি। সেই তৃপ্তি আকাশের মত হ'য়ে যায়—তার শেষ নেই, বর্ণনা নেই। আমরা তারই পূজারী, সেই সাধনাই আমরা করব। তারই জন্য আমরা এখানে এসেছি। সেই তৃপ্তি, সেই আনন্দ, সেই শান্তি খুঁজতে খুঁজতে আমরা দিন কাটিয়ে যাচ্ছি। আমরা ঘুম থেকে উঠে শুধু শান্তির পথ খুঁজছি—কোথায় শান্তি, কোথায় তৃপ্তি, কোথায় ভালবাসা? খুঁজে দেখ তো, এখানে কোথাও কেউ ভালবাসা রাখতে পেরেছে? মাকে ভালোবাসে—মা ফস্ ক'রে চলে গেল। বাপকে ধ'রলে—বাপ চলে গেল। স্বামীকে ধ'রলে—স্বামী চ'লে গেল। আরে বাবা! যাকে ধরি, সেইতো ফস্কে যায়,—ভালবাসাটা আর থাকে না। দেখা যাচ্ছে—থাকছে না। যা ধরি, তাইই নেই ; আটকিয়ে রাখা যায় না। সুতরাং তাতে তৃপ্তির কি ইঙ্গিত পাচ্ছি?—এইভাবেই তুমি সাধনা কর—তখনই তুমি খুঁজে পাবে। যে যেখানে যায়, সেখানকার কথাই তো ভাবা উচিত। বাতাসেই যাক, আকাশেই যাক—এই যে চ'লে যায়, যাওয়ার পথ-পদ্ধতিটা যেই ভাবে যার আশ্রয়ে যায়, যেইভাবে যার আশ্রয় নিয়ে চলে যাচ্ছে, আকাশে বাতাসে জলে স্থলে যেইভাবে যাচ্ছে, সেইটাই হ'চ্ছে আমার গতি ; সেটাকেই আশ্রয় ক'রতে হবে। তখন এই সংসারে থেকে, এই সমাজে থেকে সেই আঘাত প্রতিঘাতকে সহযোগিতা ক'রে, সেই দরিদ্রতাকে সহযোগিতা ক'রে, সেই ধ্বনিকে সহযোগিতা ক'রে, সেই আনন্দকে সহযোগিতা ক'রে, খুশি অখুশিকে সহযোগিতা ক'রে আমার ব'সে থাকতে হবে। হে আমার গতির গতি! তুমি সবাইকে যে গতিতে এক পথে নিয়ে যাচ্ছ, আমাকেও সেই গতির গতিতে নিয়ে যাওয়ার অবস্থায় যখন রেখেছ, আমিও

সেইভাবেই যাব ;—কিন্তু সেখানে আমার মনপ্রাণ সব কিছু সত্তা তত্ত্বে ডুবিয়ে দিয়ে সেই গভীর সত্তার ভিতর থেকে চিন্তা ক'রতে হবে যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি—কি আমরা পাব। মনকে সব সময় তন্ময়তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তন্ময়তাটা এমনি খুঁজে পাওয়া যায় না। সেটা এমনি কোন বিষয়বস্তু নয় যে সেটা তোমার সামনে ধ'রে দিয়ে দেওয়া হবে। এটা এমনি জিনিষ, যে কোন মুহূর্তে তুমি অনায়াসে তন্ময়তায় ডুবে থাকতে পারবে। যে কোন বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়ে—তন্ময়তার ভিতর দিয়ে দেবতাকে লাভ করা যায়। সৃষ্টির, প্রকৃতির এমন একটি ধারা র'য়েছে যে যেকোন মুহূর্তে যেকোন ব্যক্তি যে কোন অবস্থায় সিদ্ধিলাভ ক'রতে পারে,—পরম তৃপ্তি লাভ করতে পারে। সর্ব অবস্থায় এটা তোমাদের সম্মুখে এমনভাবে বিরাজ ক'রছে যে, মুহূর্তে মানুষ সবকিছু শক্তির অধিকার নিয়ে ব'সতে পারে। যে আজ রাস্তার ভিখিরী, সেও কাল মন্ত্রী হয়ে বসতে পারে! দেখনা—মুহূর্তে গণভোটে কি না হয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক জনের ভোটে রাজাপ্রজা বানায়। একটা চাকরীর জন্য বি. এ. এম. এ. পাশ করে পাচ্ছে চারশ, পাঁচশ, ছয়শ, —আর লেখাপড়া জানে না, গণভোট টোকাতে গেছে,—গণভোট পেয়ে সে কি হ'য়ে বসে আছে! প্রতিটি ভোটের মাত্রাতে কি না হয়! সেই ভোট টোকাতে হবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তার থেকে, প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু থেকে সেই ভোট নিতে হবে, সব কিছু নিয়ে তোমার মনকে সেইভাবে গড়িয়ে নিতে হবে। এই পরিবেশ বড় অদ্ভুত পরিবেশ, চিন্তাধারায় এই পরিবেশ বড় অদ্ভুত! তোমরা সব সময় সেইভাবে তৈরী হ'য়ে থেকো।

তোমরা কাজ করবে, জপ করবে। দেখ, সময় তো আর থাকছে না। এই শীত গেল বর্ষা এল ;বর্ষা গেল শরৎ এল,—এই যে চ'লছে—? গ্রহণ কবে, পঞ্জিকাতে দেখ যা লেখা থাকে, সেই মাত্রাতেই গ্রহণ হয়। আমাদের এখন কবে যে গ্রহণ হবে, কবে যে রাহুতে ধরবে? সবকিছু ছন্দে লেখা থাকে, সব কিছুর ছন্দ আছে। ছন্দতো আছে, কিন্তু আমরা বন্দনা তো করছিনা কিছু। কাজ আর হচ্ছে না। আমি যেই আলোচনাগুলো করি—এইগুলো কিছু কিছু ক'রে ধরে রাখবে, আর যা বলে যাচ্ছি সেগুলো শুনবে। এগুলো তো বাঁধাধরার কথা নয়! এগুলো এক একটা এক এক সময় কিছু কিছু ঝড়ের মত বলে যাই, —এইগুলো ধ'রে রাখবে। এগুলো তো পাঠ না যে, উবাচ করে কিছু বললাম। কালবৈশাখীর ঝড় কি ইচ্ছা মতন আসে? কিছুই নেই, হঠাৎ এসে কিছু দিয়ে গেল। ঐ সময়টুকুর মধ্যে গাছ-গাছড়া সব ফেলে দিয়ে চলে গেল। আমার তত্ত্বগুলি হ'চ্ছে সেই রকম—ঝট্ করে আসবে। কিছু দিয়ে গেলাম, শুনে রাখবে। আবার সুবিধাও আছে। বোঝ না-বোঝ, শুনলেও কাজ হয়। এই ঝড়ের বৃষ্টি মাটিতে প'ড়ে সারে পরিণত হয়, গাছ-গাছড়া ফেঁপে ওঠে। এই তত্ত্ব শুনে ভিতর থেকে আপনি স্ফুরণ হ'তে থাকে। এগুলো খুব ভাল ক'রে গেঁথে নিও। তারপর দেখ, এই রকম বহু মহান আসেন, এসে এক একটা বোঝাই ক'রে নিয়ে চ'লে যান। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁদের নেওয়ার জন্য আলাদা মালগাড়ী থাকে ;ওটা লম্বা বেশী, ওটায় আর জায়গা রাখে না, —একেবারে বোঝাই ক'রে নিয়ে চলছে। হচ্ছে কি? —কাজ করে, জপ-তপ করে

এখানে নেওয়ার আর সময় হয় না। সবাই জানে এইটা। তাদের জন্য করে কি? কতকগুলি বগী তৈরী ক'রেছে, এই বগীর মধ্যে ঐগুলিকে ভ'রে ইঞ্জিন দিয়ে টেনে ঐগুলিকে নিয়ে যায়। এখন আর কিছু নয়, একটুখানি স্মরণ রাখা, —জপটা শুধু ক'রে যাওয়া। কোনমতে কেবল স্মরণ রাখা। যেই মহান নিয়ে যাবেন, —কত সুন্দর সুন্দর আরো পৃথিবী আছে, কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, কত অপূর্ব জিনিস আছে, সেখানেই নিয়ে যাবেন। এখন হ'ল কি—সবই তো স্বপ্নের মত। ব'লব—হা ক'রে তাকিয়ে থাকবে—কোথায়? গল্পের মতন হবে, সেই জন্য বলিনা বেশী। এইগুলো তোমাদের কল্পনার মধ্যে থেকে যাচ্ছে। কিন্তু গল্প বা কল্পনা নয়—বাস্তবের কথা হ'ল, একটা যদি পৃথিবী থাকে, আর একটা থাকবেই। এই ভাবেই নিয়ম। এক পৃথিবী থাকলে আরো পৃথিবী থাকবেই। একটাই শুধু আসে না। এক সূর্য থাকলে আরও সূর্য আছে, একটা সূর্যই নয়। এক চাঁদ থাকলে আরও চাঁদ থাকবে। বাপ থাকলে ছেলে আছে, ছেলে থাকলে তার ছেলে আছে; বাপের আবার বাপ আছে। এই রকম একটা থাকলে যদি আর একটা থাকে, এই আছেটাই চিরকাল 'আছে' হিসাবেই থেকে যায়। —পরপর আছেই। একই চ'লছে। এই ভাবে পরপর পৃথিবীগুলি কেন আছে? না, একটা দিন প্রত্যেকেরই আসবে, যেই দিন চির আনন্দের পৃথিবীতে সবাই যাবে। কিন্তু চির আনন্দের মাঝে থাকতে গেলে এই পৃথিবীতে থাকা চল'বেনা। এটা হ'ল ফ্যাক্টরি। বলছে যে, আমাদের দেহে যেই যেই ধারাগুলো আছে, সেই সেই ধারা অনুযায়ী পৃথিবীগুলো আছে। ঐ যে শুনেছ—নরক আছে, যমপুরী আছে, এই কথাগুলি যে বেরিয়েছে, এমনি গল্পচ্ছলে বের হয়নি। এইগুলি যত কথা আছে, একটা কথাও বৃথা নয়। আমাদের দেহের ভিতর দিয়ে যতগুলি আমরা অনুভব করছি, ততগুলি—তত রকম পৃথিবী আছে। তত রকম পৃথিবী থাকতে গেলেই, আনন্দও আছে, দুঃখও আছে, ব্যথাও আছে, রোগও আছে, সুখও আছে—সব রকমই আছে। পৃথিবীগুলো সেই ভাবে ভাগাভাগি—রোগের পৃথিবী, শোকের পৃথিবী, দুঃখের পৃথিবী। এগুলো হ'লো ফ্যাক্টরি—তৈরী হবার জন্য। একে ছক বলে। এ ছক বড় সাংঘাতিক ছক! এই ছক অতিক্রম করার জন্যই জপ-তপ। এই ছকে যাতে আর ঘুরতে না হয়, তার জন্যই সাধনা। দেহের ভিতর যেমন আনন্দ অনুভব করি, সেই রকম আবার বিরাট আনন্দের পৃথিবী আছে। সেই আনন্দের পৃথিবীতে যদি যেতে হয়, তবে যাওয়ার এই পথ দেহ নিয়েই যেতে হবে। —সেই রকম শান্তি থাকবে, এই মন থাকবে, বুদ্ধি থাকবে। সব পৃথিবীরই একটা মাত্রা আছে। এই রকম প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় এক একটা স্তর আছে—এক একটা পৃথিবী আছে। যে যে-মাত্রায় দেহ রাখবে, সেই রকম পৃথিবীতে, সেই রকম জন্ম হবে। একটা জীবও নষ্ট হয় না, একটা জীবও মরে না। এটা মনে রেখো—কেউ কখনো মরেনা। এই যে মারা গেছে ব'লছ—তা নয়। —একটা জীবও মরেনা, সবগুলি বেঁচে থাকবে, সবগুলি বুঝবে। সমুদ্রে একরকম জন্তু আছে বুঝলে—এককোষী প্রাণী। ঐ জন্তুটা ল্যাতা-ল্যাতার মতন; ওটাকে যদি হাজার টুকরা কর, আবার দেখবে—প্রত্যেক টুকরোতেই হাত পা চোখ মুখ হ'য়ে গেছে, আবার প্রত্যেকের দেহ তৈরী হ'য়ে হাঁটাহাঁটি ক'রছে। ঐ

জন্তুকে কেটে টুকরা টুকরা করে রেখে দিলে, কয়দিন পর দেখা গেল—আস্তে আস্তে বড় হ'চ্ছে, চোখ-মুখ হ'চ্ছে। এটাতে বোঝা যাচ্ছে—এমন জন্তুর জন্তু, যেমনই তাকে টুকরা করনা কেন, সর্ব অবস্থায় সে তার নিজস্ব দেহ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের একটা জীবের মধ্যেই এই গুণ। তা হ'লে তোমাদের মধ্যে কত গুণ রয়ে গেছে! —স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে তোমাদের যেই কোন অবস্থায়—আগুনেই দিক, আর যাতেই দিক, যত দেহ তোমাদের রেখে দেওয়া হয়—তোমাদের মৃত্যু নেই। মৃত্যু যখন নেই, তাহলে যাবে কোথায়? ব'লছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরম আনন্দ, চির আনন্দ বা পরম তৃপ্তির সেই পৃথিবীর সঙ্গে, সেই যোগের সঙ্গে এক যোগাযোগ-সূত্রে না গেছ, —ততক্ষণ এই ছকের মধ্যে ঘোরাঘুরি। এ ছক বড় সাংঘাতিক ছক! একে স্তর বলে। এই স্তরে স্তরে এক ভাবে রোল (roll) ক'রছে। রোল বলে এটাকে—সায়েন্টিফিক এটা। এটাই নিয়ম—স্তরে স্তরে রোল ক'রছে—ঘূর্ণিপাকের মধ্যে বার বার যাতায়াত ক'রছে তৈরী হবার জন্য। এই ছক পার হ'য়ে যাওয়ার জন্যই এত জপ, এত সাধনা।—এই সাধনাতেই সেই আনন্দময় পৃথিবীতে যাবে, সেখানে ব'সবে—দেখবে, সে জায়গা কি অদ্ভুত! সেখানে সব মহাপুরুষরা ব'সে আছেন, সবাই সাধনা করছেন। সেখানে তোমরাও যাবে। আমরা সবাই পথিক, আমরা যাত্রিক। আজও চলছি আমরা গতির পথে। সেই গতির পথে এক গতি হওয়ার জন্যই সাধনা। আমাদের সেই নমুনা স্বরূপ কি দিয়েছে?—এই দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য, আঘাত, রোগ, শোক। একটু শান্তি তো আছে—আমরা দিনরাত চেষ্টা করছি কিসে একটু শান্তি আসবে, কিসে তৃপ্তি আসবে। শান্তির সাধনা, পরম তৃপ্তির সাধনা আমরা দিনরাত ক'রে যাচ্ছি। এটা কিন্তু প্রকারান্তরে সেই মহাতৃপ্তির সাধনাই ক'রে যাচ্ছি। ইঙ্গিত রয়েছে আমাদের মধ্যে, তৃপ্তির সন্ধানে একভাবে না একভাবে যাচ্ছি। এই তৃপ্তিই হ'চ্ছে সেই পরম তৃপ্তির ইঙ্গিত স্বরূপ।

প্রশ্ন ঃ—এই জগৎটা মহামায়ার খেলা—মহামায়া কি?

উত্তর ঃ—মুক্তির দরজা তো খোলা। সেই মুক্ত বস্তু দিয়ে যখন তৈরী হ'য়ে এসেছ, তখন তোমরা সবাই মুক্ত। তোমাদের ভিতর কে পাপ ক'রলো বা কে পুণ্য ক'রলো—এই যে একটা কথা আসে, এটা কথাতেই থেকে যাচ্ছে। মুক্ত জীবের কাছে পাপ বা পুণ্য কোনটারই দরকার নেই, কোনটাই তাকে স্পর্শ ক'রতে পারে না। পাপ-পুণ্য ওটা বাইরের জিনিস। তোমরা তার চেয়ে অনেক ঊর্দ্ধে। কি রকম? এই দেখ সাগরের জল আর বাতাসের জল—দুটোই জল। সাগরের জলে ডুবলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হ'য়ে মারা যায়, আবার সেই জল যখন বাতাসের সঙ্গে নাকের ভিতর ঢোকে, তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্য করে,—বরং সেই জল বাতাসের সঙ্গে নাকে না ঢুকলেই মারা যায়। যারা পাপ করে, তারা পাপে ডুবে যায়—এই কথাটা—এটা যার যার নিজস্ব কথা। তোমাদের গতি ডুবে যাওয়ার গতি নয়। তোমাদের কাজ হ'চ্ছে মুক্ত জায়গায় বিচরণ করা, সাগরের পারে থেকে সাগরকে উপলব্ধি করা। সাগর একদিকে নিম্নে, আর একদিকে ঊর্দ্ধে। ঊর্দ্ধেও নীল আকাশে সাগর আছে। ঊর্দ্ধে থেকে দান করা যায়, নিম্নে থেকে দান করা যায় না। শাস্ত্র যারা বিকৃত ক'রেছে, এই

যে পাপ-পঙ্কিলতা নানা ভাবে ঘিরে ধরেছে বলে ভগবান দর্শন বা তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছাতে পারা যায় না ব'লছে, এই কথা বললে সেই বিরাট পুরুষকে অবমাননা করা হয়। তাঁর দান যখন র'য়েছে, তাঁর দেওয়া বস্তু যখন র'য়েছে, যেটা হ'চ্ছে মুক্ত জায়গায় বিচরণ, তখন তোমাদের গতিও মুক্ত জায়গায়, তোমরা তৈরী সেই মুক্ত বস্তু দিয়েই। তোমাদের পাপেরও দরকার নেই, পুণ্যেরও দরকার নেই। কেন দরকার নেই?—তোমরা পৃথিবীর গর্ভজাত সন্তান—পৃথিবীর নীচও নেই উপরও নেই, এদিকও নেই, ওদিকও নেই—সবদিক তার সমান। সেখান হ'তেই তো তোমরা তৈরী। সুতরাং তোমাদের ওঠা-নামার কোন প্রশ্নই আসে না। এত বড় বেদ, এত বড় শাস্ত্র—তারই ধ্বনি সেটা। তোমরা উঁচুতে উঠেছ, নীচুতে নেমেছ—এটা ভুল; অযথা একথা বলার কি প্রয়োজন আছে? এই বিশ্ব বিরাট। তিনি বলছেন—আমি তোমাদের এমন একটা স্থানে রেখেছি, এই বিশ্বে যে জায়গায় থাক সেটাই স্থান। তোমরা স্থানভ্রষ্ট হবে না। তোমরা যেখানেই থাক সেটাই তোমাদের কাছে চরম স্থান। তোমরা কোথায় আছ? পৃথিবী থাকে দূরে সরে যাওনি—উপরেও সরে যাওনি, নীচেও সরে যাওনি। তোমরা গতির মাঝে চ'লছ। এত বড় শাস্ত্র, এত বড় বেদ—তার অর্থ হ'ল তোমরা এমন একটা অবস্থায় র'য়েছ, যেখানে ওঠা-নামার কোন প্রশ্ন নেই। তোমরা সমসুরে র'য়েছ। নীচেও যখন যাচ্ছ না, উপরেও যখন যাচ্ছ না, তখন তোমরা কোথায় রয়েছ? তোমরা সেই বিরাট সত্তায় র'য়েছ, মুক্ত জায়গায় র'য়েছ। এদিক সমান, ওদিক সমান—সবদিক যার সমান, এতবড় সুষ্ঠু জায়গা, এমন স্বর্গ আর কোথায়? এত বড় মহাস্বর্গে এমনভাবে র'য়েছ। সেই স্বচ্ছ শক্তির বিষয়বস্তু দিয়ে তোমরা গঠিত। তোমরা যে স্বচ্ছ শক্তি দিয়ে গড়া, তা বুঝবে কি ক'রে? —তোমরা যদি বুঝেই ফেল, তা হ'লে বিরাট আর রইল কোথায়? তোমরা যদি বিরাটকে বুঝে ফেল, তবে আর বিরাট কথাটা থাকে কোথায়? তোমরা এত বড় বিরাটের ব্যাখ্যা কি ক'রে করছ?—অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব'লছ—দুর ছাই, আর পারা যায় না, আর সহ্য হয় না; জপতপ করে কি হবে, ছেড়ে দেব সব। এইভাবে তোমরা বিরাটের ব্যাখ্যা ক'রছ। 'বুঝিনা'—বিরাটের ব্যাখ্যাই এই—বুঝতে না পারাই বিরাটের ব্যাখ্যা।—এই ব্যাখ্যায় নম্বর পাবে। আর যদি বল—আমি সব জানি, সব বুঝেছি—তবে ব্যাখ্যা হ'ল না,—তাকে জিরো নম্বর দিতে হবে। এই বিরাটের মধ্যে পৃথিবীগুলো যে উড়ছে, ধূলোর মতন উড়ছে; ধূলো বললেও বড় হয়ে যায়, পৃথিবীর ঝড় বইছে এই মহাশূন্যে। পাহাড়ে যেমন ধুলোর ঝড় হয়, মহাশূন্যে সেইরূপ পৃথিবীর ঝড় বয়। নামবিহীন অবস্থায় সব গ্রহগুলি ঘুরছে। নাম দিলে তাকে স্থান দেওয়া যায় না, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না—এই হ'ল পৃথিবী এবং সেই পৃথিবীর মধ্যে আমরা। একদিন এক ভক্ত এসে আমাকে ব'লছে—প্রভু, আমার গতি কি হবে? বললাম—তোর গতি কি হবে! দেখ, একদিন তোরই মত এক ভক্ত শিবের কাছে গিয়ে এমনি বলেছিল—প্রভু, আমার গতি কি হবে? মহাদেব তাকে বলে দিলেন —তোর গতি ত্রিভুবন। যা, এই জপ কর গিয়ে।—ও তো বসে ব'সে জপ করছে—আমার গতি ত্রিভুবন, আমার গতি ত্রিভুবন।—অনেক দিন পরে গিয়ে মহাদেবকে

বলছে—প্রভু, আমি ত্রিভুবন দেখতে চাই। মহাদেব বললেন—তুই ত্রিভুবন দেখবি? আচ্ছা যা দেখে আয়। ব'লে, ওকে স্পুটনিকের মত ছুড়ে ফেলে দিলেন!

ও তো সারা বিশ্বে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের কাছে গিয়ে দেখে, ও নিজেই সূর্য;চন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখে ও নিজেই চন্দ্র;গ্রহের কাছে গিয়ে দেখে ও নিজেই গ্রহ। ঘোরা শেষ করে মহাদেবের কাছে ফিরে এসেছে। মহাদেব বললেন—তুই কি দেখলি?—হ্যাঁ প্রভু, কেবল আমাকেই দেখলাম। সূর্যের কাছে যাই,—দেখি, আমি নিজেই সূর্য, আলাদা সূর্যকে বুঝতে পারি না। নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখি—আমি সূর্য, না এটা সূর্য,! চাঁদের কাছে যাই—দেখি, আমি চাঁদ। তখন ভাবি,—আমি চাঁদ, না এটা চাঁদ! গ্রহের কাছে যাই—দেখি, আমি গ্রহ।—ছেলে তো বাপের মতন দেখতে হয়। ছেলেকে যদি আগে কোন দিন নাও দেখে থাকে, একদিন দেখলেই বলে—তুমি কি অমুকের ছেলে? কারণ দেখতে সে ঠিক তার বাপের মত হ'য়েছে। তাই বলছি—তোমাদের আবার গতি কি? তোমরা তো গতির বাচ্চা, সূর্যের বাচ্চা। ঐ সব থেকেই তো তোমাদের জন্ম! সূর্যের থেকেই তোমাদের জন্ম—সেই সূর্য গতিতে আছে, গ্রহের থেকে তোমাদের জন্ম—গ্রহ গতিতে আছে, চাঁদের থেকে তোমাদের জন্ম—চাঁদ গতিতে আছে, পৃথিবীর থেকে তোমাদের জন্ম—পৃথিবী গতিতে আছে। তোমরা যে বাতাস টেনে বেঁচে আছ, তা গতিতে আছে, তোমরা যা খাচ্ছ তা গতিতে আছে, যে জল পান ক'রছ তা গতিতে আছে। সবই তো গতির থেকেই এসেছে, শূন্যের থেকেই সব বস্তু এসেছে। তাই তোমরা শূন্যেরই বস্তু। গতির মধ্যেই তো তোমরা আছ। ঐ যে মহাদেবের কাছে গিয়েছিল, সমস্ত বিশ্ব ঘুরে ঘুরে নিজেকে সূর্য চন্দ্র গ্রহের মতন দেখেছে—কেন? তাদের থেকেই তো জন্ম। তাই বাপের মতন ছেলে তো হবেই। জপ ক'রছে—আমার গতি ত্রিভুবন। সেই গতিতে ঘুরে ওর মতই সব দেখছে। শিব বলছেন,—তুই এই ধ্যানই করে যা—আমি সূর্য, আমি আকাশ, আমি বাতাস। এই ধ্যান ক'রতে ক'রতে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী সবগুলো এক খলে গুঁড়া করে ফেলেছে, গুলে ফেলেছে। তখন বলে, প্রভু! আমি বুঝেছি—আমি গলে গেছি।—গলে গেছ? তা হ'লে তোমার আর পাপ-পুণ্য কি? এখানকার পাপ-পুণ্য হ'ল একটা এলাচির দানা,—আমরা এই দানা নিয়ে ঝগড়া ক'রছি। স্রষ্টা সব ঢেলে দিয়েছে, আর আমরা একটা লবঙ্গ নিয়ে ঝগড়া ক'রছি। এখানে পাপ-পুণ্য নিয়ে শাস্ত্র চ'লছে, কাম-ক্রোধ নিয়ে শাস্ত্র চ'লছে। এগুলো তো এলাচির দানা। দশ পদ খাওয়ার পরে একটা এলাচি-দানা দেয় নাই বলে' ঝগড়া। আমরা এই দানা নিয়ে ঝগড়া ক'রছি। দেখা গেল, এই দানাতে পেট ভরে না। কাম ছাড়, ক্রোধ ছাড়! তোমার তিনখানা ক্রোধে, তোমার তিনখানা লোভে দেবতার কি আসে যায়? তুমি তো ঊর্দ্ধমুখী। বন্যা তো চ'লছে,—পৃথিবী ভরে' গেছে, জলে দেশ ডুবে গেছে,—বলছে, জল যাবে কোথায়? জল তো পৃথিবীর গায়েই গড়াগড়ি করছে—একবার এদিকে যায়, আর একবার ওদিকে যায়। তোমার মধ্যে যে সত্তা, সেইটা নিয়ে থাক। তোমার লোভ-কাম আমি দান করেছি, তুমি এর মধ্যে কারিকুরি ক'রতে যাও কেন? খোদার ওপর খোদকারি করার

দরকার কি? তোমার তো কিছু করার প্রয়োজন নেই! আমি যা দিয়েছি, তাই নিয়ে বসে থাক। কাম, ক্রোধ, লোভ, মায়া, মোহ—আমি যে সব বিষয়বস্তু দিয়ে চামড়ার ভিতর ভরে' আটকিয়ে দিলাম, তোমার এতে ছাড়াছাড়ির কি আছে? বেদ তো বলেনি—কাম-ক্রোধ ছাড়। বেদ ব'লছে—ভরপুর করে দিলাম; তোমার মাথার উপরে আকাশ, ডাইনে, বাঁয়ে,পায়ের নীচে আকাশ। সেই আকাশের মধ্যে যখন তুমি আছ, তোমার চিন্তাও সেইরূপ বিরাট হবে, তোমার মন আকাশের মতন হবে। গরম দেশে কুকুরের লোম নেই, আবার পাহাড়ী দেশে কুকুরের গা লোমে ঢাকা—শীতের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। যেখানে সৃষ্টিতে কোন কম-বেশী নেই, যেখানে যা প্রয়োজন স্রষ্টা সেখানে সেইরকম দান করেছেন; এমন সৃষ্টির এমন দান যেখানে, সেখানে তোমার ছাড়াছাড়ির কি আছে? কাম-ক্রোধ তো দেবতাই দিয়ে দিয়েছে। যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তাই দিয়ে দিয়েছে। এখানে বেদের অপব্যাখ্যা করে' যারা বলে—তোমরা কাম-ক্রোধ ছাড়, এই ছাড়, ওই ছাড়, যারা উবাচ করেছে বেদকে, তারাই যার যার রুচি অনুযায়ী ব'লছে। বেদ কি তাই বলেছে? তোমরা বেদের কথাই যদি স্বীকার কর, তবে বেদ ব'লছে—তোমাদের ভরপুর করে' দিলাম, এখানে ছাড়াছাড়ির কিছু নেই। বেদের ব্যাখ্যা হ'ল বিরাট ব্যাখ্যা। সেই বেদকে উবাচ করেছে। একই সুতায় মোটা কাপড়ও হয়, আবার ফাইন কাপড়ও হয়। ঢাকার মসলিন কাপড়—দিয়াশলাইয়ের বাক্সে রাখা যায় অতবড় দশহাত লম্বা কাপড়টাকে। আবার এমন মোটা কাপড় হয় যে, আলমারিতেই রাখা যাবে না মনে হয়। বেদকে উবাচ করে' ক'রে মোটা ক'রে ফেলেছে। বেদ হ'ল সুন্দর জিনিস, ফাইন জিনিস। সেই বেদের থেকে হ'ল পৃথিবী। বেদ হ'ল বেদী; সেই বেদীতে, সেই মুক্ত জায়গায় মুক্ত অবস্থায় তোমরা তৈরী। তোমাদের কি ক'রতে হবে? সূর্য যেমন বাঁচিয়ে রাখছে, পালন ক'রছে—তেমনই ক'রতে হবে। ভোরের সূর্য—আকাশের দিকে তাকালে কি সুন্দর দেখা যায়! এমন সুন্দর আলো—এই দৃষ্টান্ত যে রয়েছে, তা কিসের জন্য? তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—তোমরা নিশ্চিন্ত অবস্থায় রয়েছ, তোমাদের দেহের মধ্যে যখন যা আসে, তার জন্য তোমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার প্রয়োজন নেই। কারণ তোমরা সাময়িকভাবে এখানে রয়েছ, তোমরা কেউ তো স্থায়ীভাবে এখানে থাকছ না। আজ ৩/৪ টাকা সের চা'ল যখন ২/২।। টাকা মন চাল ছিল, সেই দিনের লোক কি আছে এখন? পূর্বপুরুষরা কোথায়?—তোমরাই সেই পূর্বপুরুষ। মুর্শিদাবাদের সেই নবাবের আমই খাচ্ছ। কিভাবে? ব্যাপকতার মধ্যে ছড়িয়ে আছ, ব্যাপকতার মধ্যে ছড়ানই নীতি। জল ছড়িয়ে যায়, ধোঁয়া দেখ ছড়িয়ে যায়।— ছড়িয়ে যায় কেন? সব সময় বৃহতের সঙ্গে মিশতে চায়। মিশতে চায় বলেই ছড়িয়ে যায়। তোমরাও তাই বৃহৎ। সৃষ্টিটা কি রকম করে' হ'ল? পৃথিবী আগে উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল। ঠাণ্ডা যখন হ'ল, তখন গাছ-গাছড়া জীব-জন্তু সৃষ্টি শুরু হয়ে' গেল,—শান্ত অবস্থা হ'লেই সৃষ্টি হবে। উত্তপ্ত অবস্থায় তো আছেই, তোমাদের মনকে একটু শান্ত অবস্থায় আন। গাড়ীর ইঞ্জিন উত্তপ্ত হয়, আবার সেই ইঞ্জিনের পিছনে পাখা ঘোরে। একটা গরম ক'রছে, আর একটা ঠাণ্ডা ক'রছে—উভয়েরই দরকার আছে। তোমাদের ভিতরে

দুটোই আছে, শুধু স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তাই সূর্যের আলো যেমন আসে,—গুরু যখন আসেন, অবতার যখন আসেন, ভগবান যখন আসেন, তখন তাঁরা কি করেন?—স্মরণ করিয়ে দেন। বলেন—বাপুরে, তোমরা সিংহ,—ভেড়া নও। কথায় আছে, একটা সিংহের বাচ্চা ভেড়ার দলে রোজ ঘাস খায়। ও ভাবে, ও বুঝি ভেড়াই। একদিন একজন এসে ওর কানে কানে বলে দিলেন—দেখ্, তুই ভেড়া ন'স—সিংহ। ও তো অবাক হ'য়ে যায়। বলে—আমি তো জানি না যে, আমি সিংহ! আমাকে তো কেউ কোন দিন বলেনি! তখন তিনি এক ফোঁটা রক্ত এনে সেই সিংহের বাচ্চার মুখে দিয়ে দিলেন। ব'ললেন—এখন বুঝতে পেরেছিস? রক্তের স্বাদ পেয়ে সে বলে—হ্যাঁ, এখন বুঝতে পেরেছি আমি ভেড়া নই, আমি সিংহ। তখন তিনি বললেন—এখন তুই কি করবি? সিংহ বলে—আমি আগে ভেড়াগুলোকে খাব। তাই বলি, আগে সংস্কাররূপী ভেড়াকে বিনাশ কর, তা হ'লেই তোমাদের সিংহত্ব জেগে উঠবে। আর মনটাকে সব সময় আকাশ, সূর্য, সাগর, পাহাড়, বিরাটের দিকে রাখবে। কারণ তোমরা বিরাটের সন্তান, বিরাটের থেকেই তোমরা এসেছ। কোনটাই নিম্নগামী নয়। সব জিনিস শূন্যের থেকেই এসেছে, আবার শূন্যেই মিশে যাচ্ছে। নীচে বলে যে মনে হয়, যেমন জি, টি, রোড—এই যে রাস্তা—রাস্তাগুলো মনে হয় নীচে,—এটা বুঝবার সুবিধার জন্য। শূন্যের মধ্যে আবার উপর-নীচ কোথায়? এই যে সমুদ্রের জল দেখছ নীচে, কিন্তু ঐ জল শূন্যের বস্তু। সবই ঊর্ধ্বের। তোমরাও তাই নিম্নগামীর নও, তোমরাও ঊর্ধ্বের, ঊর্ধ্বের বাচ্চা তোমরা; তোমরা তো নিম্ন হ'তে পার না। এত বড় ক্ষমতা তোমাদের, তোমাদের কোন পাপ নেই—তোমাদের পাপ-পুণ্য কোনটারই দরকার নেই। যদি বলে—তীর্থে গিয়ে পুণ্য কর, তোমাদের তারও প্রয়োজন নেই, তীর্থে গিয়ে তোমাদের পুণ্য করার দরকার নেই। তোমাদের মনই কৃষ্ণ, মনই ভগবান, মনই শিব। সেই মনের ভিতরে আবার তীর্থের শিব বসানর কি প্রয়োজন? তোমাদের সঞ্চয়ের দরকার নেই। যারা দেব-মন্দিরে গিয়ে ডালা দেয় তাদের সঞ্চয়ের বুদ্ধি আছে; যার কাছে ডালা দেয়, সে তো তোমাদেরই মতন একজন। যার কাছে পূজা দেব, সে তো আমাদেরই মত একজন। কার পূজা ক'রছ? কার কাছে মাথা নত ক'রছ? বিশ্বস্রষ্টা সব কিছু তোমাদের সাজিয়ে দিয়েছে। সঞ্চয় ক'রতে গেলেই তোমাদের মধ্যে বৈষম্য এসে যাবে, তারতম্য এসে যাবে। তোমাদের সব কিছু দিয়ে দিয়েছে। তোমরা যেটা খেয়ে বেঁচে থাক, সেটা আকাশের জিনিস। নিম্নের জিনিস তোমরা খাও না—ঊর্ধ্বের জিনিস খাও। যারা ঊর্ধ্বের জিনিস খায়, মহাশূন্য হতে' পান করে—তারা মহাযোগে যুক্ত হ'য়ে আছে। তোমরা বিনা ত্রাটকে মহাত্রাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আলো পান ক'রছ, বাতাস পান করছ, মহাশূন্যের জিনিস খাচ্ছ। মহাশূন্য হ'তে যারা খাদ্য সংগ্রহ করে, সুর হ'তে সৃষ্টি, তারা সুর সঞ্চয় করে। তাই সুরা যে খায়—সে সুরা কোথায়? বোতলে নয়, আকাশে। সেই আকাশের সুর পান কর। তুমি কত বড় যোগী দেখ তো! শ্রবণে, দর্শনে, ঘ্রাণে, ত্বকে, ঈড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নায়, সব মিলে সেই সুরা পান ক'রছ। এই যে জল—এই জল তো নিম্নের নয়, ঊর্ধ্বের জল। নিম্ন আবার কবে সৃষ্টি করে? সব সৃষ্টি ঊর্ধ্ব থেকে। তোমরাও

উর্দ্ধের থেকেই এসেছ। তোমরা মহাযোগী,—পূর্ণবস্তুর দ্বারা তোমরা ভরপুর। সেখানে তো তোমাদের সঞ্চয়ের দরকার নেই। লোকে শিবের সাধনা করে, মাতৃপূজা করে, মহামায়ার পূজা করে।—এই জগৎটাই তো মহামায়া! এই জগৎ মহামায়ার মধ্যে র'য়েছে। আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস—এই পৃথিবীটা ভালবাসার মধ্যে রয়েছে। এইটাই হ'ল মায়া—আকর্ষণ। এই আকর্ষণেই সবাই র'য়েছে। মাতৃশক্তিটা কত বড় মহামায়ার মধ্যে র'য়েছে!—এটা তো কেউ তৈরী করে নি। এই টানটা মহামায়ার টান—এই মায়াশক্তিই হচ্ছে আকর্ষণ, মায়াশক্তি হ'চ্ছে যোগাযোগ। এই যোগাযোগে কি বুঝতে পারছ? এই আকর্ষণ কত বড় বিরাট জিনিসকে বুঝিয়ে দিচ্ছে— মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র সবাইকে ভালবেসে বুঝিযে দিচ্ছে প্রত্যেকটির ভিতরে কত বড় ইঙ্গিত র'য়েছে, এর মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ইঙ্গিত কি রকম রয়ে গেছে। মা সন্তানের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে, সন্তানের জন্য মা পারে না এমন কিছু নেই। সেই দেহধারী মায়ের জন্য, সেই মায়ের সেবার জন্য সন্তানের সব কিছুই করা উচিত। মাতৃপূজা কেন? কিসের ইঙ্গিত এই মাতৃপূজায়? তোমার নিজের মাকে পূজা কর, অর্থাৎ সেবা কর—এই ইঙ্গিতই র'য়েছে। মা-বাবা সন্তানের জন্য কি না করে! একজন গাঁট-কাটা পকেট মেরে মার খেয়ে—তার হয়ত পিঠে তখনও রক্ত পড়ছে—সেই পকেটমারা টাকা দিয়ে আম কিনে এনে তার সন্তানকে খাওয়াচ্ছে—নে বাবা, এই আমটা খেয়ে নে। সন্তান বলছে—তোমার পিঠে রক্ত কেন? ব'লছে,—ও কিছু না, ব্যথা পেয়েছিলাম। তুই খা, আমার সামনে বসে আমটা খেয়ে নে। অন্যের কাছে তার বাবা চোর-ডাকাত হ'তে পারে, কিন্তু সন্তানের কাছে তার বাবা শুদ্ধ-বুদ্ধ-পবিত্র। সেই চোর-ডাকাত বাবা তার সন্তানের জন্য কি না করছে? সন্তানের উপর তার স্নেহ-মমতা এতটুকুও কম নেই। যার মধ্যে এমন সুর র'য়েছে, সে কেন সুরে মিশতে পারবে না? আমি দেখছি, সে তার সন্তানের জন্য কত মহান! মাপকাঠিতে সে তো ক্ষুদ্র নয়! তবে সে কেন নীচে থাকবে, কেন সে সুরে মিলতে পারবে না? ব'লছে—এতটুকু যদি সুর তার মধ্যে থাকে, তবে সেকেণ্ডের মধ্যে তার ফুটে যেতে পারে, সে যেমনি লোক হোক। দেখ, একটা শালিক কোথা থেকে খাদ্য এনে তার সন্তানকে খাওয়াচ্ছে, অন্য পাখীর মুখের থেকে ছিনিয়ে এনে তার সন্তানকে খাওয়াচ্ছে,—ঐ শালিকের মধ্যে বুঝ আছে, কর্তব্যবোধ আছে। তাই মহামায়ার খেলা এই জগতের ভিতর সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। এই শূন্য, এই বিরাট সজাগ রূপে তোমাদের ভিতর, তাই তুমি তোমাকে চেন। তুমি তো দেবতার আসনে র'য়েছ। তোমার বাবা আর একজনের কাছে চোর হ'তে পারে, কিন্তু তোমার কাছে পূজনীয়, শুদ্ধ। যখন আসামে কেরোসিন তেলের একটা ফোঁটা, একটা ছিটা এসে প'ড়ল, তখনই বুঝে নিল, এখানে তেলের খনি আছে। আজ ডিগ্‌বয় কত বড় হ'য়ে গেছে! আমি দেখব, তোমাদের মধ্যে সেই ছিটাটা আছে কিনা। গাভীর দুধ যখন দো'য়া হয়, তখন গাভী দুধ টেনে রেখে দেয় তার সন্তানের জন্য। তার স্নেহ আছে, সুর আছে, তবে সে কেন মহান হবে না! বেদকে যারা উবাচ ক'রেছে, (কতকগুলো খুচরা গজায় ভো!) তারা তো বোঝেই না, অন্যকেও

বিভ্রান্ত করে। তাদের অযথা কথা শুনে তোমাদের মনকে ব্যতিবস্ত ক'রবে না। রাস্তাটা যদি ক্লিয়ার থাকে, তবে গাড়ীগুলো ভালভাবে চলে যায়। ঐ সমস্ত খুচরা কথা দিয়ে সব মাটি ক'রে দিয়ে অন্যকে বিভ্রান্ত ক'রে দিচ্ছে। তোমরা ঐ সমস্ত খুচরা কথায় মন দেবে না। তোমরা স্বচ্ছ, তোমরা প্রকৃতির মধ্যে ডুবে থাক। তোমরা ভাববে—আমরা এই ফাঁকার মধ্যে ডুবে আছি, আমরা ভরপুর, আমরা আনন্দময়ে আছি। আর মন্ত্রের ঐ ধ্বনি—ঐ ধ্বনিটা কেন? মহাসুরের সঙ্গে একযোগে মিশে যায়। আফ্রিকার পাহাড়ে-জঙ্গলে যারা ঘোরে, এক এক জন এক এক দিকে চলে' যায়, তাদের বা'র করার জন্য একটা শব্দ করে—হো-ও-ও-ও—। সেই শব্দ শুনে দূর থেকে সবাই চ'লে আসে, সব এক জায়গায় হয়ে যায়। ঐ সুরে বিপদের সুর আছে, আনন্দের সুর আছে। তোমাদের এমন একটা ধ্বনি আছে। মনের মধ্যে যা কিছু হ'য়ে যাক তাতে ক্ষতি নেই, তোমরা ঐ ধ্বনিতে ডুবে থাক। ঐ ধ্বনি অতি ছোট্ট কথা। কিন্তু তাতে মহাশাস্ত্রের মহাবোল আছে। কিন্তু সেই মহাবোলকে বুলবুলির বোলের মতন নিজের ব্যাখ্যা দিয়ে শাস্ত্র তৈরী ক'রছে। যার যার নিজের বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা ক'রলে তারতম্য হবেই। এটা তো পাণ্ডিত্য দিয়ে হবে না! যদিও জানি তাদের পাণ্ডিত্য আছে, এটা পাণ্ডিত্যের বিষয় নয়। একজন সারা দেশ ভ্রমণ ক'রে এল, আর একজন বই পড়ে মানচিত্র দেখে দেশ চিনল। মানচিত্র দেখে যে দেশ চিনল, তার বুলির চোটে সে মেডেল পেয়ে গেল। আর যে সব দেশ ভ্রমণ ক'রে দেখে-শুনে বুঝে এল, সে ওর বুলির চোটে মুখ কাল ক'রে বসে রইল। দু'দিন পরে জানা গেল—বুলবুলির বোল যে আওড়াল, সে ব্যক্তিটি বাইরে মোটেই যায়নি, সে কোন কিছু দেখেই নি। ওই যে ডোম—ডোমরা মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে যা জানে, বড় বড় ডাক্তাররা তা জানে না। গ্রন্থের প্যাঁচে যারা গেছে, তারা গোলকধাঁধায় পড়েছে। সত্যিকারের সুরে যারা থাকে, তারা গ্রন্থের প্যাঁচে যায় না। তোমরা স্বচ্ছ থেকে তৈরী হ'য়েছ, স্বচ্ছ গতি তোমাদের। গুরু এই সুর তোমাদের দিয়ে দেন, আর তার সঙ্গে দেন মন্ত্র-ধ্বনি—শোঁ শোঁ ধ্বনি। তোমরা সর্ব অবস্থায় ভরপুর থাকবে, সব সময় তোমরা চিন্তা ক'রবে—আমরা ভরপুর হ'য়ে আছি, আমরা ভরপুর থেকে এসেছি। তোমরা ব'লতে পার—আমাদের ঐ চিন্তা আসে না কেন? সাহেবকে যতই শিখাও, সাহেব কিছুতেই 'তুমি' ব'লবে না, ব'লবে—'ট্যুমি'। কারণ সে তো গ্রামার দিয়ে এসেছে কিনা। তোমরাও তাই খুচরা কথায় বিভ্রান্তির সুরই শুনে এসেছ, তাই তোমাদের ঐ একটা কথা— আমাদের মন তো স্থির হয় না। আমার কাছে এসে কোন কোন ভক্ত বলে—প্রভু, জপ করতে ব'সলেই নানা আজে-বাজে চিন্তা এসে জপে ব্যাঘাত ঘটায়, সাধনায় ব্যাঘাত ঘটায়,—এর উপায় কি? ব'ললাম—দেখ, তোরা যে পায়খানা-প্রস্রাব করিস, কই এসে ব'লিস না তো যে—প্রভু, আমি পায়খানা-প্রস্রাব করি! যেমন তোরা পায়খানা ক'রিস, সেই রকম ঐ চিন্তাভাবনাগুলো মনের পায়খানা। যদি এসে কেউ বলে—'প্রভু, আজ থেকে আমি আর কোনদিন পায়খানা ক'রব না'—এটা যেমন একটা অসম্ভব কথা, তা যেমন হ'তে পারে না, তেমনি 'কুচিন্তা কুভাবনা ক'রব না' বলাটাও একটা অসম্ভব কথা। তোদের শরীরের মল যেমন পায়খানা-

প্রস্রাব দিয়ে বের হ'য়ে যাচ্ছে, শরীরের দূষিত জিনিস সব বের হ'য়ে যেমন তোদের শরীরকে সুস্থ রাখছে, তেমনি ঐ কুচিন্তা কু-ভাবনাগুলো হ'ল মনের মল, মনের দূষিত জিনিস,—ওগুলো বের হবেই। দূষিত জিনিস যা, তা বা'র হওয়ার জন্যই, তাতে তোদের মন সুস্থ থাকবে। ওটা যত বের হবে, ততই মঙ্গল। ওটাকে আটকাবি না—বের হ'য়ে যাক, ওদিকে নজর দিবি না। মনের মধ্যে যা খুশী তা আসুক, তাতে তোদের কিছু হবে না, তাতে ভাববার কিছু নেই। তোরা ঐ আজে-বাজে চিন্তার দিকে খেয়াল ক'রবি না, যা ইচ্ছা তা' মনে আসতে থাকুক। তোরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, মন বসুক বা না-বসুক, ঐ আজে বাজে চিন্তা নিয়েই শুধু জপ করে' যা। তোরা যখন রাস্তায় চলিস, তখন কোন দুর্গন্ধ নাকে এলে, কেউ কি তোরা ঢোক গিলিস? 'ওয়াক্ থুঃ' করে' তোরা থুথু ফেলে দিস। কেন থুথু ফেলিস্?—দুর্গন্ধ এসেছে। ঐ আজে বাজে কু-চিন্তাগুলো মনের কাছে দুর্গন্ধ। কাজেই সেই মন দুর্গন্ধরূপী কুচিন্তাকে 'ওয়াক্ থু' করে' ফেলে দিচ্ছে। দেখ্, তোরা যখন গাড়ীতে করে' কোন জায়গায় যাস্, রাস্তা যদি সমতল থাকে, তবে আরামে চলতে পারিস্; আর যদি রাস্তা অসমতল থাকে, কোনখানে ভাঙ্গা কোনখানে গর্ত থাকে, তবে তোরা গাড়িতে যাওয়ার সময় ঝকর ঝকর করে ঝাঁকানি খেতে খেতে যাস্। বুঝতে পারিস যে হ্যাঁ, একখানা গাড়িতে উঠেছিস। তেমনি তোদের ঐ চিন্তাগুলো এক একটা ঝাঁকুনি দিতে দিতে তোদের মন থেকে ঐ কু-চিন্তাগুলো বা'র হ'চ্ছে।—বুঝতে পারছিস্ যে হাঁ, একখানা বার হ'চ্ছে। গাড়ীতে ঝাঁকুনি খেতে খেতেও তোদের কাজ হয়ে যাবে। মন তার ময়লা ফেলে দেওয়ার জন্য অবিরত ঐ চিন্তা করে যাচ্ছে। তাতে তোদের আসল কাজের কোন ক্ষতি হবে না। দেখ, রাস্তা দিয়ে একটা কুলি মাথায় বোঝা নিয়ে যাচ্ছে, আর হাতে বিড়ি খেতে খেতে যাচ্ছে। ঐ কুলিটাকে আগে হয়ত কেউ বকেছিল, কেউ হয়ত কাজ করিয়ে পয়সা দেয়নি,—ও কিন্তু মাথায় বোঝা নিয়ে বিড়ি খেতে খেতে যাচ্ছে আর বিড়বিড় ক'রে ব'লছে—'দেখিয়ে দেব মজাটা—কাজের বেলায় আছে, আর পয়সা দেবার বেলায় ফাঁকি দেওয়া—আমাকে গালাগালি করা—রাস্তায় কোন সময় দেখা হোক আগে, দেখে নেব তুই কেমন।'—এই রকম বিড়বিড় ক'রতে ক'রতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।—তাতে দেখা যাচ্ছে, ঐ কুলির মাথার থেকে বস্তাও পড়েনি, বিড়ি টানাও তার বন্ধ হয়নি বা ভুল করে আগুনের দিকটাও মুখে ভরে দেয়নি।—সব তার ঠিক আছে, কিন্তু মুখে বিড়বিড় ক'রতে ক'রতে যাচ্ছে। তাই তোদের মনের ঐ কু-চিন্তারূপী বিড়বিড় মন করে যাক,—ঐ বিড়বিড়ানিতে তোদের কাজের কোন ক্ষতি ক'রতে পারবে না। তোরা জপ করে' যা—তোদের কাজ ঠিক হয়ে যাবে। দেখিস্ না—মনের বিড়বিড়ানি ঘুমের মধ্যে পর্যন্ত রেহাই নেই। তুই হয়তো এই কলকাতায় তোর বাড়ীতে শুয়ে ঘুমিয়ে আছিস্, আর স্বপ্নে দেখছিস্—ঢাকায় সেই গ্রামের বাড়ীতে চ'লে গেছিস্। আম-বাগানে গিয়ে দেখছিস্—কত আম পেকে আছে; বলছিস—বাঃ! কত আম পেকে আছে, আম গাছে উঠে আমগুলি পাড়ি। তার পরে গাছে উঠলি, আম-গাছে ঝাঁকি দিয়ে আম পাড়তে পাড়তে গাছ থেকে ধুপ করে পড়ে গেলি—তোর মাথায় লাগল ব্যথা। মাথাটা হাত দিয়ে ধ'রতে গেছিস

অমনি তোর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন দেখলি—কিসের আম, কিসের কি, কিসের ঢাকার বাড়ী! তখন মনে করলি—ভাগ্যি গাছে উঠিনি, ভাগ্যি স্বপ্ন!—একজন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে—তার বাবা মরে গেছে, সে হাউ-হাউ করে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুম গেছে ভেঙ্গে, জেগে দেখে—না তো, বাবা তো মরে নি! ভাগ্যি স্বপ্ন!—তাই বলি—ঘুমের মধ্যে পর্যন্ত মন কাউকে রেহাই দেয় না। সেই মনের জন্য ভাবনা করার কিছু নেই, মন তোমাদের গুরুত্বহীন কথাগুলো বিড়বিড় করে' বের করে দিচ্ছে। সুতরাং মনের বিড়বিড়ানির গুরুত্ব দিও না। তার বিড়বিড়ানির বিশ্বের কাছে কোন গুরুত্ব নেই বলেই গুরুত্ব বিহীন। গুরুত্ববিহীন হলেও, মন তা বের করবেই,—সর্দি-প্রস্রাব-ঘামের ন্যায় বেরোবেই। ব'লছে—এগুলো ধ'রে বসে থাকার জিনিস নয়। হাটে যায়, বাজারে যায়,—চ'লছে মনের মধ্যে কত চিন্তা,—যেন রীল (reel) চ'লছে মনে। মনের এই সবের জন্য তোমাদের ভাবাভাবির দরকার নেই। চিন্তা যা আসে আসুক—ঐদিকে মন দেবার তোমাদের দরকার নেই।—তবে এইগুলো উৎপাত করে কেন? মনের জমান মলগুলো বের করার জন্য। থুথু, কফ্, মল—বের না করলে চলে কি? ষ্টিম্ যত বেরিয়ে যায়! ষ্টিমটা গরম সব সময় থাকবে,—এটা ভিতরেও গরম, বাইরেও গরম, সামনে দিয়ে গেলেও গরম। তোমাদের মধ্যে যে বিরাট ষ্টিম্ চ'লছে, সে তার কাজ তো ক'রবে—সেই ষ্টিম্ তো বের হবেই। তোমাদের ভাববার কিছু নেই, তোমাদের অদ্ভুতভাবে কাজ হয়ে যাবে। তোমরা গুরুগতপ্রাণ হয়ে থাকবে; রাধা-কৃষ্ণ, প্রকৃতি-পুরুষ—মিলনের সেই সুর নিয়ে থাকবে, সব সময় ভরপুর থাকবে। দুষিত ধূলার মত যারা কথাবার্তা ছাড়ছে, সেই সব কথাবার্তা ধূলার মতন এসে গায়ে লাগছে। ধূলার জগতে ধূলা তো লাগবেই। কত আর ধূলা তারা ঝাড়বে? এই যে রাস্তা দিয়ে যাও, মুক্ত বায়ু টান দিচ্ছ—সেই বায়ুর সঙ্গে নাকে ধূলা যায় না? এর জন্য দাড়ি, নাকের লোম—এই সব দিয়ে দিয়েছে,—ভিতরে এমন একটি যন্ত্র দিয়েছে' যার দ্বারা ঐ ধূলার থেকে তারাও রক্ষা পায়। সৃষ্টির প্রোটেক্‌শন্ এত সুন্দর—অসুবিধার তো কিছু নেই। পাপের ধূলা যেটা ভিতরে ঢুকতে চায়, সেই ধূলা ভিতরে গেলেই থুঃ ক'রে ফেলে দেয়। অনেকে বলে—এত বয়স হয়ে গেল, কি গতি হবে কে জানে! সবাই এই রকম প্যাঁচাল পাড়ছে। বাপ আর ছেলে ট্রেনে চ'ড়েছে;—ট্রেন এত স্পিডে চ'লছে যে বুঝতেই পারছে না—ট্রেনে চ'ড়েছে। ছেলে বলছে—বাবা, আমি ট্রেনে চ'ড়ব।—অন্য ট্রেন যেতে দেখেছে কিনা, তাই ব'লছে। বাবা ব'লছে তুই কিসের মধ্যে তবে ব'সে আছিস?—ট্রেনেই তো চ'ড়েছিস্।—তোমরা এত বড় বিরাট গতির মধ্যে চ'লছ কিনা, তাই ব'লছ—গতির মধ্যে যাবো। তোমরা সেই গতির মধ্যেই আছ, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ স্থান নিয়ে রয়েছ। তাঁর মাহাত্ম্য চিন্তা ক'রে আরও কাজ ক'রে যাও, আরও জপ ক'রে যাও। এতেই সব হবে।

প্রশ্ন ঃ—আমরা যে এসেছি—অর্থাৎ জীবজগৎ যে এসেছে, এই আসার প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর ঃ—আমরা যে এই পৃথিবীতে এসেছি বা জীবজগৎ যে এসেছে—কেউ আমরা

আসিনি। এ কথা শুনে তোমাদের অবাক লাগছে যে, আমরা যেটা এসেছি—সেটা আবার আসিনি, এটা কি করে হয়! সেটা কি করে হয় শোন।—যে বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না, অস্তিত্ব নিয়ে গোলমাল হয়, খুঁজতে গেলে যে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, যারা আসে তাদের খুঁজতে গেলে যখন খুঁজে পাওয়া যায় না—তারা কি আসে?—ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তোমরা? যে বিষয়বস্তুকে তোমরা দেখতে পাচ্ছো, খুঁজতে গেলে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। যত খুঁজতে যাও, নিজেই তার মধ্যে হারিয়ে যাও—হারিয়ে যাওয়াটাই হ'ল খোঁজার রীতি। যত খুঁজবে, তত সেই নিখোঁজের মধ্যে হারিয়ে যাবে। খুঁজতে গেলে শেষে নিজেকেও আর খুঁজে পাবে না। সুতরাং সেই আসাটা আসা নয়। যেই আসার মধ্যে সত্যিকারের অস্তিত্ববোধ থাকবে, জানার বোধ থাকবে, সেই আসার মধ্যে সত্যিকারের অর্থ আছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ?—'আমি আছি' এই বোধ চিরন্তন বোধের সঙ্গে যোগাযোগে থাকবে, সেই বোধ হ'ল সত্যিকারের এসেছি; আর সেই বোধ যদি না থাকে, তবে আমরা আসিনি। 'আমি এসেছি' বলে যেটা মনে হচ্ছে, খুঁজতে গেলে যেটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, সেটা যে রকম,—যেমন তোমরা রেডিও শোন—যে ব্যক্তি বলেন, সেই ব্যক্তি যেমন তোমাদের কাছে আসেন না, সেই ব্যক্তি বিলাতে বসে কথা বলছেন, আমরা এখানে বসে কথা শুনছি, কিন্তু তাঁকে তো আর পাচ্ছিনা! কিন্তু তাঁর কথা শুনতে তো বাধা নেই। কথা যেমন আসে, ব্যক্তি সে রকম আসে না। আমাদের এই যে জীবজগৎ, এই যে সৃষ্টি—এটা হচ্ছে একটা শব্দ—এটা হচ্ছে একটা ধ্বনি। এই জগৎটাই হ'চ্ছে একটা শব্দ বা ধ্বনি, যার রূপকে তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ। দেখতে পাওয়াটায়—দেখা-ক্রিয়ায় চক্ষু সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু শুনা-ক্রিয়ার মতন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? চোখে দেখি সত্যি, কিন্তু এই দেখাটা শব্দ-ক্রিয়ার মতন। শব্দটা যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমন চোখে দেখাটাও এক জাতীয় ধ্বনি। শব্দ-ক্রিয়ার মতন—যাকে খুঁজতে গেলে খুঁজে পাওয়া যায় না,—চোখটা হ'চ্ছে এক জাতীয় কান, জিহ্বাটা হ'চ্ছে এক জাতীয় কান। যেটা চক্ষুক্রিয়া করছে, মানে তোমরা দেখতে পারছো, সেটা কি দেখতে পারছ?—সেই ব্যক্তিকে নয়—তার সত্তা, তার সুর—সেই সুরটাকে তোমরা পাচ্ছ সৃষ্টির মাধ্যমে, তোমরা পাচ্ছ যন্ত্রের মাধ্যমে। সেই সুরটাকে যন্ত্রের মাধ্যমে মাত্র তুলছি; সুরটা যন্ত্রে থাকে না, কিন্তু যন্ত্রের সাথে সুরের সম্পর্ক আছে, যন্ত্রে তুলে নিতে হয় সেই সুরটাকে। সুর-যন্ত্রটা আমাদের মধ্যে আছে, সুরটা আমরা তুলছি।—কি ভাবে তুলছি?—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বকের দ্বারা, আমরা জীবজগতের যে বিষয়স্তুর সাথে যোগাযোগ সূত্রে আবদ্ধ, সেটাকে বোধগম্য করছি।—বুঝতে পেরেছ?

কঠিন হয়ে গেল কি?—শোন। —যে শব্দ—গান বাজনা আজ লন্ডন থেকে শুনছ, সেই শব্দ এতটুকুন যন্ত্রের ভিতর দিয়ে শুনছ। এতটুকু যন্ত্রে দশ হাজার মাইল দূর থেকে শব্দ শুনছ। এই যন্ত্রটাই হ'ল মন্ত্র।—যিনি বলছেন, তাঁর কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ। স্রষ্টা বলছেন তাঁর বিরাট শক্তি,—তাঁর সে দান, তাঁর সে সুর যে আমরা সৃষ্টির মাধ্যমে—জীবজগতের বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি—এই কথাটা তোমরা ভাল ক'রে বুঝে

নাও। যেমন—কথাটা শুনতে পাওয়া যায়,—এই যে হাতে তালি দিলাম—এই শব্দটা যেমন শোনা যায়, ওই দেখাটাও এই রকম এক জাতীয় জিনিস, শুনাটাও সেই জাতীয় জিনিস।—দু'টোতে মিলছে না, কেমন? কেন মিলছে না শোন।

—দেখার চেয়ে শোনাটা একটু সূক্ষ্ম। মানে, দেখছ যেটা—শব্দ জমাট বেঁধে বরফ আকারে দেখছ। বুঝতে পেরেছ? শব্দটাকে—জলটাকে কি আকারে দেখছ?—বরফ আকারে দেখছ। শব্দটা কিভাবে দেখছ?—একটা সলিড্—একটা বস্তুর ভিতর দিয়ে সেটা দেখছ। এই বস্তুটা কি?—বরফাকার।—বুঝতে পেরেছ? শব্দটা বরফ আকারে এই গাছ-পালা, জীব-জন্তু, নদী-খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত—এগুলোকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। শব্দটাকে বরফ আকারে দেখতে পাচ্ছ। এই বরফ যখন গ'লে যায় তখন, এই যে হাতে তালি দিচ্ছি শব্দ হচ্ছে—এই শব্দ হয়ে যায়, নাদ হয়ে যায়, ধ্বনি হয়ে যায়। সহজ ক'রে বলছি তো এটা!—এই যে হাতে তালি দিচ্ছি—শব্দটা, এটা জমাট বেঁধেছে। পৃথিবী, সূর্য জমাট বেঁধেছে।

কি করে জমাট বাঁধে? শব্দটা যে জমাট বাঁধে তার প্রমাণ কি? প্রমাণ হ'ল—আমার আমিত্বকে তুমি খুঁজে পাবে না, আমার আমিত্বকে কেউ খুঁজে পায় না। কে আমি, কে বুদ্ধি, কে বৃত্তি, কে চিন্তাধারা—খুঁজে পাবে না। খুঁজে পাবে শুধু রক্ত-মাংস, শিরা-উপশিরা। কথাটা বুঝতে পেরেছ? যখন কাটা-ছেঁড়া করা যায় তখন রক্ত মাংস, শিরা উপশিরা—যন্ত্রের তারগুলি শুধু খুঁজে পাওয়া যায়, আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং কে বলে, কে বুঝে? চক্ষুকে খুলে রেখে দিলে সেই চোখ নিজে দেখে না, আবার সেই চোখ যখন লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন সে দেখে। চোখ নিজে দেখে না। কে দেখে কে বোঝে সেটা জানা নেই, শুধু রক্ত-মাংসের তার আছে কতকগুলি। এই তারগুলি কিসের? এই তারগুলি হচ্ছে এই মহাশূন্যের শব্দকে, এই বিষয়বস্তু যেটা দেখছ, সেটাকে শুধু জাগিয়ে দেওয়ার মতন যে অবস্থাটা, সেই অবস্থাটার যন্ত্র—শুধু এই-টুকুন। এই বাস্তব জগৎ যেটা, এটা যে সুর—এটা সুরেরই যে একটা আকার এবং সুর জমাট হয়ে বরফ হয়ে রয়েছে যে এই জগৎটা, তার প্রমাণ হ'ল সূর্যতেজ আজও গলিত। সেই গলিত সূর্যতেজ হ'ল পৃথিবী—এই রকম অগণিত পৃথিবী। এই তেজ ধাতু, এই ধাতুর দ্বারাই হ'ল জগৎ;এই ধাতুই হ'ল বীর্য, এই ধাতুই হচ্ছে সৃষ্টি। সূর্যটা সম্পূর্ণ ধাতু দিয়ে তৈরী। পৃথিবী সেই ধাতু থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই ধাতুই হ'চ্ছে দেহ, এই দেহের ধাতুর দ্বারাই জীবজগৎ—জীব সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের এমনি যোগাযোগ-সূত্র।

বস্তুর অস্তিত্ব যদি এক থাকতো, তবে বস্তুর রূপের পরিবর্তন হ'ত না,—এটা মনে রেখো। অস্তিত্ব যদি এক থাকতো, তা হ'লে সেই রূপের পরিবর্তন হ'ত না। রূপের পরিবর্তন হয় বলেই শব্দ নামে অভিহিত হয়েছে। কি রকম?—যেই বীজ তুমি দেখছ, গাছের সঙ্গে বীজের এক চেহারা নয়। রক্ত-কণিকায় যেই জিনিষ আছে, মানুষের চেহারার সঙ্গে সেই-রক্ত কণিকার এক চেহারা নয়। এবং খাদ্যের মধ্যে যেই চেহারা আছে—খাদ্যের থেকে রক্ত হয়, সেই খাদ্যের চেহারার সাথে জীবের চেহারা এক নয়। বাতাসের যেই

চেহারা, সেই চেহারার সাথে সবার চেহারা এক নয়। যখনই বিষয়বস্তু ক্রমশঃ ধাপে ধাপে পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে পরিবর্তন হয়ে যায়, তখনই হবে সেটা ধ্বনি। ধ্বনিই একমাত্র সুরের ভিতর দিয়ে ঢেউ খেলতে থাকে, একমাত্র ধ্বনিই কেবল ঢেউ খেলতে খেলতে যায়। সাগরে যেমন ঢেউ আছে, বাতাসেও ঢেউ আছে, জলের স্তরে স্তরে ঢেউ আছে। সৃষ্টির ভিতর দিয়ে একমাত্র ঢেউই আছে; সমন্বয় সূত্রে একই ভাবে বন্ধনে আছে বলেই সমস্ত জগৎটা শব্দময়। শব্দময় আছে বলেই সুর হয়ে গেছে, সুরে জগৎটা ভরপুর হয়ে গেছে। সুরটা কি হ'চ্ছে?—যেটা 'আছি' বলে মনে হয়, সেই বলছে যে, 'আমি নই', 'আমি আসিনি',—আবার বলছে যে, 'এসেছি'।—কি আকারে?—ধ্বনি আকারে।

কেন আসার প্রয়োজন? বরফ আকারটা কেন?—জলে পরিণত হওয়ার জন্য। কেন এই ধ্বনি?—এই বাস্তব জগতে এই ধ্বনিটা রূপ আকারে যেই রূপ নিয়ে এখানে এসেছে—যেই ধ্বনি, যেই রূপ নিয়ে এখানে এসেছে, এই রূপের প্রয়োজনীয়তা কি? প্রয়োজনীয়তা হ'চ্ছে—এই বাস্তব জগতের শব্দ বা ধ্বনিটা।—এটা কি রকম? বর্ষার জল যখন আসে আবার যখন নেমে যায়, সাথে সাথে সমস্ত ময়লা আবর্জনা সব টেনে নিয়ে যায়; বন্যায় জলে ভেসে যায়, আবার টেনে নিয়ে যায়। শব্দধ্বনির একমাত্র কাজই হ'চ্ছে সমস্ত বিষয়বস্তুকে টেনে নেওয়া, সুরকে টেনে নিয়ে নেওয়া এবং সব কিছুকে টেনে সুরে মিলিয়ে দেওয়া। এখন এই যে সুর যেটা রয়েছে, যেই বিষয়বস্তু আকারে এই জগতে রূপটা রয়েছে, তার মধ্যে জীব আকারে যেই সুরধ্বনি যেটা জমাট রয়েছে, যেটা প্রাণ নামে অভিহিত হয়েছে, প্রাণ বা চৈতন্য নামে যেটা নামকরণ হয়েছে, এই প্রাণ, এই চৈতন্য কে কি করছে জান? সুর কি ক'রছে, বিরাট পুরুষ কি ক'রছেন? তিনি সৃষ্টির ভিতর দিয়ে যেই রূপ নিয়ে এখানে এসেছেন, সেই রূপটা কি করছে?—একাধারে জল, একাধারে বরফ।—আবার কি করছে? একাধারে চৈতন্য এবং প্রাণ এবং বুদ্ধিবৃত্তি—এই নামে অভিহিত হয়ে একটা সত্তায় পরিণত হয়েছে।—এটা কিসের জন্য? আমার শরীরে যেমন আমি চুলকাচ্ছি—আমার দেহের বুদ্ধিবৃত্তি চিন্তাধারা যেমন আমাতেই ন্যস্ত, যার যার দেহগত বুদ্ধি যেমন তার তার উপরেই ন্যস্ত, এই স্রষ্টা সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সেই বিরাট সুরের দ্বারা প্লাবিত করেছেন, সুরের দ্বারা ভরপুর ক'রে রেখেছেন, সেই সুরকে অবগত করার জন্য, সুরকে বোধগম্য করার জন্য নিজেই আর এক রূপে রূপান্তরিত হয়েছেন। ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পেরেছ?—সেই সুরকেই বোধগম্য করার জন্য, যেমন তুমিই তোমার স্বাদ—তোমার স্বাদ তোমাতেই ন্যস্ত; তোমার জিহ্বায় যখন কিছু দাও, তখন স্বাদ তোমার জিহ্বা দিয়ে তোমাতেই ন্যস্ত থাকে, তুমি সেই স্বাদ উপলব্ধি করতে পারছ, বুঝতে পারছ সেই স্বাদ। স্রষ্টা তাঁর স্বাদকে, সুরকে তাঁর নিজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রাণ বা চৈতন্য নামে আর একটি বিরাট সত্তা ভিতরে গঠন করেছেন, যার ফলে জীব নামে অভিহিত হয়েছে এবং বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হয়েছে—বিভিন্নভাবে তার স্বাদকে গ্রহণ করার জন্য। বিভিন্ন জিহ্বা, বিভিন্ন রূপ, অনন্ত প্রাণ দ্বারা একটা সত্তাকেই উপলব্ধি করার জন্য বহু প্রাণের সমষ্টি দ্বারা একটা স্বাদকে গ্রহণ করছেন। এই বহু প্রাণ, বহু সমষ্টি

বহু বহু সেই সোয়াদকেই গ্রহণ করছে এবং এই যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণ, ভিন্ন ভিন্ন যে দেহ—এইগুলো কি ক'রছে? আমাদের কর্তব্য হ'চ্ছে কি? সুরের মধ্য দিয়ে, সুরের ভিতর দিয়ে আমরা সুর, আমরা এসেছি, আবার আমরা আসিনি—এইভাবে এগিয়ে যাচ্ছি।

প্রাণ এসেছে, চৈতন্য এসেছে সেই মহান চৈতন্য থেকে। চৈতন্য সেখানে কি করলেন? নিজেকে সচেতন করলেন। কিভাবে সচেতন করেছেন? সুরের সাথে যুক্ত হ'য়ে সেই চেতনায় সচেতন হ'য়ে আমরা যদি এগিয়ে যাই, মহা-চৈতন্যের সঙ্গে মিলন সূত্রে আমরা আবদ্ধ হতে পারি, আমরা এক সূত্রে সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারি।—এই ভাবটা, এই পরিচয়টা করার জন্যই হ'চ্ছে যে, প্রাণ এবং চৈতন্য মহাচৈতন্য থেকে এসে আমরা যে দাঁড়িয়ে রয়েছি,—এই সুরটাই জমাট বেঁধেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? কঠিন হয়ে যাচ্ছে মনে হয়।

এই যে চৈতন্যটা এসেছি—আমরা যেটা, এই চৈতন্যটা কি? এই যে দেহটা দেখছ, জেনে রাখবে, এই দেহের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না, এটার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু একটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে—'বুঝি', এই যে উপলব্ধি করার যে বুদ্ধিটা, চৈতন্যটা এইটা আছে—তা তোমরা বুঝতে পারছ, কিন্তু কে বুঝতে পারছে তা বুঝতে পারছ না। এখন সেইটাকে বুঝতে বুঝতে যদি তোমরা যাও, তবে জায়গা মতন চলে যেতে পারবে।—কেন বুঝতে দেওয়া হয় না?—বুঝতে দিতে গেলেই আমরা আটক হয়ে যাব। আমাদের এই যে বুঝতে না দেওয়ার বুদ্ধিটা, পদ্ধতিটা—কিসের জন্য? আমরা যে বুঝতে পারি না! আমরা বুঝতে পারছি 'আছি'—এইটুকুন যে বুঝতে পারছি, কিভাবে যে যাব, কোথায় যে কি, তা আর বুঝতে পারা যাচ্ছেনা। কেন? টেনে নেওয়ার জন্য। আমরা কি করছি? তখনই বুঝতে যাই, বুঝার জন্য অগ্রসর হই। বুঝতে যাওয়ার যে পদ্ধতি এবং কাজ, কাজটাই হ'ল ধ্যান-ধারণা, যোগসূত্র। এই সূত্র ধরে' ধরে' আমরা কি করছি? এই জাগতিক সমস্ত বিষয়বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছি। সেইটাই হ'ল ধ্বনি, সেইটাই হ'ল মন্ত্র। সেই মন্ত্রকেই স্মরণ করে' আমরা চৈতন্যকে, আমাদের প্রাণকে, মনকে কি করছি? সেই কাজে নিযুক্ত করার জন্য আমরা নিবিষ্ট চিত্তে যেই ভাবে খুশী যদি স্মরণ করি শব্দকে, এই সৃষ্টির বিরাট সত্তাকে, তবে অনায়াসে আমরা সবকিছু বুঝে নিতে পারি। এই চৈতন্য কি করছে? চৈতন্যটা ঠিকই থেকে যাচ্ছে। স্রষ্টা কি করছেন? প্রতি মুহূর্তের চৈতন্যের ভিতর দিয়ে শুধু রূপ নিয়ে নিচ্ছেন। কেন নিচ্ছেন? তিনি নিজেকে নিজে উপলব্ধি করার জন্য, নিজেকে নিজে বুঝবার জন্য হ'চ্ছে বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন সৃষ্টি এবং ব্যবধান ও পার্থক্য। এই যে পার্থক্য বোধ, ব্যবধান বোধ এবং বিভিন্নতা বোধ, এই বোধের ভিতর দিয়ে, এত ভাগাভাগির ভিতর দিয়ে কি করছেন? নিজেকে নিজে তিনি বুঝবার জন্য আজও অফুরন্ত, অবিরাম, অনবরত সৃষ্টি করে' চলেছেন যে, 'আমি আমাকে বুঝব, আমার সত্তাকে বুঝব বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন সত্তায়' এবং সেই জন্য ঠিক ঐ ভাবে এই শব্দগুলো, ধ্বনিগুলো, নাদগুলো বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হ'য়ে চলেছে। তাই কেউ আজ পর্যন্ত কোন রূপকে, তার সত্তাকে, 'আমার আমিত্ব'কে

প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি কনে? প্রতিষ্ঠা ক'রতে গেলেই এক জায়গায় প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। কেউ সম্পূর্ণ খোঁজ পেয়ে বলেনি যে 'আমি খোঁজ পেয়েছি'! খোঁজ এক জায়গাতেই পেয়ে যায়; খুঁজতে খুঁজতে এমন জায়গায় চলে যায় যে, মিলতিতে চলে যায়। এই গণতির এমনি গণা— যে চৈতন্য, তা কি চমৎকার! আঙ্গুলগুলো তো তুমি না, কিন্তু একটা আঙ্গুলে চিমটি দিলে বুঝা যায়, ব্যক্তিগত বোধ আছে এবং যার যার স্বাধীন চিন্তায়, স্বাধীন মনে স্বাধীন বোধ আছে। কি করেছে চৈতন্য, কেন করেছে? স্রষ্টা তাঁর স্বাধীন চিন্তায়, স্বাধীন মনে স্বাধীন ভাবে এই সৃষ্টির কার্য চালিয়ে গেছেন এবং কি করছেন? প্রত্যেকটি আলাদা, প্রত্যেকটি ব্যবধান, প্রত্যেকটি পার্থক্যের ভিতর দিয়ে নিজের সত্তাকে তিনি পৃথকভাবে উপলব্ধি করছেন।— বাচ্চার বাবা কি করলেন? নিজের রক্ত দিয়ে বাচ্চা জন্মালেন, আবার সেই বাচ্চার সঙ্গে কথোপকথন করছেন—নিজের রক্তের সঙ্গে কথোপকথন করছেন। ছেলে বাপের হাত-পা টিপছে, ছেলে বাবাকে খাওয়াচ্ছে—এ কিরে বাবা!—আমারই রূপ, আমারই গুণ, আমারই সত্তা আর একটা রূপের ভিতর দিয়ে আমি আমাকে বাবা ডাকছি। তোমারই রূপ, তোমারই রক্ত, তোমারই বীর্য—তোমাকেই বাবা ডাকছে। এটাতে কি বুঝিয়ে দিচ্ছে? স্রষ্টা বলছেন— তোমার রক্তের ভিতর অগণিত মানুষ গড়াগড়ি খাচ্ছে—তোমার রক্তে অগণিত মানুষ; তুমি কি একা? তুমি একা বসে আছ—কিন্তু তোমার মধ্যে অফুরন্ত মানুষ বসে আছে, একজন মানুষের মধ্যে কোটি কোটি মানুষ আছে। তা' হ'লে একটা মানুষের বুদ্ধি, কোটি কোটি মানুষের সত্তা সুপ্ত ভাবে রয়েছে তোমার মধ্যে—বুঝতে পেরেছ? একটা মানুষের বীর্য যদি একুটও নষ্ট না হয়, তবে সেই একটা মানুষের বীর্য দিয়ে হাজার হাজার পৃথিবী ভরে দেওয়া যায়। তা'হলে এতগুলি মানুষ, এতগুলি বুদ্ধি, এতগুলি বুদ্ধির সত্তা তোমাতে ন্যস্ত। তোমার মধ্যে তা হ'লে ক্রিয়া হচ্ছে, তাতে কি বুঝতে পারছ? তাতে বুঝতে পারছ এই—শেষ হয়নি। তোমার মধ্যে যে একটি মানুষ সৃষ্টি হ'ল তার মধ্যে অফুরন্ত, ছেলের মধ্যে অফুরন্ত, ছেলের ছেলের মধ্যে অফুরন্ত, তার ছেলের মধ্যে অফুরন্ত।

তা' হলে তুমি কোথায়? তুমি তো তা হলে একা নও, তুমি এতটুকুন নও, তোমার বীর্যে বহু পৃথিবী ভরিয়ে দেওয়া যায়। তা' হ'লে ছেলের ছেলে, তার ছেলে—এই ভাবে পৃথিবীময় তুমি, সৃষ্টির সমস্ত জীবজগতের সত্তা নিয়ে তোমার এই দেহ গঠন। তোমাকে খুঁজতে গেলে তুমি কত মানুষ, কত জীব, কত নামে তুমি আছ। তা হ'লে তোমার এতটুকুন সত্তাতে শুধু তোমার কথা নয়—তোমার সত্তা তোমার নয়, তুমি ব'লে যেটা মনে ক'রছ—অফুরন্ত বিশ্বজগতের সমস্ত জাগতিক বুদ্ধিবৃত্তির সত্তা নিয়ে তোমার মন, তোমার প্রাণ, তোমার দেহ-গঠন। তুমি যখন কথা বল, তোমার ভিতরে অফুরন্ত স্ফুরণের সেই সাড়া দেয়; তা হলে জগতের সমস্ত স্ফুরণের মধ্যে সেই সত্তা গিয়ে স্পর্শ পায়। তবে কেন জাগে না?— ব্যবধান হয়ে তুমি রয়েছ।—বরফ আর জলে কথা বলে। বরফ বলছে—আরে জল, আমি তো একদিন তোর মতন ছিলাম। বরফ সাগরের জলে ঢেউয়ে দুলছে আর জলকে বলছে— আমি তোর মধ্যে তোর মতই ছিলাম। জল বলছে—থাকলে কি হবে, এখন তো আমার

ঢেউয়ে দুলছ। বরফ বলছে—ভাই, আমি আবার কবে তোমার সঙ্গে মিলব? জল বলে—জানি না কবে মিলবে। বরফ বলছে—আমি কি মিলতে পারব না তোমার সঙ্গে? জল বলছে—এখন তো দোল।

বরফ দুলছে আর ভাবছে—কবে সূর্যের দেখা পাব, তবে আমি গ'লব। দুঃখ করে বলছে—কবে আমি গ'লবরে ভাই? একদিন তো তোমার মতন গ'লে ছিলাম, সমস্ত জায়গায় আমি মিশে ছিলাম। আর এখন আমি তোমার মধ্যে বাড়ি খাচ্ছি, থাপড়া খাচ্ছি আর নাচছি। জল বলছে—তুমি আকাম করতে গিয়েছ, এখন নাচ। মানে, আমরা দুলছি, কেননা নিজেরা নিজের দ্বন্দ্বে জমাট বেঁধে গেছি। সেই যে অফুরন্ত ফোয়ারা, সেটার মধ্যে মিশতে পারছি না। মিশতে না পারলে কি হবে? আমরা সেই জল—সেই ফোয়ারায় সেই বরফ হয়ে নাচছি।—সেটা কি হচ্ছে? আলাদা হয়ে ব্যবধান হয়ে, পার্থক্য হয়ে ব্যক্তিত্ব রেখে, সত্তা রেখে আমরা উপলব্ধি ক'রছি স্রষ্টার সেই শ্রেষ্ঠ বস্তুর বস্তুত্বের সন্ধানের সোয়াদ। সেই সোয়াদটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি আলাদা ব্যবধান থেকে, কিন্তু ভিতরের অর্থ হ'চ্ছে কি? এক সুরে বাঁধা, এক সত্তায় বাঁধা এবং সেই সুরটাই জমাট হয়ে বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হয়ে এই পার্থক্য হয়ে রয়েছে, ব্যবধান হ'য়ে রয়েছে। এটাই হ'চ্ছে আমাদের কাজ, যেই কাজের মাধ্যমে, যেই সুরের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যেতে পারব বিরাট সত্তায়, বিরাট ভাবে এবং সেই কাজ করার জন্যই এবং পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই এত রূপ, এত জগৎ, এত সৃষ্টি বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হয়ে গেছে।

এক কথা বলছিলাম, আর একটা বলে চলেছি অন্য দিকে। এই পৃথিবীর সাথে সূর্যের—সূর্যের সাথে অন্যান্য গ্রহের একটা যোগাযোগ যে রয়েছে—একে অন্যের আকর্ষণে যে রয়েছে, উভয়ের যে আকর্ষণ শক্তি —এই শক্তিটা কিন্তু জাগ্রত। সূর্যের সাথে অন্যান্য গ্রহের একটা যোগাযোগ, এই যোগাযোগটা কিসের জন্য বলতো? এই যোগাযোগটা হয়েছে—এই জীবজগৎ জীবে যখন ভরে যাবে, জগতে যখন জীব ভরপুর হ'য়ে যাবে—জীবের সিঁড়িটা কোথায়? স্বর্গের সিঁড়িটা কোথায়? কথায় বলে যে স্বর্গের সিঁড়ি, স্বর্গের সিঁড়ি তো আর এমনি দড়ি ফেলে করবে না। মানে স্বর্গের সিঁড়ি হ'ল, এই যে আকর্ষণের মাঝে যে সিঁড়িটা রয়েছে, এই সিঁড়ি দিয়েই আমাদের যেতে হবে। এই সিঁড়িটা এমন সুন্দর, যদি একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র—মানে এই যন্ত্র নয়—একটা থাকলে দেখতে, একটা কি সুন্দর সিঁড়ির মতন রয়েছে। বড় অদ্ভুত! সেই লিফ্টের মতন নিয়ে যাবে, টানা হ্যাঁচড়া করে যেতে হ'বে না। সেই সিঁড়িটা কিসের জন্য? সেটা—পৃথিবীকে যে টেনে রাখতে পারে, সূর্যকে যে টেনে রাখতে পারে, সমস্ত গ্রহ উপগ্রহকে যে টেনে রাখতে পারে, এই টেনে রাখার শক্তিটার থেকে যখন আমরা এসেছি, তখন আমরা তো সেই শক্তির সঙ্গেই যুক্ত। তাই আমরা সেই শক্তির সঙ্গেই যাব, সেই ভাবেই মিশব।—কিভাবে জান?—আমরা বীজ হয়ে এসেছি, গাছ হয়ে বের হলাম, ফুল-ফল হয়ে আবার বীজ হয়ে যাব। আমাদের কোন অসুবিধা নেই, আমরা ঠিক চলে যাব, যে বীজ পুতেছি সেই বীজ হয়ে বেরিয়ে যাব। আমাদের এই যে

আকর্ষণটা রয়েছে, এই আকর্ষণটাই যাবার রাস্তা। তোমরা এই শুনে মনে করতে পার—ফাঁকা জায়গাতে কি ক'রে যাব, ফাঁকা জায়গাতে কোথায় ছুটাছুটি ক'রব? এই ফাঁকা জায়গাতে যে একটা বিরাট রাস্তা রয়েছে, সেটা তোমরা তো দেখতে পাচ্ছনা! অতি অপূর্ব রাস্তা, অতি সুন্দর রাস্তা! এই রাস্তা দিয়ে সবাই আমরা এগিয়ে চ'লে যাব, এবং যাবার জন্যই স্রষ্টা তৈরী করে রেখেছেন। কেন রেখেছেন? তাঁর স্বার্থ, স্রষ্টার স্বার্থ হ'ল বড় স্বার্থ, সবসচয়ে বড় উদ্দেশ্য তাঁর। সেই ইচ্ছাটাই পুরণ করার জন্য এই রূপ, এই জগৎ, এই সমস্ত কিছু। তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করাই হ'ল আমাদের কাজ এবং তিনি আমাদের ভিতর দিয়েই সেই ইচ্ছাশক্তিকে পূরণ করে দিয়েছেন। এই পূরণ ক'রতে গিয়ে তোমাদের কোথায় গিয়ে আটকাচ্ছে জান? আটকাচ্ছে—স্রষ্টা এক জায়গাতে গিয়ে বারে বারে হুচোট খাচ্ছেন। স্রষ্টা নিজে স্বাধীন কিনা! তাই তিনি কি করেছেন; তিনি সমস্ত জীবের মধ্যে ইচ্ছাশক্তিটা দান ক'রে দিয়েছেন। এইটা দিয়ে দেওয়াতে তিনি একটু অসুবিধায় পড়ে গেছেন। প্রত্যেকের মধ্যেই এই ইচ্ছাশক্তিটা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে স্বাধীন, তিনি যে বিরাট, তাই সেই জায়গায় তিনি আটকাননি। সুতরাং সেই স্বাধীন চিন্তাটা দিয়ে দিয়েছেন এই অজ্ঞানতার মাঝে, এই অবুঝের মাঝে, স্বাধীনতা বুদ্ধির স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। তাতে ভালও হয়, মন্দও হয়। কিসে? তুমি ইচ্ছা করলে তোমার হাতটা কেটে ফেলে দিতে পার, এই স্বাধীনতা তোমার আছে। ইচ্ছা করলে তুমি তোমাকে বিনাশ করে দিতে পার, এই স্বাধীনতা তোমার আছে। ইচ্ছা করলে তুমি কাজ না করে থাকতে পার, এই স্বাধীনতা তোমার আছে। কিন্তু আর একদিকে তোমার স্বাধীনতা নেই।—স্বাধীনতা তোমার থাকতো, যদি তুমি হাত কেটে ব্যথা না পাও। ব্যথা পেলে এই স্বাধীনতা মূর্খতা। তোমার ভিতর যে স্বাধীনতা তিনি দান করেছেন, ইচ্ছা করে যদি তা অপব্যবহার কর, দুধ না খেয়ে তুমি যদি নর্দমার জল খেতে যাও, সেখানে বলার কিছু নেই। স্রষ্টা তা আটকাবেন না। কেন আটকাবেন না? কারণ তিনি দান করেছেন; তিনি যা দান করে দিয়েছেন, তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ বলেই হাত দেন না। তোমার ভিতর যে চেতন আছে, সচেতন আছে, প্রতি মুহূর্তে তোমাকে সজাগ করে দিচ্ছে যে, কি করা উচিত বা না-উচিত। সেই হিসাবে যদি আমরা চলি তবে আর অসুবিধা হয় না। সত্যিকারের সেই স্বাধীনতাকে যদি আমরা অমর্যাদা না করে মর্যাদা দিয়ে চলি, তবেই হবে তাঁর স্বাধীনতা দেওয়ার মর্যাদা রক্ষা করা, সত্যিকারের সেবা করা। আমাদের স্বাধীন বুদ্ধি, স্বাধীন চিন্তার যদি সদ্ব্যবহার করি, তবেই হবে তাঁর সত্যিকারের পূজা এবং সেই হিসাবে তোমরা কাজ করে যাও। স্বাধীনতার যদি তোমরা সদ্ব্যহার না করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে যাও, তবে তোমাদের হবে ঠিকই, কিন্তু অনেক দেরীতে গিয়ে তোমরা পৌঁছবে। সেখানে পৌঁছবে না, এটা ঠিক নয়। স্রষ্টার নিয়মে সে-দিন একদিন-না একদিন আসবে, সে এখন লক্ষ বছরেই হোক আর কোটি বছরেই হোক। সেই আনন্দলোকে গিয়ে মিলবেই, এটা তাঁর নিয়ম। কিন্তু সেজন্য কেউ প্রতীক্ষা করে থাকে না। যত তাড়াতাড়ি মিলন হয়, মিলনের সুরের সাথে প্রত্যেকে মিলতে চায় এবং জানতে চায়। প্রত্যেকের স্বাধীন চিন্তা,

স্বাধীন বুদ্ধি, স্বাধীন সুর এবং সুরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হ'চ্ছে আমাদের কাজ। তোমরা তারই পথিক, তোমরা তারই যাত্রিক।

প্রশ্ন ঃ—আসলে যাওয়ার প্রশ্ন আসে, আর যদি আমরা না-ই আসি, তবে তো আর যাওয়ার প্রশ্ন আসে না।

উত্তর ঃ— তোমার কথায় বলি। আসলে যদি যাওয়ার প্রশ্ন আসে, তবে তো আসিই নাই। যদি আসলাম, তবে আর যেতে চাইব কেন?—সেইটাই হ'ল আসা। এসে যখন যাচ্ছি, তখন তো আসা হ'ল না—ওটা যাওয়াই, কারণ কেউ এখানে থাকে না। বাবা, ঠাকুরদা সবাই তো যাওয়ার পথিক। একটা লোকও তো থাকছে না! তা হ'লে আসাটা যাওয়ার, আসাটা আসার নয়। যেটা এসেছ—সেটা যাত্রিক হিসাবে, সেটা স্থিতি হিসাবে নয়। এখন সেটা পার্থক্য-ব্যবধানে এসেছ, রূপে এসেছ এখন।

— তোমরা যে এখানে আছ— এ মাকুর কারখানা। মাকু দেখেছ তো? কাপড়ের কলে মাকু চলে খটাং—খটাং, কত কষ্ট ক'রে তারা কাপড় বুনছে। এখন তোমরা মাকুর কারখানায় আছ। এখন ভয়ঙ্কর পেরাশনি চলছে। সেই জায়গায় যখন আমরা যাব,—এক জায়গায় থাকব—সেই ব্যবস্থাটা তো তৈরি ক'রে নিতে হবে, সেই জায়গায় যাওয়ার মত! কারখানাতে কাজ ক'রছ—এইখানকার শান্তি চাইলেই ঠ'কলে যে!—'প্রভু একটু শান্তি দিন'—তবেই ঠকলে। ব্যাপারটা হ'ল কি? 'আমার ছেলেকে বাঁচান', 'আমার ছেলেকে রক্ষা করুন', 'আমাকে বাঁচান'—সব এক পয়সা। কাকে বাঁচাবে? তুমি বাঁচাতে চাও— তুমিও যাবে। বাবা এসে ব'লল—আমার ছেলেকে রক্ষা করুন। শেষে দেখি বাপ রাস্তায় পড়ে' আছে। আবার তার ছেলে এসেছে দৌড়িয়ে—বলি, কাকে বাঁচাবে? বাঁচে কে? কার শান্তি চাও? এখানে কি শান্তি চায় মানুষে? না হ'লে নয়, তাই। কেউ যদি তোমাকে গড়ের মাঠটা দেয় এই বলে যে, তোমাকে দশ বছরের জন্য দিলাম,—তুমি কি গড়ের মাঠে দশ লাখ টাকা খরচ করে' ঘর ক'রবে? তোমার যদি আয়ু দশ বছর থাকে, আর যদি দশ বছরের জন্য দেয়, তবে তো তুমি ঘর করবে না। ব'লবে—দুর, কার জন্য ঘর ক'রব? থাকব তো দশ বছর, আর ঘর করে' কি হবে?— তেমনিই এই জায়গাটা। যা না হ'লে নয় ততটুকুই ক'রব, কর্তব্য ক'রব। তার চেয়ে বেশী কর্তব্য হ'চ্ছে, স্রষ্টা বলছেন, যে প্রয়োজনে এসেছ সেই প্রয়োজনটা গুছিয়ে নেওয়া—এই বার বার জন্মের ঝঞ্ঝাটে যাতে আর না পড়তে হয়! এটা এমন পাক, জলের মধ্যে যেমন পাক থাকে, এমনই ঘূর্ণিপাক জন্মের স্তরগুলো। এই পাকের থেকে কিছুতেই যাওয়া যায় না, টেনে নিয়ে রাখছে। এখন এই পাকের থেকে উঠতে হবে তো! স্তরগুলো ভেদ করে উঠবার জন্যেই তো এত কিছু। আমার সাত-আট বছর থেকে এই বয়সে কত তো গেল দেখলাম। কত যাচ্ছে—আরে বাপরে বাপ—চোখে সব দেখছি। এই জায়গা থেকে কত জন যাচ্ছে। চলে তো যাচ্ছে দেখছি, আবার রাত্রে এসে আমাকে যা জ্বালায়! এখন কম জ্বালায়—আগে তো খুব আসত। একদিন আমি এক জায়গায় গেছি, বসে আছি, দেখি চার-পাঁচটা এসেছে আমার সামনে। বললাম—কিরে অ্যাঁ?—একটা রেলে কাটা গিয়ে

মরেছে, একটা জলে পড়ে মরেছে, একটা আগেই মারা গেছে— এসে দাঁড়িয়ে আছে! রাস্তা দিয়ে যেতাম—কি উৎপাত ক'রত জানিস? আরে সর্বনাশ! সব আটকে আছে, আটকের মধ্যে পড়ে আছে— যাবে কোথায়? ঐ জলে ভাসছে সব, —না মেলা পর্যন্ত তো ভাসবেই।

প্রশ্ন ঃ—তাদের উদ্ধারের কি হবে?

উত্তর ঃ— ঐভাবে উদ্ধার হয় না বেশী, না মেলা পর্যন্ত উদ্ধার নেই। উদ্ধার হতে হলে নেমে আসতে হবে— জন্ম নিতে হবে। ঐখানে গেলে কর্ পড়ে যায়, উদ্ধার বেশীহয় না, মেলে না বেশী। বড় ফ্যাসাদ। সুযোগ হ'চ্ছে জন্ম নেওয়া, ওরা তাই জন্মটা চায়।—এ হে হে হে! কি সর্বনাশটা ক'রে এসেছি! আকাম ক'রতে গিয়ে এমন আটকে পড়েছি! তখন ওরা এই জন্মটা চায়, এই জন্মটার মূল্য আগে ওরা বুঝতে পারে নি। ঐ জায়গাটায় গিয়ে ভাসছে, তখন পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার মূল্যটা বুঝতে পারছে। আমাদের এই জগৎটা ঠিক সিনেমার মতন। এই যে ভয়-ভীতি আতঙ্ক, এই আতঙ্কটা হ'চ্ছে ফাঁকা আতঙ্ক। যেমন সিনেমাতে দেখা যায় একটা বোতল ছুড়ে মারল, একটা দা ছুড়ে মারল, —আর একজনের কপালে সেই বোতল বা দা এসে লাগল, আর কেটে দরদর ক'রে রক্ত পড়ছে, আর তাই দেখে দর্শকরা ইস্—আহা-হা এই রকম ক'রছে। জানে এটা সিনেমা, তবু মনে ভাবে সত্যি বুঝি, নতুবা আ-হা-হা—ইস্ করে কেন? আমাদের এই জগৎটা ঠিক সিনেমা। এই ভয়-ভীতি-আতঙ্ক—এইগুলো ফাঁকা আতঙ্ক। এই আতঙ্কগুলো হচ্ছে আমাদের জন্ম নেবার জন্য। কিন্তু এই আতঙ্কের মধ্যে যে আট্‌কা পড়ল—সেই গেল। তোমরা কেন আট্‌কা পড়তে যাবে! চোখে দেখছ যে তোমরা কেউ থাকবে না। এটা তো বুঝতে পার—তোমরা কেউ থাকবে না। মড়া নিয়ে যাচ্ছে—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর ছোলাভাজা খাচ্ছে। নিজেও যে যাবে, তা কেউ ভাবে না। প্রাণ-মনে যদি ভাবে কেউ—আমিও যাব, তা হ'লেও অনেকটা কাজ হয়ে' যায়। একবার আমি ট্রেনে যাচ্ছি— আমার কামরায় এক ভদ্রলোক ছিলেন; তিনি টিকেট করেন নি। সারা রাত্রি যখনই দরজায় ধাক্কার শব্দ শোনেন, চমকে চমকে ওঠেন—এই বুঝি চেকার এল!—এক রাত্রির চিন্তায় ঐ ভদ্রলোকের চুল পেকে গিয়েছিল। বোঝ, এক রাত্রি তার কী চিন্তায় কেটেছে! এই রকম চিন্তা কি কেউ মৃত্যুর জন্য করে? মরবে জানে, তবু থুথু দিয়ে মৃত্যুটা মুছে ফেলতে চায়। একবার আমি এক গ্রামে গিয়েছিলাম—মিরকাডিম গ্রামে, —নাইন্‌টিন ফরটিওয়ান বা ফরটিটুতে। সেই গ্রামে মড়ক লেগে গেছে—এপিডেমিক যেখানে লাগে সেখানে পর্যন্ত ফর্ম হয়ে যায়—বোম ফাটলে যেমন ধোঁয়ার থেকে মূর্তি হয়ে যায়। গঠনমূলক কাজে যেই কোন চেহারা নিয়ে নেয়। সাংঘাতিক! সেই গ্রামে লালপেড়ে কাপড় পরে' কে যেন রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে।—আমি গিয়ে সব বুঝতে পারলাম যে কিসের জন্য এসেছি। আমার সঙ্গে আমার এক ভক্ত ছিল, নাম তার অমল। বললাম—অমল, তুই এই বালিটা নিয়ে সব জায়গাতে **ছিটিয়ে** দে—তবেই মড়ক থেমে যাবে। অমল তাই দিল। তারপর থেকেই মড়ক থেমে গেল। তারপর মিরকাডিমের অনেক লোক আমার কাছে দীক্ষা নিতে আরম্ভ করল।—ব্যাপারটা হয়েছে কি জান? বিরাট

শক্তির চেহারা যদি জন্ম নিয়ে আসতে পারে, বিদেহী চেহারা আসতে তো কোন অসুবিধা নেই! সবাই তো বিদেহী তোমরা! কোনটা চেহারা নিয়ে একেবারে ধপ্ করে নেমেছে। সবাই তো বিদেহী চেহারা নিয়েই এসেছে। এই শক্তির চেহারা কখন কি ভাবে, কোন্ ভাবে আসবে না-আসবে তা না দেখলে বোঝা যায় না। কত রকম অবস্থার সঙ্গে আমার চলতে হ'চ্ছে! যাই হোক, তোমরা কাজ কর, জপ কর। সব সময় সুরে থাকবে।

অনেকে বলে— সংসারে সব সময় বেসুরে থাকতে হয়, সুর টানবো কখন? দেখ, শরীরের হাড় ভেঙ্গে গেলে যদি জোড়া না লাগতো, তবে সাংঘাতিক অবস্থা হ'তো। ডাক্তার সেট করে দেয়, তারপর প্রকৃতির নিয়মে শরীর থেকে রস টেনে ভাঙ্গা হাড় অমনি জোড়া লেগে যায়। তাই সংসারে বেসুরেই থেকে সুর টানবে, সেই সুরই অনন্ত সুরের সঙ্গে জোড়া লেগে যাবে।

ধ্বনি হ'তেই জগৎ সৃষ্টি। তোমরা যে এসেছ—ধ্বনি হ'তেই এসেছ। দেখ, সব কিছু দুইয়ের মিলন ছাড়া হয় না। তোমাদের সুরের মাত্রা যখন বিরাটের সুরে মিলবে, তখনই স্ফুরণ হবে।

প্রশ্ন ঃ—এই যে মহাশূন্য, তার থেকে জীব-জগৎ সৃষ্টি—এই ফাঁকার ভিতর আঁকা কি ক'রে এল?

উত্তর ঃ—আমাদের এই যে বেদ-উপনিষদ যা কিছু, প্রয়োজনের সাথে সাথেই সব সৃষ্টি হয়, যখন জীবজগৎ সৃষ্টি হ'ল—জীবের গঠনমূলক—যাতে জীব সুন্দর ভাবে গ'ড়তে পারে, তার জন্য প্রত্যেকটি এইভাবে সৃষ্টি হ'য়ে যাচ্ছে। বুদ্ধির যে স্ফুরণ, বুদ্ধি যে আছে, কিভাবে আছে? এই শূন্যময় জগতে যতটা ভরপুর আছে, কি আছে তা দেখা যায়না, এই ভরপুর থেকে যে আপ্‌না-আপনি দেহের ভিতরে সঞ্চালিত হ'য়েছে এবং সেই সঞ্চালিত বস্তু যে প্রস্ফুটিত হচ্ছে এবং প্রয়োজনের সাথে আপ্‌না-আপ্‌নি যে জেগে উঠছে—এই জেগে ওঠাটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর গর্ভে যখন আগুনের কুণ্ড ছিল, আগুনের গোলা ছিল—জ্ব'লত দাউ-দাউ করে, তখন জীব-জগৎ ছিলনা। জীব-জগৎ কী ক'রে এল? একটা আগুনের গোলার মধ্যে এই গাছ-পালা-জল-পাহাড়-পর্বত কি করে আসলো? আসার কারণটা কি? সেটা হচ্ছে, সমস্ত বিশ্বের পাতায়, গ্রন্থ যেমন—তার পাতায় সবলেখা থাকে, সেই পাতা যখন উল্টিয়ে যাচ্ছ আর পাঠ করে' যাচ্ছ, তখন দেখছ এই অনন্তময় জগৎ চিরদিনই ছিল—এটার আরম্ভও নেই, শেষও নেই। যেটার আরম্ভ আছে, সেটার আবার আর একটা থাকে, সেখানে একটা ব'লতে গেলে আর একটার প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় মনে রেখো। এটার সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি। যখনই এক থাকলে আর একের প্রশ্ন আছে, সেখানে এ-প্রশ্ন চিরদিনই থাকবে যে, তিনি যখন আছেন, তার পরে আর একজন আছে।—এইভাবে সমাধান আজও হয়নি, কারণ এটা সমাধানের কথা নয়। একটা বস্তু থাকলে আর একটা বস্তু আসবে—এটাই নিয়ম। কিন্তু এইভাবে বিরাটকে বর্ণনা করা চলে না। বিরাটের বর্ণনা হ'চ্ছে—সেটা চিরকালই ছিল, এখনও আছে। এই শূন্যের আরম্ভও নেই, শেষও নেই। এমন একটি স্তর এটা, এমন

একটি অবস্থা যে কোনদিনই এটা আরম্ভ হয়নি। এই যে ফাঁকা কথাটা—এটা কি কেউ তৈরী করেছে? ফাঁকাটা কেউ তৈরী ক'রতে পারে না,—ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? ফাঁকা ফাঁকা যে জায়গাটা—এটা কি কেউ সৃষ্টি ক'রেছে? এটা কেউ সৃষ্টি করেনি, তাহ'লে ফাঁকার মধ্যে যা কিছু ছিল, সেটাও কেউ সৃষ্টি করেনি। সৃষ্টি করার জন্য এই ফাঁকা তৈরী হয়নি,—ফাঁকা চিরদিনই ফাঁকা ছিল। মনে কর, কোন জীবজগৎ নেই, কোন গ্রহ-উপগ্রহ নেই, সূর্য নেই, আমরা কেউ নেই, কোন কিছুই নেই। তখন তবে কি থাকবে? ফাঁকা থাকবে।—'কিছুই নেই' এইভাবে ফাঁকা র'য়েছে। 'কিছুই নেই'কে তো কেউ সৃষ্টি ক'রতে পারে না।' 'কিছু নাই'টা কে সৃষ্টি ক'রবে? তবু দেখা যায়, কিছু নাই-এর মধ্যেই, ফাঁকার মধ্যেই সব অবস্থিত। সমস্ত জগৎটাই ফাঁকার মধ্যে অবস্থিত। কিছুই -না যেখানে, সেই কিছুই-নাকে কেউ যদি সৃষ্টি না করে, 'কিছুই নাই' এই ফাঁকা কথাটা যেই ফাঁকার উপরে আমরা আছি, গ্রহগুলো আছে, সেই ফাঁকার নিশ্চয়ই এমন একটি অস্তিত্ব আছে, যাকে কারও সৃষ্টি ক'রবার প্রয়োজন হয়নি। চিরকালই এই ফাঁকা ছিল, এই ফাঁকার মধ্যের যাবতীয় যা কিছু তা সেইভাবেই চিরকাল ছিল। কথাটা বুঝতে পেরেছ তোমরা? এটা মস্তবড় কথা। একথার আজও সমাধান হয়নি,—বহু গ্রন্থ সেখানে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে র'য়েছে। ভগবানকে সৃষ্টি কে কর'ল—এইভাবে মীমাংসা আসে না। জগতের মধ্যে প্রশ্ন থাকবে না।—কেন প্রেশ্ন থাকবে? বর্ণনার মধ্যে যদি প্রশ্ন থাকে, তবে মীমাংসাও থাকবে। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসাও থাকবে। মীমাংসা যদি না থাকে, তবে বুঝা গেল—বর্ণনায় আসেনি এখনো। তুমি যদি বল—ভগবান কে সৃষ্টি করেছে, তবে যে সৃষ্টি ক'রেছে, তাকে কে সৃষ্টি করল? মীমাংসা থাকতে হ'বে, মীমাংসা ছাড়া থাকতে পারে না কখনও। যখনই সৃষ্টির মধ্যে প'ড়বে, তখনই তোমার ব'লতে হবে—আর একটা আছে। ব'লছে—একটা বিষয়বস্তু দাঁড় করাতে গেলেই আর একটা বিষয়বস্তুকে দাঁড় করাতে হবে। এইভাবে চিরকালই দাঁড় করিয়ে যেতে হবে। দাঁড় করাতে করাতে এক জায়গায় শেষ হবে; বলছে যে শেষ যার আছে, তাকে বিরাট আখ্যা দেওয়া যায় না। শেষ যেটা, সেটা বিরাট হতে পারে না। তা হ'লে শেষ কোথায়? ব'লছে যে, 'শেষ' কথাটা মুছে ফেলতে হবে। আমরা কার মধ্যে অবস্থান করে' আছি? আমরা কোন্ কুলে আছি? আমরা যাঁর কুলে র'য়েছি, তাঁর কুলটাই আমাদের বড় কুল। সুতরাং আমরা রয়েছি এমন একটি বিষয়বস্তুর মধ্যে, যাকে কেউ কোনদিন সৃষ্টি করেনি। সৃষ্টি করার মধ্যে সে নেই। সৃষ্টির বাইরে—সবটার বাইরে সে র'য়েছে। যদি গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবীর কিছুই না থাকে, তা'হলে কি আছে? এই যে মহাশূন্য, ফাঁকা জায়গা, এই ফাঁকা চিরকালই থাকবে। এই ফাঁকা কথাটা কেউ তো আঁকেনি, ফাঁকা কখনও সৃষ্টি হ'তে পারে না; সৃষ্টি ক'রতে গেলেই বস্তু আসবে। ফাঁকাকে কে সৃষ্টি ক'রবে? ফাঁকা হ'ল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে। তাকে কেউ সৃষ্টি করতে পারেনা। সৃষ্টি ক'রতে গেলেই একজন থাকবে। তা'হলে মিলতি আসবে কোথায়? যাকে কেউ সৃষ্টি করেনি, সেই বিষয়বস্তুর মধ্যে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। কি সম্পর্ক র'য়েছে?—তার মধ্যে আমরা অবস্থিত, তার মধ্যে আমরা আশ্রয় নিয়ে আছি, তাকে আমরা পূরণ ক'রবার চেষ্টা ক'রছি।

যাকে আশ্রয় করে আমরা রয়েছি, তার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ র'য়েছে, তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক র'য়েছে, তার অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগাযোগ র'য়েছে এবং এই যোগাযোগটা চিরকালই ছিল। সেই ফাঁকার মধ্যে কি আঁকা ছিল? এই যে স্তরে স্তরে গোল্লার মতন সব বা'র হ'চ্ছে; এক একটা গোল্লা কত বড়! পৃথিবীর যে মাটিগুলো—কত মাটি এই পৃথিবীতে জমাট বেঁধে রয়েছে, চিন্তা করে দেখ। কেউ মাটি ফেলে এই রকম গোল্লা ক'রতে পারে কি? এই মাটি কি করে সঞ্চয় হতে পারে? কারও পক্ষে কি সম্ভব এই মাটি জমা করা? একমাত্র ফাঁকার মধ্যে যে আঁকাগুলো র'য়েছে তার স্তর থেকেই সম্ভব। নইলে, সৃষ্টির মধ্যে সম্ভব নয়। আমি সৃষ্টি ক'রলাম,—এটা অসম্ভব কথা। সৃষ্টি ক'রতে গেলেই বস্তু এসে দাঁড়িয়ে যাবে—কে সৃষ্টি ক'রল? কোথা থেকে সৃষ্টি কর'লো—তখনই বস্তু খুঁজতে হবে। বস্তু খুঁজতে গেলেই বর্ণনা চ'লবে না— ভাষা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ফাঁকাতে এমন বস্তু র'য়েছে, যার থেকে জমাট হয়ে যেমন রেফ্রিজারেটারের মধ্যে ঠাণ্ডা লাগলে বরফ হ'য়ে যায়, জমাট বেঁধে যায়,—জলের সংস্পর্শ নেই, অথচ কতগুলি তারের স্পর্শে বরফের চাকা হ'য়ে যায়। বাতাস হ'ল একটা সামান্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই পৃথিবী যে জমাট হ'য়েছে, সেখানে তো বাতাসের প্রশ্ন ছিল না! এই যে ফাঁকা, এই ফাঁকার থেকে সুন্দরভাবে জমাট হ'তে হ'তে অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ হয়েছে। এই যে হওয়াটা, এটা তার পক্ষেই সম্ভব। অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ কথাটা কখন আসতে পারে? একমাত্র ফাঁকার বেলাতেই আসতে পারে, যে ফাঁকাকে আশ্রয় করে জগতের পর জগৎ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। এই যে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে—এটাই দেবতা। দেবতা কেন বলছে?—না, ফাঁকার মধ্যে এমন একটা ইচ্ছাশক্তি বিরাজ ক'রছে যা সচেতন, ফাঁকাটা এমন সচেতন যে, তাকে বর্ণনা করে' পাওয়া যায় না, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে এত বড় বিরাট যে, 'বিরাট' আখ্যা দিলেও তাকে ছোট করা হয়, বিরাট বললেও তাকে সীমার মধ্যে ফেলা হয়। যার কোন সীমা নেই, তার হাত পা কিছুই নেই,—কোন রূপে নেই, কিছুতে নেই। কিন্তু সমস্ত রূপ অনন্তময় রূপের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ হচ্ছে, জগতের মধ্য দিয়ে তার নিজের রূপকে প্রকাশ ক'রছে। এই যে অগণিত রূপ, কত রূপ, সবের মধ্যেই শূন্যের সুর আছে ঠিকই, কিন্তু কেউ যদি সৃষ্টি ক'রছে বলা হয়, তা হ'লে সীমার মধ্যে এসে যাবে। তার কোন বর্ণনাই নেই। ফাঁকাটাই তার রূপ। সাগরের বালুকণা গোণা সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু পৃথিবী গোণা সম্ভব নয়। আজও হাঁসের ডিমের মতন, স্রোতের মতন পৃথিবী বা'র হচ্ছে। এই ফাঁকা সম্পূর্ণ সচেতন—সবটার মধ্যে সে আছে। তার অণিমা, গরিমা, লঘিমা, মহিমা—সপ্তসুরের ঝঙ্কার মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, সহস্রার—সপ্তসুরের যে ধ্বনি আমরা পেয়ে যাচ্ছি, সেই দেবতাকে আমরা পুতুলের ভিতর দিয়ে ধরছি। কিন্তু এই ধরার মধ্যেই তিনি ধরা দিয়ে আছেন; তবু বলছি—কোথায়, কোথায়? কোন রহস্যের মধ্যে আছে? সৃষ্টির রহস্য, জগৎ-রহস্য—সবটার মধ্যে তাকে খুঁজে পাচ্ছি, আবার মৃগনাভির মত তোমারই নাভিতে—মণিপুরে সে ছটফট করছে, আর তুমি ব'লছ—কোথায়, কোথায় সেই সুগন্ধ? চারিদিক গন্ধে মো-মো ক'রছে, দেবতা

তোমারই মণিকোটরে, আর তুমি বলছ—কোথায়, কোথায়? এমনি করে তাকে হারিয়ে ফেলছ। কিন্তু তিনি যে তোমারই মধ্যে, চোখে দেখেও খুঁজে পাচ্ছ না, কানে শুনেও বুঝতে পারছ না। মৃগনাভির মতন সমস্ত যন্ত্রগুলো—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন তোমার মধ্যে বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও তুমি তাকে খুঁজে পাচ্ছ না। এই সাধারণ যন্ত্রের মধ্য দিয়েই তাকে টেনে আনতে পার। এই সাধারণ দেহ-যন্ত্রের মধ্যেই সমস্ত কিছু তোমাতে নিয়োজিত করে' রেখেছে। তবুও তুমি কি ক'রছ? এই অনুভূতিতে খুঁজতে যাচ্ছ। কিন্তু এটা তো আলাদা নয়, এই বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রে তার স্বরূপ জানতে পারবে কি ভাবে? না—গোলাপ ফুল ফুটছে.—ফুলটাই যখন স্বাভাবিক, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফুটছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার স্বরূপ পাওয়া যাচ্ছে না। গোলাপের গাছে যখন পাতা হয়, তখন গোলাপ ফুলকে চেন বলেই তার পাতাকে চিনতে পারছ। তার গাছকে চিনতে পারছ। কিন্তু গোলাপ যখন ফুটল, তখন তুমি বুঝলে—গোলাপের কি সুন্দর সুগন্ধ, গোলাপ কি সুন্দর দেখতে! সেই-রকম আমাদের মধ্যে যখন সুর ফোটে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, ত্বক—ত্বকের স্পর্শের অনুভূতি এইভাবে যখন blossom হয়,—ফোটে যখন গোলাপের মতন, বিকশিত হয়।—এই বিকশিত হওয়াটাই প্রস্ফু টিত হওয়া। তারই সুগন্ধ তখন কি ক'রল? সমস্ত বাহ্যিক যা-যা আছে, তুমি এই সবের স্বাদ জানতে পারলে, এই ফুলটার স্বাদ জানতে পারলে। এই জানাজানির মাঝে তোমাকে এই যে ফুটিয়ে দিল, এই ফুটিয়ে দেওয়ার যন্ত্রটি হু-হু করে' যাচ্ছে।এই যে তুমি এখান থেকে যতটুকুন গ্রহণ ক'রছ, এই গ্রহণের বস্তুগুলো কার? তোমাকে ধরা দিয়েছে এই গ্রহণের মধ্য দিয়েই, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তোমাকে বিরাজ করার জন্যই এই ইন্দ্রিয়াদির মধ্য দিয়ে তোমাকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছে। তাই তোমার কোন ইন্দ্রিয়ই ত্যাজ্য নয়;—এগুলো ভোগের নয়, এগুলো কামের নয়, এগুলো ক্রোধের নয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা বলে বর্ণনা করে, এগুলোকে ফেলে দিয়ে, তাচ্ছিল্যভরে রেখে দিয়ে, এর থেকে ঊর্ধ্বচিন্তা ক'রে কিছু পাবার আশায় সে বসে থাকে। সেখানে যদি না মেলে কিছু, তখন মন এদিক ওদিক—চারদিক ঘুরে বেড়ায়। তার জন্যই বলে—মন বিক্ষিপ্ত, মন চঞ্চল, মন আমাদের বসে না। কেন মন বসে না? এটা ব'সতে পারে না। এই যে ফুলটা ফুটেছে—যদি বল এটা আরও ফুটবে, দেখা যাবে এর বেশী ফোটাতে গেলে পাপড়ি পড়ে যাবে। আর কি ফুটবে? পাপড়ি খুলে যাবে! সেটাতে ফোটা হ'ল না, ঝরে পড়া হল। তাই তুমি যে সব ইন্দ্রিয় ত্যাগ ক'রে চক্ষু বুজে, লেংটি প'রে, ঘর বন্ধ ক'রে ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে আটকে রাখতে চাও, সেটা তো রাখার অঙ্গ নয়। তুমি মুক্ত জায়গায় যাও, মুক্ত চিন্তা কর। এটা নিষ্ঠুর স্থান নয়। তুমি যে আজ এই অবস্থায় এলে, এখানে প্রকৃতির সঙ্গে যদি সংস্পর্শে না আস, তবে প্রসারতা লাভ হয় না। ঘরে ব'সে সাধনা—গন্ডীর মধ্যে সাধনা। তোমার সাধনা, তোমার সুর হবে প্রকৃতির সঙ্গে, গ্রহ উপগ্রহের সঙ্গে; সকলের সঙ্গমে, স্পর্শে, ভোগের মাধ্যমে চরম সুখ ও উপলব্ধি, চরম যোগাযোগের সুরধ্বনি। জীবনে চলার পথে থেকে বনে, পর্বতে, সর্ব জায়গায় মনকে ছেড়ে দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত কর। কেন যুক্ত ক'রতে বলছে? তুমি দর্শন- ইন্দ্রিয়, শ্রবণ-ইন্দ্রিয়—সকল ইন্দ্রিয়-

ভোগকে ত্যাজ্য ক'রেছ, সেই ভোগই হ'চ্ছে চরম সুরের ধ্বনি, সেটাই সিদ্ধ অবস্থা। কাম, ক্রোধ, লোভ—পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—পঞ্চভূতের অনুভূতির সঙ্গে যাতে মিশতে পারে, তারই জন্য এইগুলির ব্যবস্থা। মিশবে তুমি—একথা বোঝ, তবু বুঝ পাকা বুঝ নয়—শিশুর লেখা পাকা নয়। মৃত্যুর অনুশোচনা এখনও হয়নি; তুমি যখন পঞ্চভূতে মিশবে, এটা তখন পাকা হবে। এই বাহ্যরূপ যতক্ষণ না স্বরূপে আসবে, ততক্ষণ পাকা হবে না। দেবতা কি করছেন? এই পঞ্চভূতে বারবার মিশবার জন্য দ্বার সৃষ্টি ক'রলেন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য, মিশবার জন্য। ধ্যান-ধারণা ক'রে তোমার নতুন কিছু করবার নেই, স্রষ্টাই তোমাকে করিয়ে নিচ্ছেন। তোমার সহজ জীবনে, তোমার সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে অতি দুর্লভ জিনিস তুমি পাবে। তার জন্যই সৃষ্টি। এখন, ইচ্ছা ক'রে যদি অভাব সৃষ্টি কর, তা হ'লে বলার কিছু নেই। স্বাধীন স্ফুরণ থেকে সৃষ্টি কিনা, তাই সকলের মধ্যে ঐ স্বাধীন ভাব আছে। লর্ড ফ্যামিলিতে যারা আছে তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। আমরা লর্ড ফ্যামিলি থেকে এসেছি, আমরা বিরাটের সৃষ্টি। আমরা স্বাধীনতার ভিতর থেকে এসেছি, তাই আমরা ইচ্ছা ক'রলে নিজেকে বিনাশ ক'রতে পারি, নিজেকে হত্যা ক'রতে পারি, আবার নিজেকে উঠিয়ে নিতে পারি,—এই জীবনেই অতি দুর্লভ জিনিষ পেতে পারি। এই স্বাধীনতা স্রষ্টা আমাদের দিয়ে দিয়েছেন, তাই আমরা অতি সহজভাবে সেই পথের পথিক হ'য়ে যে কোন কাজ করতে পারি। শাস্ত্রকে নানারকম বিকৃত ক'রে বিক্ষিপ্ত করেছে। তোমাদের কোন পাপ-পুণ্যের বালাই নেই।.তোমরা বিরাট অবস্থায় এগিয়ে যাচ্ছ। জগতের সৃষ্টির মহিমার থেকে যারা প্রকাশিত বিকশিত—তারা ভাগ্যবান। তোমরা স্ফুরণের মধ্যে আছ, বিরাট চেতনা থেকে তোমরা বা'র হয়েছ,—সব যেখানে জাগান, সেখানে তোমরা কত বড় ভাগ্যবান! আর তোমরা কিনা নিজেকে অভাগা ব'লে মনে কর! পঞ্চাশ-ষাট বছরের খেলা এখানে,—তোমরা অভাগা নও। এক পৃথিবীর শিব আর এক পৃথিবীর শিবকে ব'লছে—কি সুন্দর!—আমরা বিরাট ব্রহ্মকে বুঝতে পারছি, এই বিরাট আনন্দসাগরে স্নান করছি, এই সাগরে একবার ডুবছি আবার ভাসছি, এই যে দোল খাচ্ছি—রাধা-কৃষ্ণ যে দোলনায় দোলে,—এই দোলনাই সেই দোলনা। মুক্ত হ'য়ে শিব হ'য়ে গেছেন তাঁরা। তবু সেই মুক্ত শিব ব'লছেন,—আবার যেন জীবকুলে জন্মগ্রহণ করি। —মুক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু আবার জন্ম নিতে চায়, বলছে—কীট হ'য়ে জন্ম নিতেও আপত্তি নেই। আর এক শিব ব'লছে—শিশুর কোন অপরাধ নেই; একটা শিশু যদি কাউকে মেরেও ফেলে, বিচারক বলবেন—শিশুর কোন অপরাধ নেই। তেমনি মহলোক থেকে ব'লছে—জীবলোকের কোন অপরাধ নেই। নো ম্যান্‌স্ ল্যান্ড (যে জায়গায় কোন লোকের বাস নেই) এমনি সৃষ্টি,—সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আমরা কর্মী—ফ্যাক্টরীর কর্মী। আমরা শিব হবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি। আর তিনি মহলোক থেকে জীবলোকে জন্মগ্রহণ করার ইচ্ছা করেন। তিনি সকলের সঙ্গে মিশে অনুভব, উপলব্ধির জন্য এবং আরও একটু অর্জন করার জন্য জীবলোকে জন্মগ্রহণ ক'রতে চান। আর আমরা কি ক'রছি? আমরা ঝগড়া-বিবাদ গালাগালি ক'রছি। শিব ব'লছেন—

আমি জীবলোকে জন্মাতে চাই, আর তোমরা গালাগালি মারামারি নিয়ে আছ!—তোমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে র'য়েছ, সেই জায়গায় শিব আসতে চান,—তোমাদের উপর শিবের সেটা আশীর্বাদ। তোমাদের চিন্তাধারা শিবময় হয়ে র'য়েছে,—তোমরা কত বড় ভাগ্যবান! সৃষ্টি-জগতে এমনি আসে না। ব'লছে—তোমরা এস। ফাঁকা অবস্থায় থাকতে পারে না— ভরবার জন্য যাচ্ছে,—আবার বা'র হচ্ছে। কিসের জন্য বা'র হচ্ছে? এই যে রূপ নিয়ে নিয়ে বা'র হচ্ছে—কিসের জন্য?—শিব হবার জন্য। তোমরা শিব হয়ে যাও, তোমরা বিষ্ণু হয়ে যাও। ব'লছে—একজন বিষ্ণু যদি জন্মগ্রহণ ক'রতে পারেন, একজন রাম যদি জন্মগ্রহণ ক'রতে পারেন, একজন কৃষ্ণ যদি জন্মগ্রহণ ক'রতে পারেন,—সেই কৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু সবাই কিন্তু আমাদেরই ঘরের ছেলে,—তবে কেউ এখানে প'ড়ে থাকতে পারে না। তোমরাও তাই কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব—তোমাদের মধ্যে শিবের বীজ আছে, তোমাদের মধ্যে রামের বীজ আছে। ব'লবে—আমাদের কবে ফুটবে? যেদিন জল পাবে, সেদিন ফুটবে। তোমরা ঘরের মধ্যে, কৌটার মধ্যে বীজ রেখে দিয়েছ; কিন্তু যেখানেই রাখ, এই জিনিস নষ্ট হয় না,—ফুটবেই। তোমরা শিব হ'য়ে চ'লে যাও। যে শিবের, রামের, কৃষ্ণের ধ্যান ক'রছ—তাঁরা সাধারণ থেকেই শিব, রাম, কৃষ্ণ হয়েছেন। তাঁদেরও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছিল। ঘরের ছেলে তাঁরা। দিন চ'লে যাচ্ছে। কত অভাব অভিযোগ! বাবা চ'লে গেছেন, ছেলে যাচ্ছে, মেয়ে যাচ্ছে—হা-হুতাশ্ ক'রছে—আবার ভুলে যাচ্ছে। এই ভুল ভুল নয়,—ফুল হ'য়ে ফুটবার জন্য। যেটা যায়— চ'লে যায়; পিছনের দিকে তাকাবে না।—সমস্ত আবার পাবে। তখন অবাক হয়ে দেখবে—এত সন্তান আমার! ঊর্দ্ধ দিকে তাকাবে। আঘাত প্রতিঘাত কত রকম আসে জীবনে,—আবার ভুলে যায়। ফুল হয়ে ফুটবার জন্য এই ভুল;—ভুলই ফুল হয়ে ফোটে। দেখ, বড় দুঃখ!—দিন চলে যাচ্ছে। ত্রিপুরায় যখন ছিলাম—শিশুকাল থেকে কত অবস্থার ভিতর দিয়ে চ'লছি। আমি ক্ষেতি হয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছি। তোমরা কেবল ছড়িয়ে দাও, ঠিক হয়ে যাবে। কি হ'ল— দেখতে গেলেই ঠকবে। কি এল; কি থাকল, কি গেল—তার জন্য তোমাদের ভাববার কিছু নেই। তোমার কি না-হয়েছে? কোন্টা ঠেকাতে পেরেছ? তোমার কি রোগ হ'ল না? তোমার কি বার্ধক্য এল না? কোন্টা তুমি আটকাতে পেরেছ? কাজেই তোমরা বীজ ছড়িয়ে দাও, ঠিক হয়ে যাবে। যারা বলে—এভাবে হবে না, ও ভাবে হবে না, এ ছাড়তে হবে, ও ছাড়তে হবে, —ওগুলো হ'ল বাসি কথা। আমাদের কথা হ'ল— য'ন্ত্রে যেমনি আসে আসুক,—কাম-ক্রোধ মায়া-মোহ এগুলো যন্ত্রের জিনিস—এর জন্য ভাববে না, শুধু গুরু যে-ভাবে তৈরী করেন, গতিদাতা যা করেন,—তাঁর উপরেই নির্ভর করে থাক। তোমরা কি ক'রবে? তোমরা বগি হয়ে ইঞ্জিনকে ধর—ইঞ্জিনকে ধরে রাখ। ইঞ্জিন যদি ৮০ মাইল স্পীডে যায়, বগিও ইঞ্জিনের সঙ্গে ৮০ মাইল স্পিডে যাবে। আর তোমাদের দেখবার কিছু দরকার নেই। এই পৃথিবীটা যে ঘুরছে, তা কি তোমরা দেখ, না টের পাও? টের পেলে কি রক্ষা ছিল? পৃথিবীটা যে ঘোরে তা তোমার দেখার ঠেকাটা কি?— 'আমার দিন তো ফুরিয়ে এল',— 'দিন এসে সামনে দাঁড়িয়ে আছে,' 'এত বয়স হয়ে গেল, আমার তো কিছুই

হ'ল না'— এসব কথার পিছনে ঘুরবার তোমাদের ঠেকাটা কি? এসব কথা হ'ল ঘুরে মরার মত। কথায় আছে না—ঘুরে ঘুরে মরছি! তুমি যে ঘুরবে, —নিজে ঘুরে বিপদ আনার ঠেকাটা কি? ছেলে-পিলে-সংসার—এই ঘুরানির ঠেকাতেই অস্থির, আরও ঘুরে বিপদ আনার ঠেকা কি? দেবতা তো তোমাদের কোন কিছু অপূরণ রাখেন নি। যেখানে পায়ের তলায় সাগর, মাথার উপরে সাগর, সেখানে কিছু অপূরণ থাকতে পারে না। কাজেই 'আমার কি হবে' 'দিন চ'লে যাচ্ছে'—এসব কথা বাসি লুচির কথা। তোমাদের কথা হবে— 'আমরা ভরপুর হয়ে আছি, ভরপুর থেকে আমরা এসেছি, আমাদের হবেই।' যাদের পায়ের তলায় সাগর, মাথার উপরে সাগর—তারা হচ্ছে শিব। এই যে সাগর—এই সাগরের জল কি কখনও শেষ হয়েছে? এই টালার ট্যাঙ্ক দু'শ বছর ধ'রে ভ'রছে,—জল কি আজও শেষ হ'য়েছে? শূন্যে যে সাগর আছে তাতে ডুবে থেকেও আমরা অসুবিধায় পড়ছি না—সে সাগর বাতাসের আড়ালে আছে। মেঘ যে ঘুরছে, তাতে আর এক সাগর আছে। আবার মাটি খুঁড়লেই ঠাণ্ডা জল—আর এক সাগর। আবার সামনে সাগর। দেখ—সামনে যে সাগর, তার জল খেতে পার না; অত বড় সাগর—কিন্তু তেষ্টা মেটে না। আমরাও সেই বস্তু—আমাদের জীবনের কোন তেষ্টাই মেটে না, পায়ের তলায় যে সাগর মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায়, সেই সাগরের জল খেয়ে আমরা বাঁচি। এমন যাঁর সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিলোক কি ক'রছেন? সূর্য কি করছেন? সূর্য ব'লছেন—আমি তোমাদের কেবল দিয়েছি; আমি মহাশূন্যে এত বড় সাগরকে টেনে এনেছি—কিভাবে এনেছি, তা তোমরা বুঝতে পারনি! বোঝ কখন? যখন জল হয়ে ঝ'রে পড়ে তখন। আমি সব জীবলোককে টেনে নিচ্ছি, আমি উদয় অস্ত তোমাদের কোল দিচ্ছি,—উদয়-অস্তের মাঝ দিয়ে আমি তোমাদের টেনে রেখেছি। তোমাদের এখানকার কোন বিষয়বস্তুতে তেষ্টা মিটবে না। তোমরা আমার বিষয়বস্তু দিয়ে গড়া—আমারই সন্তান তোমরা। তোমাদের শিরায় আমারই তেজ, তোমাদের নাড়িতে নড়িতে আমারই কথা বলে, তবু তোমরা বল—আমাদের কিছু হবে না!—তোমাদের সব হবে, তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। তোমরা নাদ-ধ্বনির মধ্যে ডুবে থাক, আমি তোমাদের আপন ক'রে আমার কাছে টেনে নিয়ে যাব। তোমরা যে আমারই সন্তান, তোমরা গতিদাতার গতিতে আছ। উর্দ্ধমুখী হয়ে থেকো।—মহাপ্রভু উর্দ্ধমুখী হয়ে দু'হাত তুলে দিয়েছিলেন!—গুরুমুখী হয়ে থেকো—তাহলেই হবে।

প্রশ্ন ঃ— ব'লছেন অগণিত পৃথিবী আছে। এখান থেকে যারা যায়, তারা কি সেইসব পৃথিবীতে যায়? আপনি বলছেন— মাত্রা মতন সবার জন্ম হয়। এই মাত্রাটা কি ক'রে হয়?

উত্তর ঃ—গ্রহ সম্বন্ধে যে সেদিন আলাপ করেছি—প্রত্যেকটি পৃথিবী এক একটি গ্রহ এবং জীবগুলিও এক একটি গ্রহ। পৃথিবী থেকে সবার যখন সৃষ্টি হচ্ছে, সুতরাং গ্রহের থেকে গ্রহেরই সৃষ্টি হয়, তার প্রভাব সব সময় তাদের উপর থাকে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে এইগুলো খুব বেশী আছে; তারা চর্চা ক'রে এর ভিতরকার কথা অনেক জানতে পেরেছে। এটা জানার

পক্ষে কিছু অসুবিধা নেই; যখন যে জন্মগ্রহণ করে, তখন কোন গ্রহ এই পৃথিবীর সংলগ্ন আছে—পৃথিবীর কাছে অনেক গ্রহ থাকে, অজস্র অগণিত গ্রহ রয়েছে, পৃথিবীতে ঘুরছে,—অনেক গ্রহের কাছ দিয়ে যাচ্ছে—যে গ্রহের সাথে এর দেখাশুনা হয়, যার শক্তি এই পৃথিবীর উপর পড়ে, মানে সমস্ত জীবের উপর সেই শক্তি গিয়ে পড়ে, সেইসময় যাদের জন্ম হয়, সেই গ্রহের শক্তি তাদের মধ্যে থেকে যায়। এইভাবে শুধু একটি গ্রহেরই প্রভাব সকলের ভিতরে থাকে না, এমন বহু গ্রহ-উপগ্রহ আছে, যাদের প্রভাব বা শক্তি আমাদের মধ্যে রয়েছে। এমন হচ্ছে যে—একটি গ্রহের প্রভাব রয়েছে একজনের ওপর, আর একটি গ্রহের প্রভাব রয়েছে আরেক জনের ওপর—দুইটিরই মধ্যে দেখা যায় একত্র হ'লে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেছে। আবার আমার যে গ্রহে জন্ম বা তোমার যে গ্রহে জন্ম, সেই গ্রহের সাথে, সেই গ্রহ যা ভালবাসে, যে রকম জিনিস ভালবাসে, সেই রকম ব্যক্তি যদি উপস্থিত হয়—মানে সেই গ্রহের মতন যদি সেই ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তবে তাদের সাথে খুব মিল হয়। স্বাভাবিক সেটা। আবার বিপরীত হলে বুঝতেই পারছ, কি হয়। এইগুলো প্রত্যেকটি অঙ্কের উপরে রয়েছে,—একেবারে কড়া-ক্রান্তি-মিনিট-সেকেন্ড ধ'রে ধ'রে এইগুলো রয়ে গেছে। আবার এমন গ্রহ আছে যে, সবার কাছেই তাকে ভাল লেগে যায়, তার আর তিক্ততা থাকে না। যেমন বাতাস, জল, ফুল, ফল অনেক কিছু আছে, সেটা সকলের কাছেই ভাল লাগে। এমন অনেক পৃথিবী আছে যাদের বিশুদ্ধ, অনাহত বা আজ্ঞাচক্র—এটাই প্রথম অর্থাৎ ওইটা ফুটেই ওরা জন্মগ্রহণ ক'রছে। কত বড় কথা! একটা পৃথিবীতে যদি আজ্ঞাচক্র ফুটেই জন্মগ্রহণ করে, সে পৃথিবীর লোকগুলো কি রকম, জীবজন্তুগুলো কি রকম! এই রকম অনেক পৃথিবী আছে, যে সহস্রার ফুটেই জন্মগ্রহণ করেছে। সেই পৃথিবীটাই বা কিরকম! সেই পৃথিবী যদি ঘুরতে ঘুরতে আমাদের এই পৃথিবীর কাছে এসে পড়ে, সেই সময় যাদের জন্ম হবে তাদের এইখানে ফাটুক না-ফাটুক, অল্পেতেই দেখবে সুরজ্ঞান তারা অনেক কিছু পেয়ে যাবে, অনেকটা ওর মতন। এই রকম আরও অনেক পৃথিবী আছে, যাদের আটটা শক্তি, দশটা শক্তি জেগে আছে, বিরাট ক্ষমতা নিয়ে তারা রয়েছে। এইগুলি রয়েছে শুধু এইজন্য, ওগুলো সবই বাস্তবের রূপ। বাস্তব ক্ষেত্রে যতগুলো পৃথিবী আছে, আগেও ব'লেছি, তা' গুনে শেষ করা যায় না; বালুকণা গোণা সম্ভব, তবু পৃথিবী গোণা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি পৃথিবীর মধ্যে এমন সৃষ্টির বিষয়বস্তু রয়েছে যে, সবটাই যদি বিচার করা যায়, দেখা যাবে, কোন কোন পৃথিবীতে তারা ইচ্ছাধীন আসে, ইচ্ছাধীন জন্ম হয়, ইচ্ছাধীন চ'লে যায়; ইচ্ছাধীন সবকিছু। তারাও ব'লছে—আমরা কাজ ক'রছি। আরেক পৃথিবী আছে, যেখানে কেউ নেই, শুধু খালি প'ড়ে আছে—একেবারে খালি। সেখানে কারা যায়? সেখানে সমস্ত পৃথিবী থেকে যে সারগুলো, সার অংশগুলো—তাই সেখানে যায়। সেখানে আর এমনি জন্ম হয় না। যারা সেই পৃথিবীর স্তরে যায়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হয়ে যায়। এই ভাবে জন্ম হয় না—এই পৃথিবীর মত জন্ম হয় না—সেটাও বাস্তব, সেখানেও হাঁটা-চলা, স্বামী-স্ত্রী সব আছে। এখানে সৃষ্টির যে ক্ষেত্রগুলি আছে, ঐটার

atmosphere টাই ক্ষেত্র—সমস্ত পৃথিবীময় সেইটা। যখনই এখান থেকে কোন বীজ ঐখানে গিয়ে পড়ে, সাথে সাথে এইখানে যেটা হয়, সেটা সেখানে বায়ুর থেকেই হোক, আকাশ থেকেই হোক, সেখানকার আবহাওয়াটাই এই রকম সুন্দর, তার ক্ষেত্রটা এমন সুন্দর যে, সাথে সাথে সেটা হয়ে যায়। যেটা হ'ল, এখানকার মতন এই রকম দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ সেখানে নেই। সেটা ঠিক সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছার উপরে নির্ভর ক'রছে। সেখানেও গিয়ে দেখবে, যাঁরা শিব-কৃষ্ণ— বড় বড় যাঁরা,— তাঁরা আছেন। আরও দেখবে, সেখানে গিয়ে সবাই হাঁটাহাঁটি ক'রছেন স্থূল শরীরে। এই জগতে সূক্ষ্ম বস্তুও স্থূলই যখন, এই জগতে এমনি কোন কিছু মিশে থাকে না। মিশে কেউ চলে না, এটা মনে ক'রবে না, কারণ বিষয়বস্তু মিশে থাকলেও তার একটা সত্তা থাকে—সেই সত্তাটা স্থূল,—যতক্ষণ দেখা না যায় ততক্ষণ সূক্ষ্ম, আর কি। তুমি মনে কর যাঁরা বিরাজ ক'রছেন, পৃথিবীগুলো সেইজন্যই হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন কর্মীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পৃথিবীতে ভরপুর হয়ে রয়েছে মহাকাশ। সেইজন্য অগণিত পৃথিবী—পৃথিবী গুণে শেষ করা যায় না। শুধু এইভাবে একটি পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে শেষ ক'রে দেয়নি। এই যমরাজা আছে, স্বর্গ আছে, নরক আছে—এই যে কথাগুলো যে গল্প আকারে এসেছে, সত্যের কিছু আভাস না থাকলে, ইঙ্গিত না থাকলে অতবড় গল্প তৈরী হ'তে পারে না।

আবার সব পৃথিবীরই একটা মাত্রা আছে। কর্মের মাধ্যমে মাত্রা হয়, সেই মাত্রা অনুযায়ী জীব অন্য পৃথিবীতে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে প্রথম থেকে শুরু হচ্ছে। যেমন ওয়ান থেকে 'টু'তে উঠে 'টু' আরম্ভ ক'রল, কিন্তু আরম্ভ শেষ হ'ল না। ওয়ান থেকে টু আরম্ভ, টু পাশ করে থ্রি আরম্ভ, থ্রি পাশ করে ফোর আরম্ভ—চিরকালই আরম্ভই চ'লছে। এই যে এক একটা ক্লাস থেকে এক একটা ক্লাসে উঠছে—ঘর বদলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ব্যক্তি ঠিকই আছে, ব্যক্তিত্ব নিয়েই সে যাচ্ছে। তুমি ব্যক্তি; তুমি মনে কর এই পৃথিবীতে এখানে এসেছ, এখানে কাজ-কর্ম করছ, জপ-তপ ক'রছ। দেখতে হবে, কোন্ মাত্রায় গেছ; ঠিক সেই মাত্রা অনুযায়ী পৃথিবীগুলো তৈরী রয়েছে। একেবারে সেই মাত্রার পৃথিবী, সেই মাত্রার সৃষ্টি, সেই মাত্রার সব কিছু—সবটাই হ'চ্ছে ম্যাথামেটিক্স্—অঙ্কের মতন সব কাজ হয়ে যাচ্ছে। দেখ, এক বছর পরে কোথায় কবে গ্রহণ হবে, কবে অমাবস্যা হবে, কবে পূর্ণিমা হবে—এইগুলি যেমন অঙ্ক ক'ষে ক'ষে বা'র ক'রেছে, সেই তিথি-নক্ষত্র মিনিট সেকেণ্ড ধ'রে ধ'রে এতগুলি যেমন অঙ্কের উপর চ'লছে—এই সমস্ত কার্যকলাপগুলোও ঠিক তাই। কোন্ পৃথিবীতে কে কখন কি কর্ম করেছে—জপ তপ ধ্যান ধারণা করেছে, কোন্ পথে কি ভাবে কোথায় যাবে না-যাবে, সেটারও একটা ছক ঠিক রয়ে গেছে। সেই ছক অনুযায়ী সেই পৃথিবীতে যাবে। একটা পৃথিবী যখন আছে, সেই রকম অগণিত পৃথিবী আছে। এখানে এসেছি—কেন এসেছি?—আসার কারণই হচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্রহ্মলোকে গিয়ে না প'ড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত কর্ম অনুযায়ী ছকের মধ্যে ঘুরতে হবে। দেখ, তুলাগুলো—এই যে মিল যেখানে আছে, তুলাগুলো এত বড় ভাঁজ হ'য়ে বোন্দা ভ'রে মিলের মধ্যে যাচ্ছে,—তার পরে আস্তে আস্তে সরু হ'তে

হ'তে সেই তুলা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম—ফাইন হ'য়ে স্কীণ হ'তে হ'তে চলেছে। খ্যাচ্ খ্যাচ্ মেসিন ঘুরছে দেখেছ তো, এটা মোটা বোন্দা থেকে আরম্ভ করে লাইন দিয়ে চলছে সরু হতে হতে সূক্ষ্ম হ'তে হ'তে আরও সূক্ষ্ম হ'তে হ'তে, তার পরে আরও সূক্ষ্ম—সুন্দর ঘুরছে,—সবশেষে আর এক জায়গায় কাপড় হয়ে বের হচ্ছে। এ-ও ঠিক তাই—কর্মের দিক দিয়েও প্রথম মোটা, আস্তে আস্তে সূক্ষ্ম হ'তে হ'তে—কর্মের মাত্রাও ঠিক সেই রকম সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম—আস্তে আস্তে তার চেয়েও সূক্ষ্ম—চ'লতে চ'লতে চলে যাচ্ছে সেই সহস্রারের পৃথিবীতে। অগণিত পৃথিবী আছে, মাত্রা অনুযায়ী এক এক জন এক এক পৃথিবীতে যাচ্ছে। মনে কর কেউ তার কর্মের মাত্রা হাজার নম্বরে গিয়ে মারা গেল। হাজার নম্বরে কি হ'ল? কাক হয়ে গেল—হাজার মাত্রায় গিয়ে কাক হ'ল। আর একজন দেখা গেল দশ লাখ মাত্রায় চলে গেল—দশ লাখ মাত্রায় গিয়ে কি হ'ল? সুন্দর একটা জন্ম হ'ল, অতি মধুময় জন্ম হ'ল, সহস্রার পৃথিবী প্রাপ্ত হল। সেই জন্ম হলে এই পৃথিবীতে তার জায়গা নেই—বন্ধ হয়ে গেল। 'ওয়ান' ক্লাশ পাশ ক'রলে 'ওয়ানে' রাখবে কেন? কিছুতেই তাকে 'ওয়ানে' রাখবে না। 'তুমি থাকতে পারবে না এই ক্লাসে'—উঠিয়ে নিয়ে তাকে 'টু'র ক্লাশে ধুপ্ ক'রে বসিয়ে দেবে। সুতরাং এও হ'ল সেই রকম। এই যে রয়েছ তোমরা এখানে, একেবারে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম ক'রতে ক'রতে যেই পাশ করলে, সেই সূক্ষ্মে গিয়ে যখন শেষ করলে, এই পৃথিবীতে তখন তোমার জায়গা নেই। পৃথিবী তখন তোমায় ধাক্কা দিয়ে হাউই-বাজির মতন সেই মাত্রার পৃথিবীতে পৌঁছে দেবে। হাউই-বাজির পাছায় আগুন দেয় জানতো! ফোঁস.......! তখন ফোঁস না করে উপায় নেই, তখন ফোঁস ক'রে আর এক জায়গায় চ'লে যায়। তখন তোমাকে এই পৃথিবী ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে—তুই যা গিয়ে, আর এক জায়গায় যা, এখানে তুই থাকতে পারবি না। তখন ধড়াস ক'রে চ'লে যাবে। এমন magnetic power (ম্যাগ্নেটিক পাওয়ার) তখন, ক্ষমতা তখন। নিয়ে—ঐ মাত্রায় নিয়ে ঐ মাত্রার পৃথিবী যেটা, সেখানে ধড়াস ক'রে পৌঁছিয়ে দিল। সেখানে গিয়ে দেখলে যে, এই পৃথিবী হ'তে যে মাত্রা নিয়ে গেলে, দেখলে এইটা (সহস্রার) ফেটে গেছে। ফেটে যে গেছে তা তো বোঝনি! সহস্রার ফেটে গেছে, এখন ঐ ফাটা নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রলো। এখন, তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে, তিনি দান করেন, তিনি যদি মনে কর সহস্রারের ব্যক্তি হ'য়ে সেই সহস্রারের পৃথিবী থেকে এসে থাকেন, সহস্রারের বীজটা যদি তোমাদের দিয়ে থাকেন, একেবারে শেষ। সহস্রার পর্যন্তই তোমাদের ব'ললাম। সহস্রারের বীজখানা এমনি এখানকার সঙ্গে মিশিয়ে বীজ দিয়ে দিলেন। তোমরা তো মনে করে ব'সে আছ, কাজ বেশী কর না, যে যতটুকু যা কর ক'রে যাচ্ছ।—কিন্তু ঐ বীজটা ক'রবে কি ঐটা হ'ল টাইম বোমা—ঠিক অমুক দিন অমুক সময় ফটাস ক'রে ফাটবে। সেই বোমা নিয়ে ছেলেপিলেরা বল খেলছে, কোন আওয়াজ নেই, কিছু নেই; কিন্তু যেমন এটা ফাটবে অমুক দিন, অমুক তারিখ—তখন ফেটে দেশশুদ্ধ জ্বালিয়ে দেবে—ব্যাস। তোমাদের যে বীজ দেওয়া হয়েছে, এইটা টাইম-বোমা। সময়মতন এটা ফাটবে। ফেটে কি ক'রবে? জান তো, কোন কোন

বোমা আছে, ফাটলেই উপরে গিয়ে রাধা-কৃষ্ণ হয়ে যায়; উপরে উঠে সুন্দর মালা হয়। দেখ তো, বোমার ছাবড়া প'ড়ে থাকে এখানে, আর উপরে গিয়ে রাধা-কৃষ্ণ, রাম-লক্ষ্মণ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তোমাদের বীজটা হ'ল সেই টাইম-বোমা। সময় মতন ফটাস করে ফাটবে—ফেটেই এখানে আর থাকবে না। এখান থেকে সাঁ-আ-আ ক'রে ঐখানে নিয়ে—সবগুলিকে সেই পৃথিবীতে নিয়ে পৌঁছে দেবে। সে জায়গাটা কি রকম? সেখানে সব সত্যদ্রষ্টা—সব অন্তর্যামিত্ব, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ক্ষমতা। সব ক্ষমতাগুলো ঐখানে গিয়ে মূর্তি হয়ে গেছে—সাম্য-সুন্দর অদ্ভুত ভরপুর মূর্তি যেটা, সেইটা তৈরী ক'রে নিয়ে ঐ জায়গায় নিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। সেইখানে যেই তুমি পৌঁছলে, তুমি জানতে পারলে,—বাঃ, কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত আনন্দ পেয়ে গেলে। সেটার দৃষ্টান্ত হ'ল— তোমরা যে এখানে আছ; একটা বাচ্ছা হলো, বাপে পুতে কথা কয়,—অতি সহজে সেটা পাচ্ছ ব'লে গুরুত্ব দিচ্ছ না। কিন্তু কতবড় সাংঘাতিক! আমার মধ্যে যে এতগুলি কথা কয়, তা তো জানতাম না! চিন্তা করে দেখ দেখি যে, তোমার মধ্যে এতগুলি ব্যক্তি কথা বলে। এক ব্যক্তি ইচ্ছা ক'রলে বিশ লক্ষ, ত্রিশ লক্ষ বাচ্চা দিতে পারে—আরও বেশী দিতে পারে। মনে কর পঞ্চাশ লক্ষ বাচ্চার বাপ তুমি, পঞ্চাশ লক্ষের বাপ আমি—তা হ'লে পঞ্চাশ লক্ষ ব্যক্তি তোমার মধ্যে আছে। পৃথিবী যদি পাঁচ শত কোটি থাকে, সেই পাঁচশত কোটি পৃথিবীর তুমি ইচ্ছা ক'রলে বাপ হতে পারে। পাঁচশত কোটির বাপ তুমি। যতগুলি পৃথিবী, ততগুলি বাচ্চা তোমার মধ্যে আছে। তা হ'লে এতগুলি চক্ষু, এতগুলি নাক, এতগুলি কান প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আছে! চিন্তা করে দেখ—এটা খেলা কথা নয়। এক একজন তো হাউমাউ করে—আমি কি জানি, আমি কি জানি? 'আমি কি জানি' বললে কি চলবে? পৃথিবীর সব গুষ্ঠি তোমার মধ্যে। যদি একটা একটা করে সৃষ্টির বীজে ফেলে দিই—প্রত্যেকটির যদি বাচ্ছা হয়, তা হ'লে কত লক্ষ কোটি তোমার মধ্যে আছে! তা হ'লে এতগুলি চোখ, কান, নাক, এতগুলি কথা তোমার মধ্যে আছে। বাপে পুতে ঝগড়া হয়, বাপ কথা বলে ছেলে উত্তর দেয়—প্রশ্নের জবাব দেয়। তা' হলে জবাবটা কে দিচ্ছে? তোমার প্রশ্নের তুমিই জবাব দিচ্ছ। তোমার মধ্যে কথা কইত; সেইটা তুমি ফুঁ-দিয়ে বার করলে। কথাটা বুঝলে? দেখ, দেবতার খেলা কি রকম—তোমার মধ্যে তুমি খেলা ক'রছ। ব্যক্তি তোমার, আছে তোমার, সব তোমার। তা হ'লে এক একটি ব্যক্তির মধ্যে মনে কর পঞ্চাশ দু'গুণে এক শত কোটি চক্ষু আছে—দুটো ক'রে চক্ষু, এক শত কোটি নাক-কান আছে। তা হ'লে তোমার মধ্যে সব আছে। তবে নাই বলে মনে হয় কেন? এত বড় বিরাটের কথাটা তুমি কি উড়িয়ে দিতে পারবে? এত বড় যে বিরাট, সে যদি আছেই প্রমাণ হ'য়ে যায়, তবে বিরাট তো এতটুকু হ'য়ে যায়। বিরাটকে কখনও মাপা যায় না। মা ব'লছে ছেলেকে—বিরাটটা তুই মেপে আয় তো! ছেলে বলে আমি মেপে পেয়েছি মা!—কি রকম! — এই পাঁচ শত হাত।—না, তুই পাসনি বিরাট, আবার মাপ।—বলে, আমি পেয়েছি বিরাট।—কি রকম?— যে, যত মাপি ততই বড়, শেষ আর নেই।—হ্যাঁ, তবে পেয়েছিস বিরাট। তাই এটাও মাপের বাইরে। তুমি যদি বুঝেই ফেল, তবে তো বিরাট হ'ল

না। যখনই 'আমি বুঝলাম না', যখনই 'আমি জানি না',—তখনই বোঝা হ'ল। নাগালের বাইরে থাকলেই বুঝা গেল তোমার মধ্যে বিরাট ক্ষমতা আছে। বিরাট ক্ষমতার সংজ্ঞা হ'ল কি—যে, আমি বুঝি না, আমি জানি না, আমার দ্বারা হবে কিনা সন্দেহ! যত হতাশ-নিরাশ, সেটা বিরাটের সংজ্ঞা। বিরাটের সংজ্ঞা এই নয়—আমি পেয়েছি, আমি হয়েছি, আমি করেছি, আমি বুঝেছি। তা হ'লে আর বিরাট হ'ল না। আমি পাইনি, হায় হায়, ওরে বাপ্‌রে বাপ্!—এই যত হায় হুতাশ, তত বেশীই বিরাটের কারবার। সুতরাং তোমার মধ্যে এত চোখ-কান-নাক, এত কিছু তোমার মধ্যে—তার প্রমাণ তো বাইরে নয়। এটা তো কল্পনার কথা নয়, এটা স্বর্গরাজ্যের কথাও নয়, এটা মর্ত্যরাজ্যের কথাও নয়। এটা universal talk (ইউনিভার্সাল টক),— এটা বিশ্বের কথা। বিশ্বের কথা যখন তোমার মধ্যে, তা হ'লে তুমি তো কম বড় নও! বড় হওয়ার মতন অংশ তোমার মধ্যে আছে। তা'হলে সবগুলি চোখ-কান-নাক যদি জেগে ওঠে, তবে কেমন জাগা জাগবে,—সে কেমন জাগা জাগবে বল? এগুলি জাগে কিনা?—নিশ্চয়ই জাগা আছে, জাগা না থাকলে এতগুলি ন'ড়তনা! প্রাণবিহীন নয়, প্রাণ আছে প্রত্যেকটির মধ্যে। তবে কি ক'রে সহজে জাগে? এইগুলি জাগে ধ্বনিতে, ব্যাপারটা বুঝেছ? এগুলি ধ্বনিতে জেগে ওঠে। ঐ যে ধ্বনি যেটা দিয়েছি, ঐ ধ্বনিতে স্ফুরণ হ'তে থাকে—ঐটা পেলেই জেগে ওঠে। কেন হয়? হাতে ঢিল ছুঁড়লে পঞ্চাশ হাত যায়, আর ঐ ঢিলটার পাছায় বারুদ লাগিয়ে টিপ দিলে দুই মাইল যায়। এতটুকু ঢিল, একটু বারুদ লাগিয়ে দিলে কোথায় কতদূরে যায় গিয়ে! সহস্রারের ব্যক্তি যখন এখানে আসেন,—প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে,—শব্দ হ'ল এখানকার লোহা, এখানকার ইস্পাত—এই এতটুকু,—এই ইস্পাত-ঢিল দিলে একশত হাত যেতে পারে,—আর এই ইস্পাতের মধ্যে কি করেন? ঐখানকার ব্যক্তি যখন এখানে আসেন, এই ইস্পাতের মধ্যে—ঐখানকার বারুদ এই প্রত্যেকটি ইস্পাতের মধ্যে একটু একটু ক'রে লাগিয়ে দিয়েছেন,লাগিয়ে দিয়ে সেই বারুদভরা ইস্পাত তোমাদের কানের ভিতর খট্ ক'রে দিয়ে দিলেন। আর তোমরা কি ক'রবে? তোমরা ক্যাপ্‌ট্ ক'রবে—পিস্তলের যেমন ঘোড়া টেপে, সেই রকম তোমরা ক্যাপ্‌ট্ ক'রবে, আর তোমাদের কিছু ক'রতে হবে না। তোমাদের কিছু বুঝবার দরকার নেই—কি হবে? তোমরা কেবল খট্ খট্—ঐ মন্ত্রজপ শুরু হ'ল—তোমরা কেবল খট্ খট্ জপ ক'রে যাও। ঐ বারুদের ক্রিয়ায় কি হবে? তোমার মধ্যে যে সত্তা আছে—ভেতরে যে সত্তা আছে, ঐ বারুদভরা ইস্পাতে ক'রবে কি—তুলে নিয়ে সাঁ-আঁ করে চলে যাবে। কারণ প্রত্যেকগুলো নাক-চোখ-মুখ ফাটিয়ে দিচ্ছে ঐটায়— জেগে উঠছে ঘুমন্ত শিশু। যেই বাচ্চাগুলো ভিতরে ছিল সবগুলো জেগেছে। জেগে কি করে? যখনই বাচ্চা জাগে, তখনই কাঁদে। বাচ্চা যখনই ভুমিষ্ঠ হয়, তখনই কাঁদে। তা' হলে তোমার মধ্যে শিশুগুলি যখন জাগবে, তখন কী ব'লবে?তখন বোল ব'লবে—বোল দেবে। কী বোল দেবে?—তুমি বলীয়ান, তুমি বলীয়ানের বোল দিয়ে যাচ্ছ—ঐ বোল দেবে শুধু। ওরা সবাই মিলে ইউনিভার্সাল বোল দিচ্ছে; ইউনিভার্স যেই বোলে সৃষ্টি হ'চ্ছে। বিশ্বপ্রকৃতি যেই বোলকে

অবলম্বন ক'রে সৃষ্টি ক'রছে, সেই বোল দিয়ে যাচ্ছে। কারণ সদ্যোজাত শিশু—এই শিশু এখানকার নয়—বুঝলে? সদ্যোজাত—এখন ওদের সঙ্গে যোগাযোগ—সব সময় সেই বোল দিচ্ছে। ওরা যদি সব সময় তোমার মধ্যে অহর্নিশ বোল দিয়ে যায়, তা হ'লে তোমার প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে পাঁচ লক্ষ কোটি নাম হ'য়ে যাচ্ছে, কারণ ঐ নাম ওরা সবাই মিলে একই সময়ে ক'রে যাচ্ছে! তা'হলে এক এক সেকেণ্ডে পাঁচশত কোটি নাম তোমার হ'য়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? ওরা সবাই এক বোল দেবে। প্রতি সেকেন্ডে যদি পাঁচশত কোটি নাম হয়ে যায়, তবে এক ঘন্টা জপ ক'রলে সে কি না হ'তে পারে? পাঁচশত কোটি লাকড়ি কত হ'তে পারে? একটা লাকড়ি না হয় কিছু না, পাঁচশত কোটি লাকড়ি তিনতলা সমান উঁচু হ'য়ে যাবে। এখন পাঁচশত কোটি নাম যদি এক সময়ে বোল দেয়, তা' হলে কী না হয়! একদিন বলেছিলাম—প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচশত কোটি নাম কি ক'রে হয়। পাঁচশত কোটি নাম যদি এক সঙ্গে বোল দেয়, তা' হলে কী না হয়! পাঁচশত কোটি নাম যদি তুমি ওদের সঙ্গে ক'রে যাও—ওরা তোমার দেহে এক হ'য়েই তো আছে,—তাই তোমার পাঁচশত কোটি মুখ হ'য়ে যাচ্ছে। পাঁচশত কোটি নাক-চোখ হ'য়ে যাচ্ছে। তোমার দেহের উপরে না হয় দু'টি মাত্র চোখ আছে,—সেই দুটি চোখ কি? হাতীর শুঁড়—এখান থেকে জল নিয়ে সাপ্লাই ক'রছে, ওদের খাওয়াবার জন্য। তুমি আধার যোগাচ্ছ। প্রকৃতি ওগুলোকে খাওয়াবার জন্য আধার যোগাচ্ছে— চোখ, কান, নাক দিয়ে ওদের আধার যোগাচ্ছে। তুমি মনে কর—তুমি শুনছ। হ্যাঁ, তুমিই শুনছ—ঐ সবটাই তোমার, এগুলি শুনাচ্ছে—ওদের ভরপুর ক'রছে। ঐ নাম দিয়ে ওদের নামে মাতোয়ারা ক'রছে এবং সবাই মিলে ঐ নামে নাম দিয়ে যাচ্ছে। এবং তখন তুমি কোথায়?—মহাপ্রভু তখন ঊর্ধ্ববাহু হ'য়ে গেছেন। আর থাকতে পারেন নি। তখন দেখলেন—আমার নাম জপ সবাই করে দেখি! মহাপ্রভু শব্দ শুনতে আরম্ভ করেছেন—ঐ যে ধ্বনি, —নূপুর-ধ্বনি—ধ্বনি শুনা যায় ভিতর থেকে, কি সে মধুর সুর! দূর থেকে মনে হয় যেন ভাইব্রেশন হয়ে যাচ্ছে। সে-কি আওয়াজ!—সুন্দর মিষ্টি আওয়াজ। শিস্—শিসে শিসে আওয়াজ হ'চ্ছে সব। মহাপ্রভু নিজের কান দিয়ে সেই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন, মধুর সুর ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছেন। সে একেবারে অদ্ভুত! তন্ময় হয়ে গেছেন—যখনই তন্ময় ক'রে দিচ্ছে, তখন আর তিনি এখানে নেই। প্রতি মুহূর্তে যার পাঁচশত কোটি টাকা ইন্‌কাম, সে রাজার চেয়েও বড়, সম্রাটের চেয়েও বড়। ঐ ইন্‌কামের আর এখানকার ব্যাঙ্কে জায়গা হবে না। যার প্রতি মুহূর্তে পাঁচশত কোটি টাকা ইন্‌কাম, আর ব্যাঙ্ক ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্ক, বিশ্বের ব্যাঙ্কেই তার টাকা জমা হতে পারে, আর কোন ব্যাঙ্কেই জমা হতে পারে না। সুতরাং তোমরা যে পাঁচশত কোটি মেডিটেশন—জপ আছে, ধ্যান আছে—এই যে সেকেণ্ডে ফাইভ হানড্রেড্ ক্রোর ফোর্স চ'লে যাচ্ছে সব—কি ক'রছে জান? এই যেটা তোমাদের দেওয়া হয়েছে— ঐখানকার বারুদে সবগুলিকে ফাটিয়ে দিয়েছে। চুম্বকের মত ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে ফাটিয়ে দেয়। ফোটে। কি রকম? খৈ ফুটতে তো দেখেছ?—ফাট্-ফুট্ ফুট্-ফাট্—কী সুন্দর খৈ-গুলি ফোটে! ধানের আর খৈ-এর চেহারা তো এক নয়। এতটুকুন

বালি—তার মধ্যে দিচ্ছে, আর সুন্দর ফুলের মতন হয়ে চারিদিকে প'ড়ে যাচ্ছে ফুট্-ফাট্ ফুট্ -ফাট্ শব্দ ক'রতে ক'রতে। সেই রকম ঐ ভিতরের বাচ্চাগুলিও ফুট্-ফাট্ ফুটতে আরম্ভ করেছে। কী মধুর সুর! এই যে মধুময় জিনিসটা—উপলব্ধি করা যায় এইখানে বসে সেইখানকার বার্তা। ঐখানকার বার্তা যে শোনা যায় তা দেখ, মরে গেছে একটা লোক—রেকর্ডটা বাজালে আজও তার কথা বলে। সে ব্যক্তি নেই, কিন্তু একটা থালার মত—বিস্কুট-টিস্কুট খাওয়া যায় তাতে—ঐটার মধ্যে পিনের খোঁচা দিয়ে মরা ব্যক্তির গান বার ক'রছে। তেমনি বিশ্বের সমস্ত রেকর্ডগুলি ঐ চোখে-মুখে নাকে-কানে সবটার মধ্যে বাঁধা;—যেই ঐ নাম-রূপ পিনের খোঁচা পেয়েছে, আর সবগুলি বিশ্বের সুর দিতে আরম্ভ করেছে। স্রষ্টা তার সুর দিতে আরম্ভ করেছে সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, রূপের ভিতর দিয়ে, তার গুণের ভিতর দিয়ে—প্রতি মুহূর্তে সুর দিতে আরম্ভ করেছে। কারণ এটা জাগ্রত রেকর্ড, জীবন্ত রেকর্ড। জীবন্ত রেকর্ড জীবন্ত কথাই ব'লবে এবং এই জীবনই সেই কথা বলে। পরজন্ম, পরবর্তী কথা নয়, এখনও আছে, এখনও তোমাতে বিদ্যমান। সুতরাং তোমরা সেই পথের পথিক, তোমরা সেই পথের যাত্রিক। তোমাদের ঠাকুর সেই ধরণের কিছু দিয়েছেন তোমাদের, খোঁজ-খাঁজ ক'রে এলে তোমরা উঠে যাবে। সেই রকম পৃথিবী, সেই রকম লোক,—সেই রকম তোমাদের জগৎ। দেখ, এটা বিজ্ঞানসম্মত। আজ পর্যন্ত ইতিহাসে, শাস্ত্রে এই রকমভাবে ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় নি। এত সহজে, এত সুন্দরভাবে তোমাদের বলে দিচ্ছি, যেটা অল্পেতেই বুঝতে পারবে যে বিজ্ঞানসম্মত। এটা কল্পনার কথা নয়, স্বপ্নের কথা নয় অলীক কথা নয়,—এটা আইন সঙ্গত। এমন সুন্দর তোমাদের মধ্যে সুসজ্জিত রয়েছে, যেটা অতি সহজে, একটু কাজ ক'রলেই অতি অল্পেতেই পেয়ে যাবে। সজাগের জিনিসগুলি তোমাতে আছে, তুমি তো প্রাণবন্ত, তোমার সব সময় রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে, এই বিট্‌টা (pulse-beat) যতক্ষণ পর্যন্ত আছে, ততক্ষণ সব সজাগ। এই হাতের বিটের তালে তালে সূর্যেরও এই রকম একটা ধমনী আছে; যেমন তোমাদের হাতে ধমনী আছে। এই যে হাতের ধমনীতে টিপ দিয়ে ধরলে টক্-টক্-টক্—এটা কেন করে? এই স্পন্দনটা কেন হয়? সূর্যের স্পন্দনটা এইখানে হ'চ্ছে। তুমি মনে কর, তোমারই স্পন্দন শুধু,—তোমার স্পন্দনটা কোথাকার? ঐখানকার স্পন্দন তোমার হাতের এইখানেই দিচ্ছে। কারণ এটা জীবন্ত—ঐটার তাপ আছে। তাপ যখনই থাকবে, তখনই তাপটা তোমার নিজস্ব শুধু নয়, তাপটা হ'চ্ছে আর এক জনের, তাই তোমার ভিতর সূর্য আছে। তাপটা যদি সব সময় না থাকত, তবে তোমার এই তাপ তুমি রাখতে পারতে না। তাপ নিষ্প্রভ হয়ে যেত। একটা তাপ, যদি আগুনে দিয়ে কোন জিনিস গরম ক'রে রেখে দাও, কতক্ষণ থাকবে? কিছুক্ষণ পরেই তাপ উবে যাবে। কারণ যে তাপ দিয়েছে, সেই দেওয়া নেওয়া নেই। পাঁচ-দশ মিনিট অথবা আধ ঘন্টা রাখতে পার, তার পরের ঘন্টা থাকবে কোথায়? তোমার তাপ অফুরন্ত—অনন্ত তাপ, মরে গেলেও সে তাপ থাকে। এই তাপ মরে গেলেও থেকে যায় কি ভাবে?—অন্য আকারেও থাকে,—বাতাসে থাকে, ছাইয়ে থাকে, জলে থাকে। সাংঘাতিক কথা! এই তাপ যদি তোমার একার হ'ত,

তা'হলে তাপ থাকত না। এই তাপের সঙ্গে চির-অনন্ত যোগাযোগের সত্তার বার্তা এখানে তোমার হাতে বহন ক'রছে—খট্-খট্-খট্।—কি বলছে জান?—এটা বোল দিচ্ছে যে, যতগুলি চোখ-কান-নাক তোমার মধ্যে—যে অনন্ত কোটি জীব আছে—সেইগুলি সব এই তাপে এক সুরে সুর দিচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ?—যতগুলি প্রাণ আছে তোমার মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম,—অতি সূক্ষ্মযন্ত্রেও যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না—সবগুলি প্রাণের একত্রিত সুরের সাড়া হ'চ্ছে এইটা—তোমার হাতের বিট্টা—খট্-খট্-খট্। এটা তোমার একার নয়—অনন্ত কোটির সাড়ার সাড়া। খট্-খট্-খট্ বহু কোটির স্পন্দন চ'লছে এইখানে। কথা বুঝতে পেরেছ? এখন তুমি যদি একটু চিন্তা কর, এই যে হার্ট, এই যে হৃদয়—এ হৃদয় তো তোমার একার নয়, অগণিত হৃদ্‌শক্তির স্পন্দন তোমাতে চ'লছে। তাই তোমার মধ্যে সেই বন্দনা যদি তুমি না কর, সেই বন্দনাতে যদি তুমি যোগ না দাও, সেই সুর যদি তুমি না দাও, ওরা অনাহারী হয়ে থাকবে। ওরা অনাহারী হয়ে আহার চাইছে, বুঝতে পেরেছ? দেখ, ক্ষুধায় পিত্ত পড়ে যায়, তখন পেটে ডাক দেয়,—এ ডাক তো নিশ্চয় শুনেছ? কড়র্-কড়র্ ডাকে। ক্ষুধার সময় যদি খেতে না পায় তবে পিত্ত পড়ে, তাতে দেহের ক্ষতি হয়, তখন নিজেকে খেতে আরম্ভ করে,—তুমি জান? যখন তাকে খেতে না দেওয়া হয়, তখন তোমাকে খেতে থাকে, তোমাকে খেয়ে বড় হয়। ক্ষুধার সময় যদি তাকে খেতে না দাও, তা' হ'লে সে ডাকবে,— ডেকে জানিয়ে দেবে। তাই শ্বাসে প্রশ্বাসে এবং এই মাত্রায় মাত্রা দিয়ে হৃদয় স্পন্দনের ভিতর দিয়ে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছে—আমাকে অনাহারী রেখ না।—আহার কোথায়? তাকে ডাল চাল ভাত দিলে শুধু চলেনা। ব'লছে যে, ওটা অঙ্গ আমার, ওটাও বাদ দিওনা,—ওটা অঙ্গ। তোমাকে যদি নিমন্ত্রণ ক'রে এনে কতকগুলি মুখশুদ্ধি দেয় যে—আপনি তো মুখশুদ্ধি ভালবাসেন, সে দিন মুখশুদ্ধি দেইনি বলে কত রাগ করেছেন—তাই এক প্লেট লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি আপনাকে দেওয়া হয়েছে। সেদিন কত মাংস পোলাও দৈ—ত্রিশ পদ খাওয়ালাম, —একটু মুখশুদ্ধি দেইনি ব'লে আপনি রেগে উঠেছিলেন। তাই আজ আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে লবঙ্গ পরিবেশন ক'রলাম। হ্যাঁ, লবঙ্গ খেলে পেট ভরান যায় না, আবার খাওয়ার পর একটা লবঙ্গ না হ'লেও চলে না, একটা সিগারেট না হ'লেও চলে না, একটা পান না খেলে চলে না। তবে দেখা যায়, খাওয়ার সঙ্গে ওটারও দরকার। অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই বলছে—ডাল চাল অঙ্গ বিশেষ। সুতরাং এই অনাহারীদের একমাত্র আহার নাম-জপ। মহাপ্রভু আর উপায় না দেখে দু'হাত উপর দিকে তুলে এই জি টি রোড, বি টি রোড চৈত্র মাসের ঠাঠা-পড়া রৌদ্রে 'হে কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' ক'রতে আরম্ভ করেছেন অনাহারীদের খাওয়ার জন্য। —বুঝতে পেরেছ? ভাবছ, কত হাজার জপ করলে এই অনাহারীদের খাওয়ান যায়?—ও খাওয়ার কি শেষ আছেরে বাবা! পেট কি কখনও কারো ভরে? এ-বেলা খেলে ও বেলা আবার চায়। এক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে বলছে—ও বেলা খেতে পারবো তো? কারণ, খেতে খেতে খুব বেলা হয়ে গেছে,—ব্রাহ্মণ দুই বেলা খায়। তাল গাছে উঠে দেখছে আকাশ পানে চেয়ে যে, সূর্য ডোবে নি। তা' হলে তো দিন

থাকতেই খাওয়া হয়েছে। তবে রাত্রিতেও খেতে পারব। তখনও তার নিমন্ত্রণের ঢেকুর উঠছে।—এই তো অবস্থা! এ খাওয়ার শেষ নেই। তবে তুমি উপযুক্ত ব্যবস্থা কর। সেই জায়গায় পৌঁছাবার জন্য যে সাজান জিনিস, এটা বাঁধা এবং গাঁথা আছে।

অফুরন্ত খনির ভাণ্ডার থেকে তোমাদের দিতে আরম্ভ করেছি। আমি সেই অনন্ত ভাণ্ডার থেকে এনে দিচ্ছি— সেই অনন্ত ভাণ্ডার থেকে আমি নেমে তোমাদের কাছে এসেছি। খনির জিনিস দিয়ে যাব;আর তোমরা খনির সঙ্গে একত্র হয়ে আছ—আমি টেনে নিয়ে যাব। দেখ, রাজা টাকা চেনে না, কিন্তু টাকার মালিক; আর মুদি টাকা চেনে—ঠন্ ঠন্ করে বাজিয়ে বোঝে। আমি খনি—আমি খনির মালিকের কর্মী। আমি সমস্ত বিশ্বের সুরের ভাণ্ডার থেকে যেই সুর নিয়ে এসেছি, এই সুরের সঙ্গে একেবারে ভরপুর ক'রে সেই রসে ডুবিয়ে তোমাদের নিয়ে যাব। সেই রস তোমাদের দেব।

প্রশ্নঃ—আত্মা সম্বন্ধে কিছু বলুন। মৃত্যুর পর আত্মা চলে যায়; কে চলে যায়, কেন যায়; কোন্ আত্মা কি ভাবে কোথায় থাকে—আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর ঃ—আত্মা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ, শোন।—এই যে আকাশ, যার আরম্ভ নেই, যার শেষ নেই, তার ভিতরেই আবার দু'টোই আছে—আরম্ভও আছে, শেষও আছে। তাই আমাদের এই জন্মের পর জন্ম হ'চ্ছে। কেমন করে হ'চ্ছে, কিভাবে হ'চ্ছে—সেটাই রহস্য। মৃত্যুর পর কি বেরিয়ে যায় কারও জানা নেই। জানা আছে গ্রন্থে, শাস্ত্রে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কেমন ক'রে জানা যায়—কেমন ক'রে চলে যায়? যখনই প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তন হয়, এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে শুধু এইটুকুনই বুঝায় যে জীবন অবসানে শুধু আমরা দেখছি—শেষ অবস্থার দিকে সবাই চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে শেষ অবস্থা, এটা কি শুধু শেষ অবস্থা না পরিবর্তনের অবস্থা? যখন মানুষের মৃত্যু হয়, কী যে বেরিয়ে যাচ্ছে, কে যে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সাগরে জল, পুকুরে জল, সেই জল যেমন করে আকাশে গিয়ে জ'মে বরফ হয়। শূন্যে মেঘ জলময়, কিন্তু জল দেখা যায় না, শূন্য জলে ভরপুর হয়ে আছে। যেমন ক'রে সাগরের জল বাস্তবে এই পৃথিবীর বুকে থাকে, আবার সেই সাগর যে কোন উপায়ে বাষ্প হয়ে বা যেই ভাবে যেই কোন পথ দিয়ে আকাশে গিয়ে বিচরণ ক'রছে, কিন্তু তা' শূন্য—ফাঁকা, তাতে জল পাওয়া যায় না। অথচ একদিনের বৃষ্টিতে দেশ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেই জলে আবার সাগর, পুকুর ভ'রে যায়। জীবজগতের দেহ হচ্ছে তেমনি একটি রূপ। সে বেরিয়ে যায় তেমনি নিদাঘের রাগে, সূর্যের রাগে। বেরিয়ে যায় বাতাসে, বেরিয়ে যায় এই পৃথিবীর আকর্ষণে। কি বেরিয়ে যায়, কেউ তা জানেনা—জল যেমন শূন্যে চলে যায়, কেউ তা দেখে না। শব্দ যেমন বায়ু বা আকাশকে কেন্দ্র ক'রে এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যায়, তেমনি রূপও চলে যায়। সবই যায়, কিন্তু কিছুই দেখা যায় না। এখনো কিন্তু সবার জীবন্ত অবস্থাতে আত্মা চলে যাচ্ছে। জন্মের সাথে সাথে দেহে আত্মার প্রকাশ। শুধু মৃত্যুর পরই আত্মা চলে যায় না, জীবন্ত অবস্থায় আত্মা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বা'র হতে থাকে। সেটা কি রকম? এই দেহের সচেতন পদার্থগুলো, যেটা বায়ু-তেজের মিলনে

রয়েছে, সেটা আবার এই বায়ু এবং তেজের সংমিশ্রণে এই দেহ হ'তে ক্রমশঃ ক্রমশঃ এমন একটি সতেজ বস্তু আকারে ব'র হ'তে থাকে, যেটা ঠিক বাষ্পের মত, যেটাকে দেখা যায় না, যার থেকে যায় সেও তা' বোঝে না। কিন্তু বোঝে এই যে, তার দেহ ক্রমশঃ ক্রমশঃ এমন একটি অবস্থায় গিয়ে পরিণত হয়, যখন তার দেহ নিস্তেজ হয়ে আসে। দেহের চামড়া শিথিল হয়, চুল পেকে যায়, দেহ ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। আত্মা যদি জীবন্ত অবস্থায় বা'র না হ'তো, তবে কোন দেহ ক্ষীণ হ'তে পারতো না, মৃত্যু হ'তো না। সকলেই শুনেছ মৃত্যুর পর আত্মা চলে যায়। জীবন্ত অবস্থায় আত্মা যে চলে যাচ্ছে, সেটা নূতন কথা। কিন্তু কথাটা নূতন নয়, আজও আমাদের আত্মা যাওয়ার পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ ধাপে ধাপে কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘের মতন, সেই কুয়াশা ক্রমেই বা'র হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্যই দেহ ক্ষণস্থায়ী, চিরদিন দেহ সেইজন্যই থাকে না। যদি জীবন্ত অবস্থায় আত্মা না বেরিয়ে যেত, তবে দেহ চিরদিন থাকতো। এই দেহের নিয়মই হ'চ্ছে ক্রমশঃ ক্রমশঃ কর্পূরের মতন উবে যাওয়া! এক মণ কর্পূর দিয়ে একটা মূর্তি গড়া হ'ল; দেখতে দেখতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ কর্পূরের মূর্তি মিলিয়ে গেল; ঐ কর্পূরের মূর্তিটা যেমন ক'রে চলে গেছে, তেমনি ক'রে জীবন্ত দেহও চলে যায় একটু একটু ক'রে। পৃথিবীতে যদি দেখ কোন বস্তু মিশে যেতে পারে, মিশে যাওয়ার ক্ষমতা নিয়ে যদি কোন বস্তু পৃথিবীতে এসে থাকে এবং মেশার ক্ষমতা যদি যে কোন বস্তুতে আমরা দেখতে পাই বা বুঝতে পারি, তখনই বুঝবে, যে সেটাই হ'ল আমাদের দৃষ্টান্ত। আমাদের দেহের বস্তুও তেমনি করে যেতে বাধ্য। যখন দেখছ কর্পূর উড়ে যায়, জল উড়ে যায়, আরো অনেক বস্তু আছে উড়ে যায়, মিশে যায়, তখনি বুঝবে যে, মিশে যাওয়াই হল নিয়ম। প্রকৃতির নিয়মের মাধ্যমে প্রতিটি বস্তুই মিশে যায়। ঠিক তেমনি করে দেহও উড়ে যায়, মিশে যায়। মিশে যে যায়, দেহ কোথায় যায়? যার যার যেই স্তরের, সেই স্তরে চলে যায় অর্থাৎ মাত্রায় মাত্রায় যায়। দেখ, কারো কথার সুরের সাথে অন্য কারো সুর মেলে না। এক একজনের সুর অর্থাৎ গলার স্বর অন্য জনের সঙ্গে মেলেনা, সবার স্বর আলাদা। হাজার লোকের গলার স্বর শুনে বলতে পারবে— কোন্‌টা কার গলা। স্রষ্টার কত বড় বিরাট ক্ষমতা—অগণিত সুর রয়েছে, জীবজগতে অগণিত জীব রয়েছে, কারো সঙ্গে কারো চেহারার অথবা গলার সুরে মিল নেই, অদ্ভুত! ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেহ থেকে এই যে সুর বা স্বর উড়ে যাচ্ছে, ঠিক যার যার দেহ থেকে যে স্বর যাচ্ছে, মনে কর কারো দেহ থেকে পাঁচ মাত্রা বেরিয়ে গেল, কারো দেহ থেকে ছয় মাত্রা বেরিয়ে গেল, এইরকম করে সবার মাত্রায় মাত্রায় বেরিয়ে গেল। যখনই বেরিয়ে যাচ্ছে, যার যারটা তার তারটা আলাদা আলাদা জমাট হচ্ছে শূন্যে গিয়ে। স্রোতের মতন সকলেরটা বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমার শব্দ একটা জায়গাতেই জমা হচ্ছে। কি যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু যাচ্ছে ঠিকই। এইভাবে যেতে যেতে যখন তোমার মৃত্যু হ'ল, তখন তুমি গিয়ে দেখতে পাবে, যেন ঠিক তুমিই কথা বলছো। তুমি জীবনভর যত কথাই বলেছ, সব কথাই চলে গেছে, গিয়ে জমাট হয়ে আছে। তাই তুমি সেখানে গিয়ে তোমার দেহের প্রকাশ দেখতে পাবে—ঘুমিয়ে থেকে যেমন স্বপ্ন

দেখ, সেই স্বপ্ন আবার জাগ্রত হয়ে বলতে পার। স্বপ্নে তুমি এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যাও, সেখানে কত কি দেখ, জেগে আবার সব বলতে পার। ঠিক তেমনি তুমি জীবন্ত অবস্থাতে যা যা বলেছ, সবই গিয়ে জমা হয়ে আছে। যেই মৃত্যু হ'ল, অমনি তোমার সব কথা তুমি শুনতে পাবে। স্বপ্নে এইটাকেই বুঝিয়ে দিচ্ছে। স্বপ্ন মৃত্যুরই আরেকটি স্তর। আত্মা ঐভাবেই থাকে। ঘুমিয়ে থেকে সে যেমন কথা বলতে পারে, মৃত্যুর পরেও সেইভাবেই কথা বলে। দেখ, একটা রেকর্ড আছে, সেটা একটা থালার মতন। তাতে কে কবে কথা বলেছে, আর সেই কথা তার মধ্যে আটকিয়ে আছে। একটা পিনের খোঁচায় সেই রেকর্ড সেই কথা বলে;ব্যক্তি নেই অথচ তার কথা আছে। এই রেকর্ডে সে যা বলেছে তাই আবার শোনা যায়। আমাদের ভিতরের জীবন্ত অবস্থাতে যে বিষয়বস্তুটা চলে যাচ্ছে, গিয়ে জমাট হচ্ছে, সেটাও ঠিক ঐ রেকর্ডের মতন একটি জীবন্ত রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। তোমার দেহ থেকে জীবন্ত অবস্থায় তোমার সত্তা, তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার চেতন পদার্থ যা কিছু বা'র হয়ে যাচ্ছে, তাই আবার জীবন্ত রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। সেই রেকর্ডের কিন্তু বুঝ আছে, সে কথা বলতে পারে, সে সব বোঝে। অদ্ভুত রেকর্ড! এই বিশ্ব-প্রকৃতি যে কি অদ্ভুত, তার সৃষ্টি অদ্ভুত, কোথা থেকে খোঁচা দিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত রূপ তার থেকে বেরিয়ে যায়। শুধু তোমার নয়, এইরকম মশামাছি থেকে আরম্ভ ক'রে পিপীলিকা পর্যন্ত সবাই ঐভাবে পেয়ে যাচ্ছে। অফুরন্ত, অসীম—শেষ নেই। সবাই পেয়ে যাচ্ছে। দুধ রয়েছে, মন্থনে সেই দুধ থেকে মাখন বা'র হয়। তেমনি সমস্ত দেহের কণিকায় কণিকায় ননীরূপ চেতন পদার্থগুলো সম্পূর্ণভাবে মনের কণিকায় অণু-পরমাণু হয়ে রয়েছে। সেই ননীগুলো, যেমন দুধে আলোড়ন করলে ননী সেই দুধেই দলা হয়ে জমা হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে অণু-পরমাণু হয়ে আমাদের ভিতরে চেতনরূপে, সচেতনরূপে, অণু-পরমাণু আকারে আছে। সেই অণু-পরমাণুগুলো কিন্তু সচেতন, প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে চেতন রয়েছে, বুদ্ধি রয়েছে, ঠিক এখন তোমাদের ভিতরে যেমন বুদ্ধি আছে, তেমনি ওদের ভিতরে আছে। তোমাদের ভিতরে সেই অণুগুলো তারার মতন জ্বলছে। তোমরা আকাশে তারা দেখ, সূর্য-চন্দ্র দেখ, তেমনি তোমাদের শরীরটা অণু-পরমাণুর কাছে একটা পৃথিবী। এই কণিকা গুলো তোমাদের মধ্যে ভীষণভাবে রয়েছে। কি রকম? পৃথিবীর বুকে যতগুলো জীব রয়েছে, গুণে তা শেষ করা যায় না। ঠিক তেমনি এই দেহ তাদের কাছে পৃথিবী; এই দেহ-পৃথিবীতে রয়েছে অগণিত জীব-কণিকা, যাদের গুণে শেষ করা যায় না। তারা তোমার মাঝে ভরপুর হয়ে বসে আছে। সেই কণিকাগুলো ক্রমশঃ ক্রমশঃ মনের চাপে, মনের টানে বাষ্পের মত উড়তে আরম্ভ করেছে তোমার সত্তা নিয়ে। আর এই সত্তাগুলো তোমার জীবন্ত ফটো নিয়ে চলে যাচ্ছে। তুমি যা বলেছ, সে তাই বলবে। তুমি না থাকলেও তোমার মতন তারা কথা বলবে। এ হ'ল সেই রকম ফটো। জীবন্ত জিনিস তোলাই হ'ল ঐ কণিকার ক্ষমতা। সে যা তুলে নিয়ে যায়, সেই জিনিষ আবার সেই কথা বলে। সন্তান মারা যাবার পর সন্তানকে পুড়িয়ে দেওয়া হ'ল, সেই সন্তান আবার নিজ দেহ ধারণ করে বললো, "বাবা, আমি তো মরিনি!"—তোমার দেহ তো পুড়িয়ে ফেলেছি,

তবে ওটা আবার কোন্ দেহ? সন্তান কথা বলছে,—এই দেহ, আমার কণিকাগুলো জীবন্ত ভাবে ফটো তুলে নিয়েছে, সেই দেহ এটা। একই জিনিস, একই বস্তু, একই ভাবে গড়া। যেমন লব-কুশ, কুশে যেটা হ'ল সেটা লবই হয়ে গেল—একই চেহারা, একই মুখ। একটা কুশে যদি লব বানাতে পারে, তবে কণিকাগুলো কি না করতে পারে? কত লব, কত কুশ, কত জিনিস তৈরী করতে পারে দেখ, স্রষ্টা কত জিনিস আমাদের মধ্যে দান করে রেখেছেন। ঐ কণিকাগুলো তুমি বর্ত্তমানে যা যা ক'রছ, যেই যেই ভাবে চিন্তা ক'রছ, সেই সেই চিন্তার সব ফটো নিচ্ছে, দেহের ফটো নিচ্ছে, চিন্তার ফটো নিচ্ছে, যা যা ক'রছ তার ফটো নিচ্ছে, এবং সব নিয়ে এই পৃথিবীর বুকে মহাশূন্যে জমাট হয়ে গেছে। মহানরা যখন শাস্তি দেন তখন কি করেন জান? সবার কণিকাগুলো তো সব ছাপ নিয়ে চলে গেছে। জীবনভর যত আকাম-কুকাম, ন্যায়-অন্যায়, কথা-বার্তা যে যা করেছে, বলেছে, মহানরা সেইসব ছাপ টেনে এনে তাঁদের হাজার হাজার ভক্ত-শিষ্যদের সামনে, যে ব্যক্তির দেহের ছাপ, তাকে বসিয়ে তার সামনে সেইসব ছাপের কার্যকলাপ, কথাবার্তা, চিন্তা সব এনে হাজির করেন। তখন তা সকলের সামনে রেকর্ডের মতন বাজতে থাকবে। যার দেহের, সে তা আর আটকাতে পারবে না। সকলে তখন শুনতে পারবে, দেখতে পারবে যে, এই ব্যক্তি এই চিন্তা, এই কথা, এই ত্রুটি-বিচ্যুতি করেছে। এটা মহানরা জব্দ করার জন্য করতে পারেন, তবে সাধারণতঃ কেউ এর মধ্যে যান না। তবে মহানরা টেনে এনে তাকে জব্দ করতে পারেন। সেটা আলাদা কথা। তারপর কি হ'ল? ঐ কণিকাগুলো তো ক্রমশঃ বেরিয়ে আকাশের বুকে বরফের মতন জমাট বাঁধতে শুরু করল। মৃত্যু কেমন সুন্দর দেখতো! আগের থেকেই তো মৃত্যু শুরু হয়ে গেছে। যেতে যেতে যেতে একদিন যখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলে দিল, তখন দেখা গেল সেই অশ্বিনী—খগেন চ্যাটার্জীর বাবা উপরে গিয়ে বসে আছে, আরেক অশ্বিনী হয়ে গেছে। সেই অশ্বিনী উপরে যখন চলে যাচ্ছে, এদিকে তাকে আগুন দেবার ব্যবস্থা করছে। আমি তখন পঞ্চাশ মাইল দূরে ছিলাম—আর সেইখানে গিয়ে অশ্বিনী আমার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে— "বাবা, আমি এখন যাচ্ছি।" মৃত্যু হবার পরই অশ্বিনী আমার সঙ্গে দেখা ক'রে আমার অশীর্বাদ নিয়ে চলে গেল। আমি তাকে ব'ললাম—'অশ্বিনী, তুমি যাচ্ছ?' আমি তাকে আশীর্বাদ দিলাম, আশীর্বাদ নিয়ে সে চলে গেল। এই হ'ল আত্মার একটি রূপ। নিজের দেহের সমস্ত কণিকাগুলোকে যদি এক ক'রে এক বাঁধনে বেঁধে রাখা যায়, তবেই মৃত্যুর পর সে আবার এক হয়ে দেহ ধারণ ক'রে আশীর্বাদ নিয়ে কথা বলে উর্দ্ধলোকে চলে যেতে পারে এবং তার ইচ্ছাধীনে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাতায়াত করতে পারে। তার গতি অবাধ। নিজের ইচ্ছাধীনে যখনই তুমি গতি করে নিতে পারবে, তখনি তোমার ইচ্ছায় সব হবে। এইরকম সবাই কিন্তু যেতে পারে। তবে পারেনা কেন? দেখ, রাজা তো এক কোটি টাকা দান করলেন, আর সেই দান নিতে আসলো দুই কোটি লোক। তাতে সকলে আট আনা করে পেলো। তখন সকলেই রাজাকে গালি দিতে দিতে গেল—ভারী দান! পেলাম মাত্র আট আনা, যাতায়াতের খরচও উঠলো না। রাজা কিন্তু এক কোটি টাকা দান করলেন। কিন্তু

লোক বেশী হয়ে যাওয়াতে ভাগে পড়লো আট আনা। রাজা এই গালি শুনে চক্ষের জল ফেলছেন আর বলছেন—আমি এক কোটি টাকা দান করলে কি হবে, এত ভিখিরী হয়ে গেছে, তাই ভাগে পড়ছে আট আনা ক'রে। আমাদের এখানে কি হয়? এত চিন্তা চলছে মনে যে, কোন চিন্তার পাঁচটা একত্র হয় না। সব সময় চিন্তা চলছে, জাগ্রতেও চলছে, স্বপ্নেও চলছে। দেখা যাচ্ছে যে, এক কোটি নাম জপ করলেও জীবনভর যত কথা, যত কাজ, যত চিন্তা সকলে করেছে, সেই সবগুলিই তার দেহের থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা হয়ে এক জায়গায় জমা হয়ে আছে—যা আমি আগে বললাম। এখন সেই কথা, চিন্তা—জন্মের ওঁয়া ওঁয়া থেকে ৬০/৭০/১০০ বছর পর্যন্ত যে যত কথা, যত চিন্তা করেছে, বলেছে, সেই সবই ঐ ভিখিরী হয়ে আছে। এক কোটি মাত্র তো নাম জপ, তার থেকে ঐ ভিখারীরা কে আর কতটুকু পেয়েছে, এক পাই করেও তারা পায়নি। তার ফলে এক কোটি নাম জপতো একত্র হ'তে পারল না, তাই সব কণিকাগুলো মিলতে পারল না। জপটা করে কেন? তোমার জীবনের যতগুলি চিন্তা, যতগুলি কথা আছে, যারা আলাদা আলাদা কথা ও চিন্তা ছিল, সেইগুলিকে তোমাদের জপ দিয়ে একসঙ্গে যুক্ত ক'রে এক করে ফেল, যেমন অর্থ দিয়ে জিনিস কেন, কেনার পর সেই জিনিস তোমার হয়ে গেল, তেমনি জপতো পরমার্থ, এটাতো জান; সেই পরমার্থ দিয়ে তামার সব কথা এবং চিন্তাকে কিনে ফেল, তা হ'লে আর তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তোমার নাম জপ দিয়ে তাদের আটক করে রাখ। মনে কর, জন্মের দিনে ওঁয়া ওঁয়া থেকে ৭০/৮০/৯০ বছর বয়স পর্যন্ত পেন্সিল লুকানো, ফাঁকি দেওয়া, কৌশল, অফিস, একাউন্ট, কত কি জীবনভর ক'রেছ—অফুরন্ত, শেষ নেই তার। মোটেতো এক কোটি জপ! এত ভিখিরী হয়ে গেছে, তাদের মুখ কি ক'রে বন্ধ করবে? তাই যখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলে দিলে, তখন গিয়ে দেখলে, ভিখারীরাই বেশী হয়ে গেছে। যত মনন করেছ, সবই বাষ্পের মতন উড়ে গিয়ে জমা হয়ে আছে। ভাল-মন্দ যত চিন্তা, তার সাথে কণিকাগুলো বের হয়ে গেছে। মনের সাথে কণিকার সাথে এক যোগাযোগ। গঙ্গা যেমন মাটি-গোলা নিয়ে চলে যাচ্ছে—যেতে যেতে চর পড়ে যায়, তেমনি কণিকাগুলো চিন্তায় কথায় বা'র হচ্ছে। তার যখন কেউ থাকবে না, তখন দেখতে হবে সেই চরের মধ্যে কে কতভাগ রয়েছে। দেখা গেল, এক একজন, মনে কর পাঁচশত কোটি কথার এবং চিন্তার ছাপ, সবকিছু নিয়ে জমা হয়ে আছে এবং সব আলাদা আলাদা কথা, আলাদা আলাদা চিন্তা, তারা সবাই ভাগাভাগি হয়ে আছে, এক আর হ'তে পারেনি। তাই সেই ব্যক্তি আর অশ্বিনীর মত মৃত্যুর পর ঠিক নিজের দেহ ধারণ করতে পারেনি। সমস্ত কণিকাকে একত্র করতে পারলে তবেই মৃত্যুর পর দেহ ধারণ করে চলে যেতে পারে। আর যারা তা পারে না, ঐ পাঁচলক্ষ ভিখিরী, তারই দেহের তো সবই—সেই ভিখিরীরা সকলে মিলে তাকে টানে। সেই টানে সে পাকে প'ড়ে যায়—জন্মের পাক, তাই সে আবার ঘুরতে থাকে। পাঁচশত কোটির টানাটানিতে সে ভীমরুলের মতন একই জায়গায় ঘুরাঘুরি করে। তার মধ্যে অর্থাৎ সেই পাঁচশত কোটি ভিক্ষুকের মধ্যে ভীষণ চেতনা শক্তি থাকে, বুঝ থাকে—যখন সে সব বুঝতে পারে, দেখতে

পারে। সে আর যেতে পারছে না, কিন্তু দেখে—ঐ বাবা চলে যাচ্ছে, ঐ পিসেমশায় চলে যাচ্ছে, মেসোমশায় চলে যাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পারলে কি হবে, নিজে আর যেতে পারছে না। যেতে পারছে না, কারণ তার চিন্তা, তার কথা এইগুলিকে এক ক'রতে পারেনি, এক করতে পারলে সেও চলে যেতে পারতো। জীবিতকালে যখন বলেছে—"আমি কি করবো"—"আমার এত ঠেকা কিসের," "ও যা খুশি করুক", "আমি মানুষ ক'রেছি এখন ভুলে গেছে"—এই রকম যত কথা বলেছে, ঐখানে গিয়ে দেখতে পাবে, সেই কণিকাগুলি সেইসব কথা বলছে—"আমি মানুষ করেছি এখন ভুলে গেছে," "ওরা যা খুশি তা করুক", আর একটা বলছে, "আমার এত ঠেকা কিসের"? আর একটায় বলছে, "আমি কি করব" এই রকম সবটাই চলে গেছে। কারো সঙ্গে কারো কথা মিলছে না, সব আলাদা আলাদা আছে, তাই মিলতে পারেনি বলে মৃত্যুর পর দেহ নিতে পারেনি, তাই চলে যেতেও পারেনি। জন্মের ভিতর তারা ঘুরবে—এই হ'ল আত্মার আর একটি রূপ। জপটা হচ্ছে ধ্বনি, বেশী ক'রে জপ ক'রলে সব চিন্তাকে গিলে ফেলতে পারে। জপের ধ্বনির দ্বারা ঐ পাঁচশত কোটি চিন্তা এবং কথাকে টেনে আনতে পারে, টেনে এনে গিলে ফেলতে পারে। যেই গেলা হয়ে গেল, অমনি এক হয়ে গেল। এক হওয়ার সাথে সাথে মৃত্যুর পর দেহ নিয়ে তখনি হয়তো বলছে—"ঠাকুর, আমি যাচ্ছি।" লোকনাথ ব্রহ্মচারী যখন দেহ ছেড়ে চলে গেলেন,অশ্বিনী তখন চাকুরীক্ষেত্রে অন্যত্র ছিল। অশ্বিনী আগে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিল। লোকনাথ ব্রহ্মচারী বারদিতে দেহ রেখে তখনই তাঁর নিজ দেহ ধারণ ক'রে যেখানে অশ্বিনী ছিল সেইখানে গিয়ে বলে এলেন—তুই এখনি বারদি চলে যা। অশ্বিনী কিছুই বুঝতে পারেনি। গুরুর আদেশে তখনি সে বারদি গিয়ে দেখে, লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে ঘিরে সকলে কান্নাকাটি ক'রছে। এইভাবে সকলেই কিন্তু যেতে পারে না। পারছে না তার কারণ, পাঁচশত জনের টানাটানিতে এক দেহ থেকে আরেক দেহে দৌড়াদৌড়ি ক'রছে। তাই আর মুক্ত হয়ে যেতে পারছে না। পাকে নৌকা প'ড়লে যেমন ঘুরতে থাকে, তেমনি এক জীবনের মধ্যে যদি কেউ পাকে প'ড়ে যায়, তখন সে কেবল ঘুরতে থাকে। এই দেহের পরিবর্তন করে যে একত্র রাখতে পারে না, তার কারণ হ'ল—এত ভাগাভাগি হয়ে যায়—সবই তারই দেহের কিনা, তাই ভাগাভাগি হয়ে গেলেও একটা দেহই থাকে। সমস্ত কণিকাগুলি তোমারই। সেটা কি হয়েছে? ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার ফলে প্রত্যেকের কণিকাগুলো এইখানে থাকতে যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে পারেনি, সেইখানে গিয়ে ফুল ফুটে গেছে। যখন তোমার দেহে এইখানে কণিকাগুলো ছিল, তখন কলি হয়ে ছিল। যখন ওরা তোমার দেহ থেকে বার হতে শুরু ক'রল, তখন ফুল হয়ে ফুটতে আরম্ভ ক'রল। এত ফুল হয়ে গেছে—মনে কর ৫০০ কোটি ফুল হয়ে গেল। রামচন্দ্র হনুমানকে বললেন—"১০৮টা নীলপদ্ম নিয়ে এসো।" হনুমান সেখানে গিয়ে দেখে মোটে একটি পদ্মফুল ফুটে আছে। পাঁচশত কোটি ফুলের মধ্যে মাত্র একটি নীলপদ্ম ফুটে আছে। পাঁচশত কোটির মধ্যে এক একটা এক এক রকম ফুল। পাঁচশত কোটির মধ্যে পাঁচশত কোটি রকম ফুল। ১০৮ টা নীলপদ্ম আর যোগাড়

ক'রতে পারল না, পাঁচশত কোটি ফুলের মধ্যে ১০৮টা পদ্মও নাই। আর সবগুলি আগাছা, সে সব ফুলের নামও সে জানে না। অনেক খুঁজে মাত্র ৪/৫টি নীল পদ্ম হনুমান জোগাড় করে তার ছবি নিয়ে রামের হাতে দিল। বললো—'প্রভু! এই দেখ তোমার সৃষ্টির রহস্য। পাঁচ শত কোটি ফুল ফুটে আছে। সেখানে ১০৮টা নীল পদ্ম কিছুই নয়। কিন্তু মোটে ৫/৬টি নীল পদ্ম মিলতিতে আছে, আর সবগুলি ফুল আলাদা আলাদা।" রাম বললেন—এই হ'ল আত্মা। মিলতে পারেনি বলেই পাঁচশত কোটি ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার ফলে ব্যক্তিত্ব সব আলাদা হয়ে গেছে। সবার ব্যক্তিত্ব যদি একত্র রাখতে পারতো, তবে নিজের রূপ ধারণ করে গ্রহে যাতায়াত করতে পারতো, ইচ্ছাধীন গতি হতো, কথা বলতো, মিলনের সুরে মিলতে পারতো। পারেনি বলেই ঘুরছে। জীবিত অবস্থায় তার দেহের থেকে কণিকাগুলো প্রতি মুহূর্তে চলে যাচ্ছে। এই যে কথাগুলো আমি বললাম, সাথে সাথে কণিকাগুলো চলে যাচ্ছে। তোমরা যে বসে শুনছো, তাও তোমাদের কণিকা সাথে সাথে চলে যাচ্ছে। গিয়ে যখনি সব একত্র হয়ে মিশবে, তখন সবাই আবার মিলনের সুরে মিলিত হয়ে এই রকম ঐখানে কথা বলবো, একদিন সবাই ঐখানে গিয়ে মিলিত হবো। তখন দেখবে, এইভাবে তোমরা বসে আছ আর আমি কথা বলছি। এই একই রকম দেহ নিয়ে সবাই মিলিত হবো। সেখানেও এক জীবন্ত অবস্থা। ঠাকুর কথা বলছেন আর তোমরা বসে শুনছ। ঐ আলাদা আলাদা কণিকাগুলো জোড়া হ'তে কত জপ প্রয়োজন হবে?—জীবনভর যত কথা, যত চিন্তা করেছ, জপ তার থেকে বেশী হওয়া চাই। মনে কর পাঁচশত কোটি কথা এবং চিন্তা তোমার আছে, জপ তোমার পাঁচশত কোটি এক, পাঁচশত কোটি দুই যেই হবে, অমনি তোমার ভিতরে ফুটতে থাকবে, অদ্ভুতভাবে তখন স্ফূরণ হবে।

জন্মগত যাঁরা, তাঁরা ঐগুলিকে জোড়া দিতে শুরু করেন। পাঁচশত কোটি জোড়া দিয়ে এক করবার চেষ্টা করেন। সব ডোবা কেটে এক ক'রে দেন।

আত্মাটা যে এমনি ফস্ ক'রে বেরিয়ে গেল তা কিন্তু নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা আকারে দেহ থেকে বা'র হ'তে থাকে। তার প্রমাণ হ'ল, মৃত্যুর সাথে সাথে যখন দেহের পরিবর্তন হয়, তখন এই দেহ আর থাকে না, দেহ পচে নষ্ট হয়ে যায়। নতুন দেহের পরিবর্তনে দেহ যেমন পঞ্চভূতে মিশে যায়, তেমনি কণিকার পরিবর্তন হ'ল—ওটাই তার মৃত্যু, ওটাই শেষ। শেষ হয়ে যাবার পর পঞ্চভূতে মিশে যায়। জীবন্ত অবস্থায় পঞ্চভূতে মিশে কণিকা হয়ে তার প্রতিটি সত্তা নিয়ে কলি আকার থেকে ফুটে ফুটে বা'র হয়ে যায়। এই যে আত্মাটা, এটা এই যে চ'লে যাওয়ার পদ্ধতিতে যাচ্ছে, সেটাকেই কীর্তন বা জপ বা গুরুর আশীর্বাদ বা গুরুগত প্রাণ বা দেবগত প্রাণ যাদের থাকে, তাদের এগুলো ক্রমশঃ ক্রমশঃ বেঁধে যাবার চেষ্টা করে। একটা বিরাট চুম্বকের আকর্ষণে সবাই চুম্বকে পরিণত হয়, চুম্বকের সাথে চুম্বকত্ব হয়ে যায়, চুম্বকত্ব হয়ে গেলেই সে তখন এক হয়ে যায়। তাই একজন মহান জীবন্ত থেকেও দেহ থেকে বা'র হয়ে দূরে গিয়ে কথা বলে আসেন।

আত্মার আর একটি রূপের কথা বলি—সূক্ষ্ম কায়ই হচ্ছে সমস্ত বস্তুর, সমস্ত পদার্থের

সার। সেই আত্মা বা চৈতন্য যদি এই পৃথিবী থেকে তৈরী করে না পাঠাও, শরীর ছেড়ে চলে গিয়ে যদি তৈরী হতে চাও, তবে কিন্তু ঠকবে। যা করার এখান থেকেই ক'রে যাবে। বিরাট বিরাট মহানরা, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না এতবড় মহান, তাঁরাও নিজেকে তৈরী করার জন্য মাঝে মাঝে পৃথিবীতে এসে জন্ম নেন আরো বড় হওয়ার জন্য। এই পৃথিবীতে তাঁরা এসে তাঁদের রেকর্ড ঠিক রেখে চলে যান। তোমরা শূন্য থেকে যখন এসেছ, শূন্যেই যখন আবার যেতে হবে, তখন শূন্যে আশ্রয় নেবার মতন তৈরী হ'য়ে যেতে হবে। তৈরী হলেই তোমাদের সব জিজ্ঞাসার সমাধান হয়ে যাবে। তৈরী না হয়ে গেলে আত্মাগুলি বড় ছুট্‌ফাট্‌ করে, সেই সব আত্মার যে কি রকম দুঃখ! কখনো কখনো আত্মা এসে আমার সঙ্গে দেখা করতো, তাদের যাতে দুঃখ দূর হয় তার জন্য আসতো। একবার হয়েছে কি, আমি সন্ধ্যাবেলা ঘরে বসে আছি, আমার কাছে কয়জন ভক্ত-শিষ্য বসে আছে। আমি কথা বলছি তাদের সাথে। এমন সময় লালপেড়ে শাড়ি প'রে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। সেই স্ত্রীলোকটির স্বামীও তখন আমার কাছে ব'সে আছে। একজন ব'ললো—প্রভু! একটি স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ওর স্বামী তখন তার স্ত্রীকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। আমি তখন তাকিয়ে দেখেই ব'ললাম—ঐ স্ত্রীলোকটির ফাঁসিতে মৃত্যু হয়েছে, এখনো ওকে নামানো হয়নি, এখনো ফাঁসে ঝুলছে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা এসে দাঁড়িয়ে আছে, আত্মা হয়েই চলে এসেছে উদ্ধারের জন্য। প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ কাজ ক'রে ওর আত্মা আটকে গেছে এবং ও এখন তা বুঝতে পারছে।

যারা দেহ ছেড়ে গেছে অথচ নিজেকে তৈরী করে নিতে পারেনি, তারা যাবে কোথায়? একদিন দেশের বাড়ীতে থাকতে আমি এক আত্মীয়ের বাড়ী গেছি। বাড়ীতে তাদের পিসিমা মারা গেছে চল্লিশ বছর হ'ল, সেই পিসীমা জলে ডুবে মরেছিল। সেই পিসীমা মাঝে মাঝে এসে তাদের দেখা দেয়। একদিন এসে জল চেয়েছে। দেখ, চল্লিশ বছর হ'ল মারা গেছে, এই চল্লিশ বছর ধরে ঘুরছে, কারণ বিদেহী হয়ে গেলে তার মুক্তির পথ খুঁজে পায় না। দেহের ভিতর দিয়ে ভগবান হওয়া যায়, শিব হওয়া যায়, বিষ্ণু হওয়া যায়। কি অদ্ভুত দেখ, দেহের কত বড় মূল্য! কিন্তু দেহের অতীত হয়ে গেলে তখন কোন সাধনা নেই, কেউ রক্ষা করতে পারে না।

সেই আত্মা হচ্ছে ঃ—আকাশের তো কোন সাড়া নেই, এমনি কোন সাড়া খুঁজে পাবে না। আকাশের সাড়া জন্মের ভিতর দিয়ে, আকাশের সাড়া জীবনের ভিতর দিয়ে। আকাশের মতন আত্মা হয়ে গেলে স্বাদ-সাড়া নেই, সুতরাং সে তখন কোন স্থান করে নিতে পারছে না। তাকে যদি স্থান ক'রে নিয়ে যেতে হয়, তবে তাকে আবার জন্ম নিতে হবে। জন্ম তার নিতেই হবে। যাক্—সেই পিসীমা এসে জল চেয়েছে। আমাকে এসে তারা বলতে আমি এক ঘটি জল স্পর্শ ক'রে দিয়ে বললাম—এই জল ছিটিয়ে দাও। সেই জল ছিটিয়ে দেওয়াতে বিকট হেসে সেই সে চ'লে গেল, আর অসে নি। চিন্তা ক'রে দেখ, আত্মা হয়ে কি অবস্থা নিয়ে আছে। মাঝেমাঝে সেই পিসীমা এসে ব'লতো—আমি আর এ দুঃখ সইতে

পারছি না। আপন জনের কাছে এসে দেখা দিত।

প্রত্যেকের জীবনে কিন্তু এই অবস্থা ঘটতে পারে। প্রত্যেকে যখন বা'র হবে তখন বুঝবে—বা'র হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঐ ভাবে যারা যায়, আসা যায় না, শব্দ শুনতে পারেনা,অদ্ভুত হয়ে যায়। প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ ক'রে দেহ ছাড়লে আটক হয়ে থাকে। কোটি কোটি আত্মা এই ভাবে ঘুরছে, আত্মার ঝড় হচ্ছে, লড়াই হচ্ছে, সেখানে আর্ত্তনাদ, সেখানে উন্মাদনা, সেখানে রোল, সেখানে বোল, সেখানে চিৎকার, সেটা একটা পিশাচের মতন জায়গা। সেই জায়গা থেকে কিছুতেই আসতে পারছে না। তাদের কান্না, তাদের দুঃখ, তাদের আর্ত্তনাদ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যতদিন না সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে পারবে, ততদিন পর্যন্ত এই ব্যতিক্রমের মাঝ দিয়ে বার বার ঘুরছে,—যাচ্ছে-আসছে।

দেখ, গরুকে যদি ভুষি, খৈল, খড়, ডালসিদ্ধ খাওয়াও তবে গরুর দুধ ঘন আঠা হবে, আর যদি কচুরিপানা খাওয়াও, তবে দুধ পাত্‌লা ও ছ্যাড়াছ্যাড়া হবে। দেখা যায় খাওয়ানোর ব্যতিক্রমে দুধ পাত্‌লা বা ঘন হয়। সেই রকম কর্মের মাধ্যমে আত্মার মাত্রাও ছ্যাড়া ছ্যাড়া আত্মা, ঘন মাত্রার আত্মা—অর্থাৎ সুকর্মের আত্মা আর খারাপ কাজের আত্মা, দুটোর প্রভেদ অনেক। এখানকার কর্ম-পদ্ধতির উপর আত্মার মাত্রাগুলো নির্ভর ক'রছে। এখানকার কর্ম পদ্ধতি যে যত বেশী সুন্দর সুষ্ঠুভাবে প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে নিয়ম রেখে চালাতে পারবে, তার আত্মা তত সুন্দর সুষ্ঠুভাবে চলে যাবে। আর খারাপ কাজের আত্মাগুলি তখন আট্‌কে থেকে চিৎকার পাড়তে থাকে—এ-হে-হে! কি সর্বনাশটা ক'রে এসেছি, আকাম করতে গিয়ে এখন আট্‌কে পড়েছি, ত্রুটি ক'রতে গিয়ে এখন ত্রুটির প্যাঁচে আট্‌কে পড়েছি! তখন ওরা পৃথিবীর জন্মটা চায়, পৃথিবীতে জন্ম নিতে চায়। আগে যখন পৃথিবীতে ছিল তখন জন্মের মূল্যটা বুঝতে পারেনি। এখন বিদেহী হয়ে ওরা জন্মের মূল্য বুঝতে পারছে আর চিৎকার পাড়ছে 'জন্ম দাও' 'জন্ম দাও' ব'লে। বিদেহী আত্মাগুলি মহাকাশে ঘোরাঘুরি ক'রছে, মৃত্যুর পরের অবস্থা বড় শোচনীয়! তারা চিৎকার ক'রে পৃথিবীতে যারা দেহ নিয়ে আছে তাদের ব'লছে— তোমরা ভাগ্যবান, তোমরা ভাগ্যবান, এই জন্মটাকে সার্থক কর। আমরা আগে বুঝতে পারিনি, আকাম ক'রতে গিয়ে এখন আটকে আছি। আমরা আবার জন্ম নিতে চাই। আত্মাগুলি ঐ ভাবে থাকতে চায় না, কারণ ঐভাবে সিদ্ধিও হয় না, মুক্তিও হয় না। দেহী থাকা কালে যা বুঝতে পারেনি, বিদেহী হয়ে জন্মটার মূল্য বুঝতে পারছে। জন্ম নিয়ে কাজ ক'রে ৬০/৭০/৮০/ বছরের জীবনের মধ্যেই সিদ্ধি মুক্তি সব হয়। তাই আত্মাগুলি চিৎকার করে জন্ম নেবার জন্য। ঐ আত্মাগুলি ঐভাবে পঞ্চাশ/ষাট/সত্তর/হাজার/লক্ষ বছর পর্যন্ত থাকতে পারে আট্‌কে। তারা বিদেহী হয়ে গেছে। বিদেহীতে কোন কাজ হয় না, জন্ম না নিলে কাজ হয় না। জন্ম যে কত বড় সার্থক! কিন্তু জন্মের লাইন তারা সহজে পায় না। ন্যায় অন্যায় যে কোন্‌টা, সেটা এমনি কোন সংজ্ঞায় নেই। ন্যায়-অন্যায়টা সবার বুদ্ধিবৃত্তির উপরে ন্যস্ত রয়েছে। জিহ্বায় কি দিতে হবে না-হবে, সেটা আমাদের বলার আগেই জিহ্বা নিজে সচেতন। জিহ্বাতে একটা চুল পড়লে তোমার বোঝার আগেই জিহ্বা

সেটা থুঃ ক'রে ফেলে দেবে। প্রকৃতির নিয়মে তোমাদের সকলের মধ্যে একটা সজাগ ব'লে যে জিনিস দিয়েছে, সেই সজাগ প্রতি মুহূর্তে ন্যায়-অন্যায় কোন্টা তা তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। তোমরা যেই কোন কাজ কর না কেন, যদি তার মধ্যে ত্রুটি থাকে, তোমাদের ভিতরের সজাগ তখনি তা জানিয়ে দেবে। জিহ্বায় চুল প'ড়লে সজাগ হওয়া সত্ত্বেও যদি তুমি জিহ্বার বারণ না শুনে সেই চুল জোর ক'রে গিলে ফেল, তবে তোমার অসুখ ক'রবে। তেমনি সজাগওয়ালা তোমার ভেতর থেকে জানিয়ে দেবে কোন্টা ন্যায় আর কোন্টা অন্যায়; মন তোমাকে সব সময় সচেতন ক'রে দেবে! তবু যদি তুমি মনের সচেতনকে উপেক্ষা ক'রে তার বারণ না শোন, তারপরেও যদি সেটা কর, তবে তুমি ত্রুটির প্যাঁচে প'ড়ে যাবে। এই আত্মার আলাদা ধরণ, আলাদা রূপ। আমরা যে কাজ ক'রছি, জপ-ধ্যান ক'রছি—এই অবস্থার মধ্যে যাতে পড়তে না হয় তার জন্যই। এই অবস্থায় প'ড়লে বড় দুঃখ। চ'লে যখন যেতে হবেই, তখন তোমরা যাতে তোমাদের ইচ্ছাধীন গতি ক'রতে পার, তার জন্যই নাম-জপ। যখনি নিজের ইচ্ছায় গতি ক'রতে পারবে, তখনি তোমাদের ইচ্ছায় সব হবে। তাই সাধনা হ'ল, সচেতনের উপর নির্ভর ক'রে চেতন হয়ে যদি সবাই চ'লতে পারে, তবে কেউ কোন ত্রুটির মাঝে পড়তে পারে না। ঐ আত্মার মতন ঘটনা যে সবার ঘটতে পারে, তা সামাল না দিলে কেমন ক'রে চলবে! এখন থেকে যদি তৈরী না হওয়া যায়, সময় তো ঘনিয়ে আসছে! সুতরাং প্রত্যেকে যদি সম্বল না রাখ,পাথেয় যদি না নাও, এর চেয়ে ব্যথার আর কিছু নেই। এই যে আত্মাগুলি, কোটি কোটি আত্মা বাতাসের ভিতর এই যে সব চ'লছে, এর মতন দুঃখ আর নেই। এই হিল্লায় কেউ প'ড়ে গেলে দুঃখের আর সীমা থাকবে না। ঐ হিল্লায় যাতে না প'ড়তে হয়, সেজন্য কি ক'রতে হবে? বাঁধুনি ক'রে বাঁধতে হবে যাতে এই পাসপোর্টটি নিয়ে, এই সুরটা নিয়ে তোমরা এগিয়ে যেতে পার। সুরটা নিতে গেলেই এই নাম-জপ-কীর্তন, গুরুর আদেশ-নির্দেশ, গুরু যে ছাপ দেবেন সেইভাবে কাজ ক'রবে—দেখবে, সুন্দর, স্বচ্ছ ভাবে চ'লে যাচ্ছে। বড় মধুময় জীবন, মধুময় স্বাদ নিয়ে যাবে।

দেহ থেকে চৈতন্য চ'লে গিয়ে আত্মা হয়, সেই আত্মায় বুঝ-জ্ঞান-মন-বুদ্ধি সব থাকে, কিছুই তার নষ্ট হয় না। সব নিয়েই চৈতন্য চ'লে গেল। কোথায় গেল? মনে কর, একটি শিশুকে খুঁজে পাচ্ছ না;তুমি মনে জানছ শিশুটি এই সীমার মধ্যেই কোথাও আছে, তারপর তাকে পেলে। চৈতন্য যখন চ'লে যায় তখন তাকে খুঁজে না পেলেও সে এইখানেই আছে অর্থাৎ একটা সীমাবদ্ধ জায়গা—'স্তর' আছে, তার মধ্যেই চৈতন্য আছে, সে আবার নূতন-রূপে জন্ম নিচ্ছে। এই হ'ল আত্মা এবং তার স্তরে স্তরে রূপ—এই হ'ল আত্মার আর একটা রূপ।

প্রশ্ন ঃ—অবতাররা পৃথিবীতে কেন আসেন? আপনি বলেছেন—জন্মই হচ্ছে মুক্তির পথ—এটার অর্থ কি?

উত্তর ঃ—ষট্‌চক্র অর্থাৎ সপ্তচক্র, সপ্তচক্র যেখানে শেষ, সেই সহস্রারের উপরে অষ্টমগর্ভে কৃষ্ণ জন্ম নিলেন। সহস্রারের উপরে হাজার হাজার সূর্য ধূলিকণার মতন ছড়িয়ে

আছে। তার উপরে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। কৃষ্ণ কত শক্তি নিয়ে এসেছিলেন—ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য তিনি কত রাজনীতি, কত ছল, কৌশল অবলম্বন করেছেন। সবটাতেই তিনি ছিলেন। কৃষ্ণকে কেউ বলতো শয়তান, কেউ বলতো ম্যাজিসিয়ান, কেউ বলতো মানুষ, আবার কেউ বলতো ভগবান। সেই কৃষ্ণ যাঁর এতো শক্তি, তিনি সাধারণের সঙ্গে সাধারণ হয়ে থাকতেন, সবার সঙ্গে মিশতেন। তাঁর ভিতরে জ্ঞান, প্রেম, ভালবাসা সব ছিল। কৃষ্ণ একদিন এক ভক্তের বাড়ী গিয়েছিলেন। সেই ভক্তটি কৃষ্ণকে কত যত্ন ক'রে, পূজা ক'রে ভোগ দিল। কৃষ্ণ আসার সময় ব'লে এলেন—তোমার একমাত্র পুত্রটি মারা যাক। পরে ভক্তের ছেলেটি মারা গেল। কত লোক কৃষ্ণকে কত নিন্দা করতে লাগলো। অর্জ্জুন পর্যন্ত কৃষ্ণের উপর রেগে গেল। সে কৃষ্ণের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে, কৃষ্ণ বলছেন—অর্জ্জুন, রাগ ক'রে চলে যাচ্ছ কেন? শোন! অর্জ্জুন ব'লছে—তুমি এমন, তোমাকে কত ভোগ, কত পূজা দিল, আর তুমি কিনা তার একমাত্র পুত্রকে মারা যেতে বললে? কৃষ্ণ বললেন—অর্জ্জুন, আমি কেন বলেছি, তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ?—না, তা আমি বুঝতে পারি নি। তখন অর্জ্জুনের মাথায় কৃষ্ণ হাত রাখলেন। সেই স্পর্শে অর্জুন কেবল লাফাতে লাগল আর চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো—আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। ভূত-প্রেত সব আমার চারিদিকে, বাঁচাও—বাঁচাও।

তখন কৃষ্ণ আবার অর্জ্জুনকে স্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুন সুস্থ হয়ে দাঁড়ালো। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন—অর্জ্জুন, তুমি যে লাফাচ্ছিলে আর চিৎকার পাড়ছিলে, তোমাকে দেখে কত লোক হাসছিল, কত লোক বলছিল—পাগল হয়ে গেছে, মাথায় জল ঢাল। তুমি যে ভূত প্রেত দেখ্‌ছিলে, তোমার কাছে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা তার কিছুই দেখতে পায়নি। তাই তারা তোমার মাথায় জল ঢালতে চেয়েছিল। অর্জ্জুন বলছে—ওরা কিছু দেখতে পায় নি?—না, ওরা তোমার লাফানি আর চিৎকার করা দেখে হাসছিল, তোমার মাথায় জল ঢালতে চেয়েছিল। তবেই তুমি বুঝে দেখ, তুমি যা দেখ্‌ছিলে, আর সকলে তা দেখতে পায় নি। তা'হলে আমি যা দেখতে পাই, তোমরা তা দেখতে পাওনা। এখন বুঝতে পেরেছ?—হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারলাম। কৃষ্ণ বললেন—ঐ ভক্তের একটি মাত্র ছেলে যদি মারা যায়, আমি দেখলাম তা হ'লে আর ওর জন্ম হবে না; ঐ একটি জায়গাতে ও আটকে আছে। ছেলেটির শোক ও পেল বটে, কিন্তু ঐ আঘাতেই ওর আর জন্ম হবে না, ঐ ভক্তটি মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি ঐ ছেলেটিকে আমি রাখতাম, তবে ঐ ভক্তের আরও বিশ হাজার জন্ম হতো। বিশ হাজার জন্ম নিলে এক এক জন্মে একটা ক'রে হলেও বিশ হাজার ছেলে ওর মারা যেত। এই জন্মে যদি একটা ছেলেকে মেরেই ওর বিশ হাজার ছেলে আর না মরে এবং বিশ হাজার জন্ম আর না হয়, সেইটা ভাল, না এই ছেলেকে রেখে বিশ হাজার জন্ম হওয়া, সেইটাই ভাল। অর্জ্জুন বলছে—না, বিশ হাজার জন্মের থেকে এক জন্মেই মুক্ত হওয়া—সেটাই ভাল। কৃষ্ণ বলছেন—আমি তো তাই-ই করে দিলাম। —তখন অর্জ্জুন কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চাইল।

দেখ, অবতার যাঁরা, ভগবান যাঁরা, তাঁরা, অনেক পৃথিবী আছে—সেই সেই পৃথিবীতে এক এক জন অনেক শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন সাধারণের ঘরেই আসেন এবং সবার সঙ্গে সাধারণ হয়ে মেশেন এবং নরদেহ ধারণ করেন বলে তাঁরাও রোগ, ব্যথা, যাতনা ভোগ করেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে রোগ যাতনা দূর করে খুব ভালভাবে সুস্থভাবে থাকতে পারেন। কিন্তু নিজের শক্তি নিজের জন্য ব্যয় করা নিষিদ্ধ, তাই তাঁরা তা করেন না। কত ভক্ত এসে তাঁদের ধরে—আমার এই ক'রে দাও, সেই করে দাও, অসুখ সারিয়ে দাও, কত রকম এসে বলে। সেই ক্ষেত্রে তাদের কিছু না ক'রলে সেখানেই ভুল বুঝাবুঝি হয়। অবতার যাঁরা, তাঁরা এটা-সেটা ক'রে পাশ কাটিয়ে যান। তিনি ইচ্ছা ক'রলে তাঁর ভক্তকে সোনার পালঙ্কে আনন্দে রাখতে পারেন, তবে পাশ কাটিয়ে যান কেন? যদি তাদের ব্যথা-বেদনা দূর ক'রে দেন, তবে তাদের আবার হাজার হাজার জন্মের মধ্যে ঘুরতে হবে।

অবতাররা কেন আসেন? তাঁরা আসেন সবাইকে মুক্তি দিতে, সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। তাঁদের মায়া, মমতা, স্নেহ সব আছে। তাঁরা দেখেন, এই জন্মটায় যদি তাদের ব্যথা বেদনায় রেখে দিয়ে একেবারেই পার ক'রে দিতে পারি, যাতে আর এই ছকের মধ্যে বার বার ঘুরতে না হয়, তাই তাঁরা এটা-সেটা বলে পাশ কাটিয়ে থাকেন। ভক্তরা সেটা জানতে পারে না। তারা বলে—প্রভু বাঁচাও, রক্ষা কর, তারা কান্নাকাটি করে। আর অবতার যাঁরা, তাঁরা দু'হাত বাড়িয়ে তাদের বলেন—ওরে, তোরা আমার বুকে আয়, তোদের আমি বুকে ক'রে নিয়ে যাবো, একটু তোরা সহ্য কর।

তোমাদের ঠাকুরকেই কতজনে বলে—ঠাকুর, এতজনকে ভাল ক'রছেন, আমাকে ক'রলেন না! এই জায়গাতেই হয় ভুল বুঝাবুঝি। আমি যেটা দেখছি, তারা সেটা দেখতে পারে না। তাদের দেখিয়ে দিয়ে দিয়ে কাজ করান যায় না। সবাইকে যদি দেখাতে যাই, তবে কাজ হবে না—সেটা সম্ভবও নয়।

এক গ্লাস জল—যদি যন্ত্র দিয়ে দেখ, তবে দেখতে পাবে অজস্র পোকা কিলবিল ক'রছে। তখন যদি বলে—'এই জলটা খেয়ে নাও'—তবে সে তখন ঐ জলটা খেতে পারবে না। কেন পারবে না? জলে অজস্র অজস্র পোকা রয়েছে। কলসী থেকে আবার জল ভ'রে নিয়ে খেল, সেই জলটা সে দেখতে পায়নি তাই।

মহান যাঁরা, তাঁরা সব দেখতে পারেন। তাঁদের কথাই যথেষ্ট। একজন দুধ খাবে, গ্লাসে ক'রে দুধ দেওয়া হ'ল। তখন সে বলছে—আমি আগেই দুধ খাবো না,আগে গরুটা দেখবো। গরুটা দেখে বলে—গরু কি খায় সেটা আগে দেখব। ঘাস দেখে বলে—কোন্ মাঠে ঘাস হয় সেই মাঠ দেখবো। মাঠে গিয়ে কেমন ক'রে ঘাষ গজায় বসে বসে দেখছে। দু'তিনদিন পরে খেয়াল হ'ল আমি না দুধ খাবো? তখন সেই দুধ খেতে এসে দেখে দৈ হয়ে গেছে, আর বড় বড় পোকা তাতে কিলবিল করছে। তখন বলছে—দুধে এগুলো কি করে এলো? বলে হ্যাঁ, এগুলো দুধেই ছিল। তাই বলছে—বেশী দেখতে যেওনা, তবেই ঠক্‌তে হবে।

অবতার যাঁরা, তাঁদের কাছে কিছু চাইতে নেই, শুধু তাঁদের আদেশ-নির্দেশ পালন ক'রে যাও। তাঁরা না করলেও, যেটুকু তাঁরা দিচ্ছেন তাতেই অশেষ কল্যাণ হ'চ্ছে। দেখ, সাগর হ'ল দেবতা, সাগরকে কতজনে পূজা করে; মরুভূমিতে যেমন জলতেষ্টা পেলে জল না খেতে পেয়ে মারা যায়, সাগরও ঠিক তাই—মরুভূমিরই মতন, সাগরে থেকেও জল না খেয়ে মারা যায়। অতবড় সাগর, অত জল, অথচ তিনি দিতে পারছেন না। দেবতা বলছেন, সাগর বলছেন,—ওরে, তোদের আমি দিতে পারছি না, আমার এত শক্তি থাকা সত্ত্বেও, এত জল থাকা সত্ত্বেও তোদের আমি তৃষ্ণা মেটাতে পারছি না! কিন্তু আমি না মেটালেও আমারই দেওয়া, আমারই দান তোদের ছিটেফোঁটা যেটুকু দিয়েছি—গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা, খালবিল, নদী, ওসব তো আমারই দান; আমার সেই দানেই তোদের তৃষ্ণা নিবারণ হবে, তাতেই তোরা আনন্দ পাবি।

সৃষ্টির সাথে সাথে স্রষ্টা সবকিছু পূরণ ক'রে দিয়েছেন। স্রষ্টা তাঁর কাছে সবাইকে নেওয়ার জন্য নিজেই যে কত ব্যাগ্র!—একজন ঋষি ধ্যানে বসে ভগবানকে ডাকছেন। ডাকতে ডাকতে বিষ্ণু এসে দেখা দিলেন। বললেন—তুই কি চা'স আমার কাছে? ঋষি বললেন—তুমি যখন আমার ডাকে এসেছ, তখন আমাকে এই দাও—এই বড় একখানা পাথর আছে, এই পাথরে তোমার পায়ের ছাপ দিয়ে দাও। তোমার এই পায়ের ছাপের মধ্যে যার পিণ্ড দান করা হ'বে সে যেন উদ্ধার হয়ে যায়, মানুষ যেন এইভাবে উদ্ধার হয়ে যায়। বিষ্ণু তখন সেই পাথরে পায়ের ছাপ দিয়ে দিলেন,—কত সহজে মুক্তির পথ ক'রে দিলেন! সেই পায়ের ছাপে কত যুগ যুগ ধরে মানুষ পিণ্ড দিচ্ছে—রাম, দশরথ, তার বাবা, তার বাবা সবাই এই পদচিহ্নে পিণ্ড দিয়েছেন।

মহাপ্রভু গিয়েছেন ঐ পদচিহ্ন দেখতে। তিনি যখন ঐ পাথরে হাত রেখেছেন, তখন তাঁর হাত পাথরে টেনে রেখেছেন, যেন মহাপ্রভুকে বুকে টেনে নিচ্ছেন। মহাপ্রভু সেই পাথর জড়িয়ে ধরে আছেন আর ডেকে বলছেন—তোরা দেখ্, আমার হাত এই পাথরে টেনে রেখেছে। মহাপ্রভুর কথা শুনে সেখানকার পাণ্ডারা দেখতে এসেছে। তারা দেখে, মহাপ্রভু পাথরে হাত দিয়ে বসে আছেন। হাত যে টেনে রেখেছে, তা আর পাণ্ডারা দেখতে পাচ্ছে না।

মহাপ্রভু বলছেন—জীবের মুক্তির পথ কত সহজ! কত ভাগ্যে যে জন্ম হয়, জন্ম না নিলে মুক্ত হওয়া যায় না। জন্মই হচ্ছে মুক্তির পথ। বিদেহী যারা, তারা জন্মের জন্য পাগল হয়। লক্ষ লক্ষ আত্মা বিদেহী হয়ে ঘুরছে। তারা চিৎকার পাড়ছে—আমাদের জন্ম দাও, জন্ম দাও। তারা এই জীবলোককে দেখছে আর বলছে—ওরা কি ভাগ্যবান, মাত্র ষাট-সত্তর-একশত বছরের ভিতরেই ওরা মুক্ত হয়ে যেতে পারে! তারা আপশোষ ক'রছে—এত অল্প সময়ে মুক্ত হওয়া যায় আর আত্মাগুলি ষাট হাজার বছর, সত্তর হাজার বছর, লক্ষ বছর ঘুরছে! মহান যাঁরা, তাঁরা তাদের আর্তনাদ শুনতে পান। তারা আর্তনাদ করছে জন্ম নেওয়ার জন্য। তোমাদের যদি কখনো দৃষ্টি খুলে যায়, তবে দেখতে পাবে—লক্ষ লক্ষ , কোটি কোটি আত্মা ঝড়ের মতন ঘুরছে। তারা জীবলোককে বলছে—তোমরা ভাগ্যবান।

যে যত অল্পায়ু, সে তত ভাগ্যবান। আগের দিনে ষাট হাজার বছর, সত্তর হাজার বছর লোকে বাঁচত। আর এখন ষাট-সত্তর বছর, একশত বছর বাঁচে। আগে কি তারা এখনকার থেকে বেশী কিছু ক'রতে পেরেছে? মনে হবে, তারা বুঝি এখনকার তুলনায় নাতি, পুতি, ঘুতি—তারপর আরো কত কি দেখতো। কিন্তু তা তারা দেখতে পেত না। ঐ এখনকার মতনই নাতি, পুতি পর্যন্তই দেখেছে। এত দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকা কি যন্ত্রণা! ভগবানকে দেখার পক্ষে, ভগবানকে পাওয়ার পক্ষে একদিনই যথেষ্ট। তোমাদের চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে,আর যে ক'টা দিন থাকবে, ভগবানকে পাওয়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট। মনে কর কালকে এক জনের শ্বাস বন্ধ হবে। এই যে একটা দিন আছে, এই এক দিনেই সে ভগবানকে দর্শন ক'রতে পারে, ভগবান দর্শনের জন্য ষাট হাজার, সত্তর হাজার বছরের দরকার হয় না।

মানুষ হ'ল ভগবানের দ্বারী, ভগবানের দরজায় দ্বারী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে কি করছি? সেই দ্বারের সামনে দাঁড়ি টেনে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছি, আর এখানকার ইন্দ্রিয়ের চাহিদায় নেশাখোরের মতন সাময়িক নেশায় রয়েছি, আর এই ছকের ভিতর বার বার ঘুরছি আর জন্ম নিচ্ছি। এই ইন্দ্রিয়ের নেশাকেই সুখ বলে মনে করছি। সাময়িক সুখের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছি,, আর বার বার ছকের মধ্যে পড়ে ঘুরছি, যাচ্ছি আবার আসছি। এই যে ছকের ভিতরে পড়ে যাওয়া-আসা, এটা একটা এমন ব্যাধি, এ ব্যাধি ডাক্তারে সারাতে পারে না। এ ব্যাধি একমাত্র সারে নাম জপে, গুরুর আদেশ পালনে, গুরুগত প্রাণে, গুরুর আজ্ঞা বহনে।

সন্তানের জন্য মা-বাবা কত চিন্তা করে,—কিভাবে মানুষ হবে, কোন্ স্কুলে দেব, কোন্ কলেজে পড়াব। সন্তান কিন্তু তার নিজের জন্য একটুও ভাবে না। সে খেলা ক'রতেই ভালবাসে, পড়াশুনা ক'রতে সে চায় না। কিন্তু মা-বাবা তার জন্য ভাবে—কেমন করে লেখা পড়া শিখাব? আমরা স্রস্টার সন্তান—আমাদের জন্য ভাবি না। কিন্তু স্রষ্টা আমাদের জন্য কত ব্যাকুল—কিভাবে আমার সন্তানদের আমার কাছে নিয়ে আসবো, কিভাবে তারা আর ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে ঘুরবে না ইত্যাদি। স্রষ্টা যে আমাদের জন্য কত ভাবছেন, তা ভাষায় বলা যায় না! আর আমরা কি করছি? সাময়িক খেলায় মেতে আছি।

তোমরা আর কিছু নয়, সব সময় জপ ক'রবে। এই যে কীর্তন ক'রলো, এই নাম মহাপ্রভু দ্বারে দ্বারে ক'রে গেছেন,—সেই নাম আকাশে বাতাসে আজও ভাসছে।

কৃষ্ণ বলেছেন—যেখানে আমার নাম, আমার তত্ত্ব হ'বে সেইখানেই আমি থাকবো। তাই নামের মধ্যে কৃষ্ণ আজও জাগ্রত হয়ে রয়েছে, তাই নামেতে মুক্তির পথ সহজ হয়ে রয়েছে। তিনি তাঁর কথার মধ্যে বাঁধা রয়েছেন। তাই নাম জপ, নাম কীর্তনের মধ্যেই রয়েছে সহজ-মুক্তির পথ। তোমরা নাম ক'রে যাও, জপ ক'রে যাও। দিন চ'লে যাচ্ছে। ভুলে যেওনা—আমরা পথিক, যাত্রিক হয়ে এসেছি। যেতে যখন হবে, সম্বল ছাড়া কেন যাবে? একটা কুটাও সঙ্গে নিতে পারবে না, এই দেহও রেখে যেতে হবে। তাই মহাকীর্তনের মহানাম নিয়ে এগিয়ে চল। এই নামের মাহাত্ম্য কত দেখবে, —দেখবে স্বয়ং স্রষ্টা এসে তোমাদের নিয়ে যাবেন।

প্রশ্ন ঃ—গুরুকে গতিদাতা বলে কেন; গতির পথ কি? কি কারণে তিনি এই গতির পথ ক'রে দেন? এই গতির পথে চলার বিশেষত্ব কি?

উত্তর ঃ— যে যে বিষয়বস্তু দিয়ে দেহ গঠন হয়, যেই সমস্ত বিষয়বস্তু দেহেতে বিদ্যমান, সেই দেহের বস্তু যদি আকাশের হ'য়ে থাকে, অর্থাৎ আকাশের বস্তু যদি দেহে থাকে তবে সমস্ত বিষয়বস্তু—দর্শন, শ্রবণ, অন্তর্যামিত্ব, সর্বদর্শিতা ইত্যাদি যত ক্ষমতা আছে,সব এই শূন্যে, এই আকাশে ভরপুর হয়ে আছে। একটা ডিম ভাঙ্গলে দেখা যায় পাতলা হলুদ-জলের মত, তার মধ্যে তো আর হাঁসটাকে দেখা যায় না, হাঁসটাকে বোঝাও যায় না!—শুধু জলের মত তরল পদার্থ। এই শূন্যে, এই ফাঁকাতে ঐ গলিত অবস্থাটা ভ'রে আছে—সমস্ত শূন্যময় ভ'রে আছে। তার থেকে কি হয়? তার থেকে রূপ বা'র হয়। এই পৃথিবীতে যত বিকাশ হচ্ছে, আসছে তারই থেকে। —গতিদাতা,—তাঁর কি কাজ? তিনি সবসময় গতির পথে নিয়ে যান। গুরু গতিদাতা। তিনি বিরাটের প্রতিনিধিস্বরূপ। কারণ বিরাটের দ্বারে গতি হিসাবে, যান্ত্রিক হিসাবে—গুরু হচ্ছেন অখণ্ড বিরাট। সেই শক্তিতে একমাত্র গতি করতে পারেন গুরু, জীবলোকের পথ পরিষ্কার করতে পারেন গুরু, গুরু সেই অধিকারে অধিকৃত। গুরুশক্তি কিভাবে থাকে? গুরু দেহের মধ্যে থেকেও দেহের আড়ালে সর্বসময় তাঁর যে বিকাশ, তাঁর যে প্রকাশ, তাঁর যে শক্তি তা' সমস্ত আকাশময় ছড়িয়ে দিয়ে আছেন। কি রকম? একটা বটবৃক্ষের বীজ বটগাছের তলায় প'ড়ে আছে, আর বটগাছটা উপরে বহুজায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তেমনি গুরু দেহ নিয়ে আছেন নীচে পৃথিবীতে,আর তাঁর শক্তিটা শূন্যে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে আছে। একদিকে জীবলোক, সৃষ্টির সব কিছু বীজ আকারে গাছের নীচে বটবৃক্ষের বীজের মতনই প'ড়ে আছে। কোথায়? এই পৃথিবীর ক্ষেত্রে। বীজগুলো ছড়িয়ে আছে। ঐ আকাশের নীচে। আকাশ হচ্ছে বিরাট—সেই বিরাট বৃক্ষ। সেই বৃক্ষে অজস্র তারা-চন্দ্র-সূর্য, সবকিছু ফুলের মতন ফুটে আছে, কোটি কোটি অগণিত গ্রহ-উপগ্রহগুলো ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে থাকাতে কি হয়েছে? নীচে শিউলী ফুলের মতন, সেইসব গ্রহ-উপগ্রহ ছড়িয়ে আছে, তাদের উপরে বট গাছের মতন রয়েছে মহাশূন্য। কি ক'রছে? দুইজন দুইজনকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেই মহাশূন্যরূপ বটগাছ নিম্নে তাকিয়ে ব'লছে সেই বীজকে যে তুমি আমি। আবার নীচে থেকে বীজ ব'লছে, —আমি সেইটা, উপরে তুমি, আমিই তুমি! বীজগুলো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে তাকিয়ে আছে—আমি ঐরকম হব। গাছের নীচে ছোট ছোট গাছ হয়ে থাকে—ঊর্ধ্বে তাকিয়ে ভাবে—তারা কবে ঐরকম বড় হবে! মহাশূন্যরূপ বটবৃক্ষ — যার উপরে আশ্রয় ক'রে সমস্ত জগৎ রয়েছে, সেই জগৎকে সে ব'লছে—তোমরা আমার সত্তায় আমার মধ্যে রয়েছ, তোমরা আমার কাছে আছ, তোমরা আমাতে ভরপুর হয়ে আছ,— তবু তোমাতে আমাতে কত প্রভেদ! তোমার আমার মধ্যে পার্থক্য যেটা রয়েছে, সেটা—তুমি চারা গাছ হয়ে রয়েছ আর আমি ফুটে বড় হয়ে উঠেছি...... উঠে আমি প্রসব করছি,আমি দিচ্ছি। তোমরা আমার কাছেই আছ। বাবার ছেলে হচ্ছে,

আবার ছেলেও বাবা হচ্ছে। এক মাসের শিশু বাবা হয়নি, কিন্তু বাবা হওয়ার গুণ তার মধ্যে রয়েছে—কেবল সময় সাপেক্ষ। এই যে অবস্থাটা, এটা সর্বকালে সব সময় রয়েছে, ভরপুর হয়ে রয়েছে। গুরুশক্তি কোথায়? বিরাট শক্তি কোথায়? সমস্ত অবস্থায়,—সমস্ত জায়গায়। যেখানেই ধরবে সেইখানেই ভরপুর রয়েছে,—সবাই সাগরে ডুবে র'য়েছে। যারা সাগরে ডুবে আছে তারা সব সময় সাগরকে পাচ্ছে; তবু তারা বলছে যে চাই, আরও চাই। কিন্তু যা চায়, তার মধ্যেই ডুবে আছে। এই যে চলার পথ—আজও চ'লছে। কেন চ'লছে? যাকে খুঁজে কখনও পাচ্ছেনা, যার শেষ নেই, তার জন্য চলার গতিরও শেষ নেই। কোনকালে কোন গতির শেষ নেই, কোন কিছুরই শেষ নেই—এই হ'ল কথা। যেদিকে যাবে—কোনটারই শেষ নেই। খাওয়ায়, চলায়, পরায়, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির নিবৃত্তিতে যাবতীয় যা কিছুতে তুমি যাও—কোনটাতেই শেষ পাবে না। কেন পাবে না? না পাওয়ারই রীতি এটা। পেতে পার না, পেলে বিরাট আর থাকে না। বিরাটের আখ্যা-ব্যাখ্যা তোমার মধ্যে ন্যস্ত। তুমি বিরাটের ব্যাখ্যা ক'রছ, —তোমার ছন্দে, তোমার গীতে তুমি প্রকাশ ক'রছ—এর শেষ নেই; যত কিছু চলে যাচ্ছে, শেষ পাওয়া যাচ্ছে না। এই যে গতি—এই গতি কি? গতিদাতা গতি করছেন, আবার আমরা সেই গতির পথে গতি অনুযায়ী অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি, তাই আমরা গতির লাইনে রয়েছি। দিল্লীর যে ট্রেনের লাইন, সেই লাইনে যে পঞ্চাশ মাইল যাবে, সে ঐ লাইন দিয়েই যাচ্ছে—ঐ লাইন দিয়ে হু- হু করে যাচ্ছে। আমরা কি করছি? আমরা সমস্ত জীবকুল প্রকৃতির লাইনের উপর দিয়ে প্রকৃতির গুরুশক্তির বিরাট লাইন দিয়ে চলেছি। তাহ'লে দেখা যায়, গতিদাতা গতি ক'রছেন, তার উপর দিয়েই আমাদের নিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমরা কি করছি? আমরা খুঁজে বা'র করছি—আমরা অমুক জায়গায় যাব। কিন্তু অমুক জায়গাটার যে লাইন, আর প্রথম যে লাইন, লাইন তো একটাই; লাইনের দেহ—তার দেহ কিন্তু একটাই। একজনের দেহ যদি এক মাইল হয়, তবে তার দেহ কি দেহ নয়? গতিদাতা যে গতিতে নিয়ে যাচ্ছেন, দশ মাইল, একশ মাইল— যেখান দিয়েই যাও, তার মধ্যেই তো তুমি আছ। তবু আমরা কি করছি? তার মধ্যেই যে আছি, তারই দূরত্ব, সীমা খুঁজবার জন্য অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি। আমাদের গতিটা কিভাবে যাচ্ছে? সীমা খুঁজতে বেরিয়েছি, সীমা খুঁজতে গিয়ে আর আমরা কোনদিকে তাকাচ্ছিনা, চলেই যাচ্ছি। সেই চলার পথ আজও চ'লছে,—চিরকাল চ'লছে। হাজার হাজার পুরুষ কোথায় চ'লে গেছেন,—আজও চলেছে। এই যে চলার পথ—এইটাই হ'ল গতির পথ। এই গতির পথটা কেন ক'রলেন? কি কারণে এই গতির পথ ক'রলেন? আবহমান কাল থেকে এই যে চ'লছে—খাওয়া-দাওয়া, বিয়ে-সাদি। ব্যাস, তারপর চ'লে গেল।—আবার চ'লল। এইভাবে চলছেই। কেন চ'লছে? এই চলার বিশেষত্ব কি? বিশেষত্ব হ'ল যতক্ষণ পর্যন্ত বিশেষত্বের জায়গাতে না পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐভাবেই গতি চলছে—বিশেষত্বের জায়গায় না পৌঁছান পর্যন্ত গতি চ'লছেই। এই যে, আমরা নির্ভর করে' চ'লছি,—সেটা কি? সেটা হ'ল—যেইভাবে জগৎ প্রস্ফুটিত হয়েছে, যেইভাবে আলো প্রস্ফুটিত হয়েছে, যেইভাবে

পরিদৃশ্যমান জগৎ ফুটছে, যেইভাবে অনন্ত বিশ্বের শক্তি জাগছে, এই জাগন অবস্থা যাতে আমাদের জাগে, তারই অবস্থা সর্ব অবস্থায় যাতে সমস্ত দেহের ভিতর পূর্ণভাবে পূর্ণগতিতে প্রস্ফুটিত হয়, তারই জন্য হ'ল এই গতি। গতি হ'ল পথ। এই যে পথ চ'লছে—কি হচ্ছে? ফুলটা যে ফুটছে—ফোটার আগে গন্ধ বোঝা যায় না, কিন্তু ওর ভিতর যে সুগন্ধ এবং ওর ভিতর যে রূপ আছে—তাই আস্তে আস্তে বিকাশ হচ্ছে। যখন ফুলটা ফোটে, তখন কি সুন্দর তার গন্ধ, কি সুন্দর তার রূপ! আমাদের ভিতর যেটা অতি স্বচ্ছ সুন্দর, যেটা ধীর স্থির অচল অটল পবিত্র হয়ে আছে, সেটা কি হচ্ছে? সেটা আস্তে আস্তে যাতে সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়, তার জন্যই এই অনন্ত মহাশক্তির সুব্যবস্থা। কিভাবে ফুটবে, তার ব্যবস্থা সর্ব অবস্থার মধ্যেই হয়ে যাচ্ছে। সর্ব অবস্থায় সেটা হচ্ছে ব'লেই এত রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, আঘাত প্রতিঘাত আমরা ভোগ করছি। যতই আমরা দুঃখ ভোগ করছি, ততই ফুটবার মুখী হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে হচ্ছে, সেদিকে তাকাবার আমাদের সময় থাকে না। কিন্তু কি ভাবে প্রস্ফুটিত হবে, কিভাবে সেটা জাগবে, কিভাবে চেতনে আসবে সেই দিকেই বিশ্বপ্রকৃতি সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে সব সময় নজর দিয়ে আছেন। সেইসঙ্গে আমার আনুষঙ্গিকগুলোর আপনিই স্ফুরণ হচ্ছে। এই যে স্ফুরণ হচ্ছে, এই যে জাগছে, এই যে ব্যথা, বেদনা, রোগ, শোক,—এগুলো আলাদা নয়, প্রস্ফুটিত হওয়ার মুখে আপনিই হয়ে যাচ্ছে। আমাদের চলার পথে রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্যের মধ্যে আমরা যে এগিয়ে চলছি—সেই চলার পথে কি হ'চ্ছে? চলার পথে যে আনুষঙ্গিকগুলো এসে উপস্থিত হয়েছে এবং হচ্ছে, তা কেন হচ্ছে, কিসের জন্য হচ্ছে? যেটা হওয়ার হয়ে যাচ্ছে, সেটা যে রকমেরই হোক, যেই ধরণেরই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। তখন যাই হবে, প্রশ্ন চিরকালই থেকে যাবে— কেন এ রকম হ'ল? কেন এরকম হ'ল না? হ'লটাই হ'ল, যেরকমটি হওয়ার সেই রকম হ'ল। আমাদের চলার পথে যা পাচ্ছি, যা বুঝছি, যা নিচ্ছি—যতটুকুনই নিচ্ছি, ততটুকুনই বুঝতে হবে ফুটবার জন্য। ফুটবার জন্যই সেটা হচ্ছে। ফুটবার জন্য, স্বচ্ছ অন্তর্যামিত্ব এবং সর্ব ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য—অধিকারে আসার জন্য যা দরকার, সেই হিসাবে এই পৃথিবীর বুকে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, আঘাত, প্রতিঘাত—এই যে নানারকম হ'য়ে যাচ্ছে, এটা হওয়ার পথে আমাদের বিরাট সাফল্য যাতে হয়, বিরাট উপলব্ধি যাতে হয়, তার জন্যই আনুষঙ্গিক যা কিছু হওয়ার হয়ে যাচ্ছে। এই যে জগৎ, তার মধ্যে আমরা যে সব কাজ করি, তাতে কে কি ব'লল না ব'লল, সেই বলাবলির জন্য বৃদ্ধও শিশু হয় না, শিশুও বৃদ্ধ হয়না। কোন নিন্দা, কোন অপবাদে, কোন সমালোচনার যাবতীয় যা কিছু আছে, কোন কথাতে কোনটাই আমাদের এই গতির মধ্যে আটকাতে পারছে না। মৃত্যুও আটকাতে পারছে না। সে তার গতিমতন ঠিক চলে যাচ্ছে। শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে এই যে আমাদের গতি—এই যে বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে—যে গতিতে এই গতিটা চলছে, যেই গতিতেই আমাদের মন চ'লছে, আমাদের মনটাও সেই গতিতেই চলছে। সেই গতিটা সচেতন। যেই গতিতে জন্ম হয়, যেই গতিতে মৃত্যু হয়, যেই গতিতে পরিবর্তন হয়, সেই গতিটা অত্যন্ত

সজাগ। এই গতিতে জীবনে কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে!—ঐ গতিটা সজাগ! সজাগ না হ'লে এরকম হ'তে পারে না, এত সুন্দর ভাবে, সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে না। সুষ্ঠুভাবে যে হয়ে যাচ্ছে, এটা মেশিনের মত কাজ হ'লে কি হবে, সম্পূর্ণ সে সজাগ, তার মধ্যে সত্তা রয়েছে, এবং সেই সজাগের পথ দিয়ে যখন আমরা অগ্রসর হচ্ছি, আমাদেরও সেই বিষয়ে সজাগ হওয়া উচিত এবং সজাগে যে আছি সেইটাই প্রতি মুহূর্তে আমাদের বুঝতে হবে। আমরা যে সজাগের মাঝ দিয়ে যাচ্ছি এবং যে সজাগের উপাসনা করছি, সেই সজাগের মধ্যে থেকে আমরা সেই সজাগেরই কাজ ক'রে যাচ্ছি। সেই যে সজাগ, সেই হ'ল গতি। গতিদাতার গতি হচ্ছে সজাগ, গতিদাতা হচ্ছে সজাগ, এবং গতিময় অবস্থায় সজাগের মধ্যে থেকে আমরা সেই ধ্যান ধারণা করছি। কথাটা বুঝতে পেরেছ? এই যে ভরপুর অবস্থায় আমরা সবাই রয়েছি,—বৃষ্টি যখন ফোঁটা ফোঁটা পড়ে, আমরা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে কর ভিজছি; বৃষ্টিতে দাঁড়ালাম বলেই তো ভিজে গেলাম! আবার ঠাটা-পড়া রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আছি, পিঠ পুড়ে যাচ্ছে, রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আছি বলেই তো পিঠ পুড়ছে। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে প্রকৃতির ধাম দিয়ে ইচ্ছা ক'রলে বৃষ্টিতে ভেজা যায়, রৌদ্রে পোড়া যায়। আবার গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ঝড়-রৌদ্রকে এড়িয়ে থাকা যায়। চারদিকে বৃষ্টি, চারদিকে রৌদ্র—আমার যাতে গায়ে না লাগে তার জন্য আমি নিজেকে একটু আড়াল ক'রে রাখলাম। এই আড়াল করে রেখে দূর থেকে বৃষ্টি পড়াও দেখছ আবার রৌদ্রও দেখছ—তোমার গায়ে লাগছেনা। সমস্ত শক্তিগুলো ঠিক সেইভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের যতটুকু যেইভাবে টেনে নেওয়া দরকার টেনে নিয়ে, যতটুকুন এড়িয়ে থাকা দরকার এড়িয়ে থেকে, যতটুকুন যা কাজ করা দরকার আমরা ক'রে যাচ্ছি। ব'সে ব'সে যারা জপ করছে তারা গতিদাতার উপলব্ধি কেমন করে পাবে? মনে কর একটা ছাদে তুমি চৌবাচ্চা ক'রে রেখে দিলে বৃষ্টির জল ধরার জন্য। তাতে কয়েক ফোঁটা জল প'ড়ে চৌবাচ্চাটা গেল ভ'রে। দেখলে—বাঃ, চৌবাচ্চাটা ভ'রে গেছে! এই ফোঁটা ফোঁটা জল কোথা থেকে এল? এই নীচের জল টেনে উপরে নিয়ে যায়—এই বাস্তবের থেকেই টেনে নিচ্ছে, এই বাস্তব পৃথিবীর দেহ থেকেই টেনে নিচ্ছে। তারপর কি হচ্ছে? গর্জন হচ্ছে—ধ্বনি হচ্ছে। ধ্বনিতে কি ক'রছে? যদি তুমি সব সময় শব্দ-ধ্বনি উচ্চারণ কর, শব্দ-ধ্বনি যদি সব সময় এক সুরে থাকে, তবে যে কোন কাজ তোমরা অতি সহজে ক'রতে পারবে। তোমরা কি ক'রছ? তোমরা একটা শব্দ-ধ্বনি নিয়েছ, সেইটা দিনরাত টুক্ টুক্ ক'রে জপ ক'রে যাচ্ছ। প্রতিটি শব্দে সঞ্চয় হচ্ছে, শব্দ সব কিছুই সঞ্চয় ক'রছে, ভাল-মন্দ গালি-গালাজ সব কিছু। কিন্তু যেই শব্দের অর্থ বিরাট, যেই শব্দের ব্যাখ্যা বিরাট, যেই শব্দ উচ্চারণ ক'রলে সব সময় শিহরণ হয়, যেই শব্দ চিন্তা করলে ভালো লাগে, এইরকম ব্যাখ্যা করে শব্দগুলো তৈরি হয়েছে, সেই শব্দ যদি দিবারাত্র অনর্গল সব সময় স্মরণের মধ্যে রাখা যায়, সব সময় খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দ যদি স্মরণে রাখা যায়, তবে কি হচ্ছে? এই সমস্ত বিশ্বের থেকে আস্তে আস্তে খালি জায়গায়, যে ভাবে বরফ জ'মে যায়, সেইভাবে গতিদাতার থেকে এমন একটা সুর তোমার মধ্যে এসে উপস্থিত হবে যা ভাষায়

ব্যক্ত করা যায় না। এই যে পাহাড়, হিমালয় পর্বত খুব উঁচু—সেখানে বরফ জমে যায়, যেখানে উঁচু সেখানে জমাট হয়ে যায়। উঁচু জায়গায় উঁচু চিন্তায় সে উর্দ্ধমুখী হয়ে রয়েছে। পর্বতের পাদদেশে গরম, আস্তে আস্তে পাহাড়ে যাও—ঠান্ডা। যত উঁচুতে যাচ্ছ—ঠান্ডা। উঁচু জায়গায় ঠাণ্ডা—চেহারা বদলিয়ে সব বরফ হয়ে গেছে। যাবতীয় যা ঠাণ্ডা এই বিশ্বে আছে, এই খালি জায়গায় থেকে সে তার মধ্যে ছাপ নিয়ে নেয়। সাগরের জল তো আর সরাসরি তার কাছে (হিমালয়ে) যেতে পারছেনা,—টেনেও সে নেয়না। সে টানবে কি, সাগরকে সে-ই দান করে। সে ক'রছে কি? এই আকাশ থেকে, ফাঁকা থেকে সে কি ক'রছে? তার সেই যে উঁচু মাথা, বিরাট স্তম্ভ,—তার মধ্যে সে কি ক'রছে? সমস্ত আকাশ থেকে, বাতাস থেকে, তাপ থেকে সে অদ্ভুতভাবে সঞ্চয় ক'রছে। সঞ্চয় ক'রে কি ক'রছে? তার যে অরিজিন্যাল (original) রূপটা, আগের রূপটা ছিল—সেটা একেবারে ভ'রে, সে একেবারে ভরপুর হয়ে আকাশের মতন রূপ নিয়ে নেয়। সে মহাশূন্যের থেকে সঞ্চয় ক'রে তার রূপে ভরপুর হয়ে গেছে, সমস্ত দেহে রূপ নিয়ে নিয়েছে। তার থেকে কি ক'রছে? অনর্গল অবিরাম ঝরণা বয়ে যাচ্ছে, ফাউন্টেন হয়ে যাচ্ছে। তার থেকে কি হচ্ছে? সাগর হচ্ছে। তোমাদের কি হচ্ছে?—পর্বত যেমন উঁচু মাটির টিপি হয়ে আছে, তোমাদের তেমনি কি হচ্ছে? শব্দ ধ্বনি এবং বিরাট ব্যাখ্যা—সব মিশ্রণে কি হচ্ছে? উর্দ্ধমুখী চিন্তা এবং মন একত্রিত হ'য়ে ক্রমশঃ ক্রমশঃ উর্দ্ধগামীর পথে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। মন ক্রমশঃ ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী হ'য়ে যাচ্ছে। যত আজে-বাজে চিন্তাই সে করুক না কেন, যত রাজ্যের চিন্তাই আসুক না কেন, মন কোন অবস্থায় কোনটার মধ্যে আটক হয়ে থাকে না এবং থাকবেও না। সে কি করে? সবকিছু চিন্তার বিষয়বস্তুগুলোকে নিয়ে একত্রিত ক'রে বাস্তবে যত-কিছু চিন্তা আছে, যত গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য, যত বাজে, যত ঝঞ্ঝাট, যত কুৎসিৎ, যতরকম যত কিছু আছে, সব কিছু নিয়ে তার মিশ্রণে মিশ্রিত হয়ে, একত্রিত ক'রে সে সেই জপ, সেই আখ্যা-ব্যাখ্যা, সেই বিরাট সুর নিয়ে ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হ'তে থাকে। উর্দ্ধে উঠতে উঠতে সেই হিমালয় পর্বতের মতন মাথা উঁচু করে সে কি ক'রছে? সে সমস্ত আকাশ থেকে সেই সুর, সেই সত্তাকে টানতে থাকে। টেনে কি হচ্ছে? টানতে টানতে কুয়াসার মতন, মেঘের মতন সেই মনের সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে সবকিছু নিয়ে নেয় এবং কুয়াসাগুলো বরফ আকারের মতন সমস্ত মনোময়ের মধ্যে বরফময় হয়ে যায়। সেই বরফ কি? এখানকার জলকণাগুলো একত্রিত হয়ে যেমন বরফ হয়ে যায়, সেই মনোময়ের বরফগুলোও তেমনি। সমস্ত চেতন পদার্থগুলো, সমস্ত চৈতন্য অণু পরমাণু হয়ে সমস্ত বিশ্বময় বিরাজ করছে। সেই অণু-পরমাণুগুলো মনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কণা কণা ক'রে সমস্ত মনোময়ের মধ্যে যখন চৈতন্যময় হয়ে যায়, সেই চৈতন্যময়গুলো বরফ আকার নিয়ে মহাচৈতন্যময় হয়ে মহাচেতন-স্বরূপের স্বরূপ নিয়ে সে তখন ভরপুর হয়ে বসে এবং সে তখন জানতে পারে, বুঝতে পারে, গতিদাতার গতির সব কিছু উপলব্ধি করতে পারে এবং সেই তখন হয় অন্তর্যামী, সে তখন সর্বদর্শী, সে তখন সর্বক্ষমতাবান, সে তখন অনন্তকালের বিরাট শক্তির আধার নিয়ে এখানে আসে।

দেখ, কি সুন্দর! মনটা তখন কুয়াশার মতন চৈতন্যময় থেকে আহরণ করে। দেখ, একটা মধুকর কত ফুলের থেকে মধু আহরণ করে, একটু একটু কণা কণা মধু নিয়ে কত বড় মৌচাক গ'ড়ে তোলে! আমাদের মন-শক্তির মধ্যে মধুকরের মতন এমন কর্মীরা রয়েছে, মনের সূক্ষ্ম কণায় কণায় কর্মীরূপ মন-অণুগুলো—মন-অস্ত কর্মীগুলো মধুকরের মতন সর্বদা আহরণে ব্যস্ত হয়ে বিরাজ ক'রছে এই আকাশে। এবং বিরাজ ক'রে কি ক'রছে? তারা এখানকার ফুলের মধু আহরণ করে না—তারা এই পৃথিবীর কোন কিছুতেই ব্যস্ত না। তবে তারা কিসের ব্যস্ততায় ব্যস্ত? তারা সেই ব্যস্ততায় ব্যস্ত, যেই ব্যবস্ততায় ব্যস্ত সেই মহাচৈতন্য, যাঁর চেতনের ইঙ্গিতে এই মহাচৈতন্যময় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। সেই চৈতনার চৈতন্যের অণু-পরমাণুগুলো কণা কণা হয়ে আকাশে বাতাসে বিরাজ করছে, সেই চেতন্যকে কণাশক্তির বিষয়বস্তু থেকে এই মন-অণুগুলো মধুকরের মতন সেই চৈতন্যের মধু আহরণ ক'রে ক'রে এই মনের উপর বিরাট মৌচাক তৈরী ক'রে নেয়। সেটা কত বড় মৌচাক! সেই অজস্র অজস্র ফুল থেকে যে মধু নিয়ে এসেছে, সেই চাক টিপলে মধুতে পাত্র ভ'রে যায়। কত মধু! কত অজস্র ফুলের সম্মিলিত মধু! সেই মন ফাঁকা মন, স্বচ্ছ মন। মনগুলো একটা দেহশক্তির মতন, স্থূল বস্তুর মতন, সে ক্রমশঃ ধু-ধু করে চ'লছে অতি সূক্ষ্মভাবে। তার সেই সূক্ষ্মতা এত যে, পৃথিবীতে তার স্থান নেই.... সব তার কাছে ফাঁকা, তার কাছে কিছু নেই, পৃথিবীর বিষয়বস্তুতে তার আশ্রয় নেই। সে এত সূক্ষ্ম যে, কোন জায়গায় সে আশ্রয় নিতে পারে না, যেখানেই বসে সেখান থেকে সে বা'র হয়ে যায়। সেই মন কোথায় যায়? সেই চৈতন্য, সেই বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে ক্রমশঃই অগ্রসর হয়ে চ'লছে। সেই চৈতন্যের মধু আহরণ করলে স্বাদে সোয়াদে, নির্বাণ-নির্বিকল্পে, অন্তর্যামিত্বে এবং অণিমা-লঘিমার বিরাট ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হ'য়ে, অষ্টশক্তির শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে সেই ভগবৎ সত্তায়, ভগবৎপ্রেমে পূর্ণশক্তির সাথে পূর্ণগতিতে একই স্থানে বিরাজ করা যায়, সেই শক্তি হ'ল ঐ শক্তি—যেই শক্তি সর্বত্র সর্বভাবে বিরাজমান। এই জীব বীজ হয়ে বিরাজ করছে এখানে, এবং এই পৃথিবীর বুকে সবকিছু রয়েছে এবং সেই শক্তির সঙ্গে একই ধারায়, একই পাত্রে, একই স্থানে, একই জায়গায় অবস্থিত। সুতরাং গতিদাতার গতির মধ্যেই সমস্ত জীবকুল বিরাজ করছে। আমাদের পায়ের নীচে খনি—শুধু বলছে যে, খনন কর, সাগরের অফুরন্ত বারিধারা প'ড়ে আছে। দেবতার কত সুন্দর দান!

প্রশ্ন ঃ আপনি বলছেন, সবাই অতি সহজে ভগবানকে পায়—সেটা কি করে সম্ভব? জন্মসিদ্ধ গুরু, বসে সাধনা ক'রে গুরু আর গৃহগুরু—এঁদের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ—পাহাড়ে এক সাধকের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলাপ আলোচনা হয়েছিল, তাই বলছি।—সেই সাধক আমাকে প্রশ্ন ক'রল,—তুমি বলেছ সবাই ভগবানকে অতি সহজে পায়, আমি এত বছর সাধনা করেছি; সেটা কি করে সম্ভব? আর ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ, শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ এবং বাস্তবে যারা সাধনা করে—এই পুরুষদের মধ্যে পার্থক্য কি? আমি বললাম, পার্থক্য অনেক আছে। বলল—কি রকম? আমি বললাম—একজন জন্মগত ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ,

তিনি সব সময় গভীর তত্ত্বে থাকেন। জীবনের যাত্রার পথে অতি কঠিন বস্তুকে অতি সহজে এনে এবং আশার মধ্যে রেখে সেইভাবে তৈরী ক'রে জগতের কাছে পৌঁছিয়ে দেন এবং তাঁর কাছে কোন বস্তুই কঠিন হতে পারেনা, অসম্ভব বলে তিনি বলেন না। অসম্ভব কি ভাবে সম্ভব হয়, অল্পের ভিতরে কি ভাবে হয়, তা তিনি সহজ করেই বলে দেন। জন্মগত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের আলাপ আলোচনায় যে ভাব, যে চিন্তা, তা যারা সাধনা ক'রে বড় হয়েছে, তাদের থেকে অনেক পার্থক্যযুক্ত। সেটা অতি সহজেই বুঝতে পারবে তাঁর আলাপ, তাঁর তত্ত্ব, তাঁর চিন্তাধারা থেকে। তাঁর তত্ত্বের স্ফুরণই আলাদা রকমের। তখন সাধক বলল—আমরা সেইটা ভাল ক'রে উপলব্ধি করতে চাই। বললাম—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কেবল একজনের উপরেই, এক ব্যক্তিবিশেষের উপরেই ন্যস্ত থাকে না। কারণ জগতে যে যখন জন্মগ্রহণ করে, তার ভিতরেই সেই ব্রহ্মজ্ঞের সুর আছে। তবে কেন জাগেনা? সবার কেন সহজে হয় না? এর আগেও একদিন বলেছিলাম—যেই কোন শিশু, যেই কোন জায়গার ভাষা তার অধিকারে থাকে। তাকে যেই কোন জায়গাতে রাখবে, সেই জায়গার ভাষা সে শিখে নেবে। তাহ'লে কেন সহজে হয়না? এটার কারণ হচ্ছে, যেই ভাষা সে শিখেছে, তার মধ্যেই সে বেশী শিখে নেওয়ার জন্য মন স্থাপন করেছে, তাই অন্য ভাষাতে যেতে তার সময় লাগছে। হবেনা—এ কথা চলেনা। এক জন লোক পৃথিবীর সবরকম ভাষা অন্ততঃ একটা ক'রে শিখতে পারে। আটটা শব্দ যদি শিখতে পারে, তবে দশটাও পারবে। তার মধ্যে শেখার অধিকার আছে। তখন সাধক বলল—হ্যাঁ, সে অধিকার তার মধ্যে ছিল, নতুবা শিখল কি ক'রে! তখন আমি বললাম যে, শুধু ভাষাই নয়, তার মধ্যে পৃথিবীর সব রকম খাদ্য খাবার অধিকার আছে। একটা শিশুকে সব খাদ্য খেতে শিখান যায়, কাঁচা মাংস, মানুষের মাংস;বাঘের সঙ্গে থাকলে বাঘের খাওয়া খাবে, কাকের সঙ্গে থাকলে কাকের খাওয়া খাবে। তা হলে এই মুখ সব খাওয়ার অধিকার নিয়ে এসেছে কিনা? বলে—হ্যাঁ, তা এসেছে।—এই পৃথিবীর সবাই একই বাতাস টানে, সেখানেও এই একই অবস্থা?—হ্যাঁ।—চোখে পৃথিবীর সব কিছুই দেখতে পারে?—হ্যাঁ।—এক দেশের ছেলে আর বিদেশের মেয়েতে বিয়ে হ'লে সন্তান হয়?—হ্যাঁ, তা হয়।—চোখে, কানে, নাকে, মুখে, কিছুতে আটকাচ্ছেনা; তাহ'লে কিছুই আটকায় না যখন, তখন আর বাকী রইল কি? তাহলে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর সব কিছুর সঙ্গে সবার সব কিছু অধিকারে যুক্ত আছে। তখন বললাম—হে সাধক! নয়টা যদি ঠিক হয়, তবে দশটাও ঠিক হবে, বারটাও ঠিক হবে। সবই ঠিকই আছে, আর ভগবান পাওয়ার বেলায় কঠিন হয়ে যাবে নাকি? নয়টা ভগবান দিয়ে দিয়েছেন হওয়ার জন্য, আর দশটার বেলায় বুঝি 'হবে কিনা', 'কি করে হবে', 'অসম্ভব' এই সব কথা আসবে? নয়টার মতন সেটাও তার অধিকার নিয়ে জন্মে। একটা কেন তার অধিকারে থাকবেনা বল? হে সাধক, তুমি প্রমাণ দাও—নয়টা যার অধিকারে আছে—আর একটা কেন তার অধিকারে থাকবেনা? তখন সাধক বলে—হ্যাঁ, সে অধিকারও তার থাকবে। তবে সেই ভগবানের ভাষাটা অতি সহজে নিতে পারে না কেন? আমি বললাম—নিতে পারে না, সেটা তুমি কি ক'রে বুঝলে? আমরা

সবাই নিচ্ছিনা, সেটা কি করে বুঝলে? কারণ যেই শিশু যেখানে থেকে ভাষা শেখে, সে কি বুঝতে পারে যে—'আমি ভাষা শিখছি।' এক বছরের শিশু কি করে ইংরেজীতে কথা বলে? সে কি ইংরেজী শিখে বলছে?— না, সে শিখে বলে নি। শিখবার জন্য তার কি কোন ব্যবস্থা করা হয়েছিল?— না, ব্যবস্থা করা হয় নি। যে পরিবেশে সে আছে, তার থেকে যে ভাষার ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে, তা থেকে সে স্বাভাবিক ভাবে জেনে নিচ্ছে। সে কিন্তু বুঝতে পারছে না যে সে জানছে-বুঝছে। সহজভাবে তার অজানাতেই সে সেই ভাষা দখল করে নিচ্ছে—সে বুঝতেও পারছে না। তাহ'লে এই যে ভাষাটা শিখল, সে বুঝতে পারল না। আমরা যে ভগবদ্‌তত্ত্ব শিখে উঠছি না, তা তুমি কি ক'রে বুঝলে? আমাদের ভিতরে যে সেই জিনিষ জাগছে না, তা তুমি কি করে বুঝলে? শিশু তো বই চিনে না, অক্ষর চিনে না, অথচ বলতে আরম্ভ করে। সেই রকম আমাদেরও শাস্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, ধর্মের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, কারও সঙ্গে কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু শাস্ত্রের কথা, ধর্মের কথা, নীতির কথা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে বা'র হ'তে আরম্ভ করেছে। কি ক'রে বা'র হ'ল?—পরিবেশ থেকে। —সমস্ত বিশ্বের সুরে এমন সৃষ্টি। এত অপরূপ রূপ, এত রূপান্তরিতময় জগৎ আপন মনে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে—এই যে গতি চলছে, এই যে সূর্য-চন্দ্র উঠছে—এই যে গ্রহ উপগ্রহগুলি দেখছ, এই পৃথিবী, এই আকাশ, বাতাস, জল, সাগর, এই পাহাড় পর্বত, এই অপরূপ রূপ—আমার সামনে এত বড় ভাষা থাকতে, 'আমি ভাষা শিখব' এই চিন্তাই তো আমার নেই! স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ভেসেই তো আছি, ভাষার মধ্যে তো ডুবেই আছি। সেখানে নূতন ক'রে আবার জানব, সে চিন্তার প্রয়োজন আসে না। কোথায় বেদ-বেদান্ত, কোথায় শাস্ত্র-উপনিষদ্ কিছুর থেকে জানার প্রয়োজন নেই। তার আগেই তো সব জানা হ'য়ে গেছে, সেই কথাই তোমাকে ব'লব। একটা পাঁচ বছরের শিশু যখন তোমার সঙ্গে কথা বলে, তখন সে বই দেখেনি, পড়েনি, কিন্তু তোমার কথার উত্তর সে দিতে পারছে। তখন তুমি তাকে কি বলবে? তখন বলবে, সে তার জন্মগত দখল, ভাষাটা তার দখলে আছে, তাই সে বলছে। আমি তোমাকে সেই কথাই জানাচ্ছি। আমি সেই দখল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার দখলে অনন্ত মহাসুরের ভাষা ভেসে আসছে। আমি সেই ভাবেই তোমার কাছে বলছি। আমি অধ্যয়নে যাইনি, আমি যোগী হ'তে যাইনি, আমি মুনি ঋষি হ'তে যাইনি, আমি পাহাড় পর্বতে গুহায়-গহ্বরে সাধনা ক'রতে যাইনি। আমি গিয়েছি কোথায়? আমি গিয়েছি সেই গভীর তত্ত্বে, অনন্ত মহাকাশের ভাষার সাথে আমার নিজের মাতৃভাষা এক হ'য়ে গেছে। সেই ভাষার সঙ্গে প্রথম যার দখল হয়, তাই-ই মাতৃভাষা বলে সেখানে গণ্য হয়। আমার ভাষা মাতৃভাষা হ'য়ে গেছে। তখন সেই সাধককে বললাম—দেখ, মাতৃভাষা যখন নিজের দখলে এসে পড়ে, তখন তার কাছে কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। সেই অনন্ত মহাকাশের ভাষা আমার মাতৃভাষা হ'য়ে গেছে। এই ভাষা দখলের ক্ষমতা সকলের ভিতরেই আছে, শুধু আমার মধ্যে আছে তাই নয়। যেই কোন জীবের মধ্যে, একটা পিঁপড়ের মধ্যেও সেই সুর আছে; যেই ভাষা অতি সহজে আমি পেয়েছি, সেই ভাষাই তোমাদের কাছে ব্যক্ত

করছি। এই অনন্ত মহাকাশে বিরাট শক্তির ভাষাই হ'চ্ছে সেখানে অনর্গল অনুভূতি, অনর্গল মহাশক্তির বিকাশ, সেখানে কোন ছোট নেই, বড় নেই, কোন ব্যবধান নেই; সেখানে শুধু অনর্গল সুর বয়ে যাচ্ছে। মহাসাগরের জল সর্বত্র বিরাজমান, শুধু নামে নামে নামকরণ মাত্র। মহাসাগরের জল সর্বত্র সেই শূন্যে, স্থলে, জলে, আকাশে, বাতাসে সর্বত্র সেই মহাকাশের মহাসাগরের বারিধারার ধারা বিরাজমান। কোনটা দেখা যায়, কোনটা দেখা যায় না। কি ভাবে প্রমাণ হয়? মহাশূন্যের মহাসাগরের বারিধারা যে সর্বত্র বিদ্যমান, তা চেয়ে না দেখে কি বিশ্বাস করা যায় না? গাছ বেঁচে আছে জল নিয়ে, উপর থেকে জল প'ড়ছে, পাতা নিংড়ালে জল প'ড়ছে, বৃষ্টিতে জল প'ড়ছে। মনে হয় মাটির উপরে জল নেই, অনেকটা খুঁড়লে জল পাই; কিন্তু মাটির উপরে যে জল আছে, মাত্র একটি আঙ্গুল মাটির নীচেও যে জল আছে, তার প্রমাণ আমাদের চক্ষুতে দেখতে যদিও না পাই, কিন্তু সেই জলই বুঝিয়ে দিচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ, তৃণ—জল ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। মরুভূমি—বালির পর বালির স্তর—সেখানেও খেজুর গাছ আছে, জল পেয়েই সে বেঁচে আছে। আর সেই খেজুরগাছের রস জলের ধারায় বইছে। পথিকরা যখন মরুভূমিতে যায়, মাঝে মাঝে গাছ থেকে, সেই গাছে ফুটো করলে জল পড়তে থাকে, সেই জল পথিক যখন মরুভূমিতে যায়, মাঝে মাঝে গাছ থাক, সেই গাছে ফুটো করলে জল পড়তে থাকে, সেই জল পথিকরা খায়। এই বালিস্তরের মধ্যে অমন জল কোথা থেকে এল?— বালিতে জল আছে, শূন্যে জল আছে, আকাশে মেঘ গর্জন করছে—সেখানে জল আছে, বাতাসে জল আছে এবং সর্বত্র যে বারিধারার ধারা বিদ্যমান, সেটা আমরা যেই কোন বিষয় হ'তে খুঁজে পাই। আমাদের গা দিয়ে জল পড়ছে ঘাম হয়ে। পাহাড় বেয়ে যে ঝরণার জল—তা' কি শুধু বরফেরই জল? পাহাড় ঘামছে,—পাহাড় ঘামে,—সর্বত্রই এই বারির ধারা। সাধক বলছে—হ্যাঁ, সর্বত্র জল বইছে যে, তা বুঝতে পারলাম। তাকে বললাম—এই বিশ্বে শুধু একটা যেই কোন বিষয়বস্তু উপলব্ধি করার ক্ষমতা যদি একজনের থাকে, তবে সর্ববিষয়বস্তুর মধ্যে সর্বভাবে প্রমাণে প্রমাণিত করে দিয়ে যাচ্ছেন ভগবান যে, তিনি আছেন। বাতাস সর্বত্র পাই, জল সর্বত্র পাই, না পাওয়ার জায়গাতেও পাই। তা' হ'লে ভগবানকে তুমি কি ভাবে পেতে চাও? এই যে সাগর আছে, এই রকম কত সাগর উপরে আছে তা' জান? এই পাহাড়ে কয়েকটা সাগর জমে আছে, বাতাস সাগর হয়ে আছে, মাটিতে সাগর, সমস্ত জীবকে যদি নিংড়াও তবে আর এক সাগর বা'র হবে, উদ্ভিদের মধ্যে আর এক সাগর পাবে। সাগর শুধু ঐ মহাসাগরই নয়! এই যে এত সাগর, এই সাগর কি মহাসাগর ছাড়া, সেই 'মহা' ছাড়া? তা' হ'লে ভাষা দিয়ে বুঝলে, সাগর দিয়ে বুঝলে। এছাড়া আরও আছে। তুমি যে কথা বল, তা কে বলে?—তোমার দাঁত, না জিহ্বা, না তালু?—আর এই সবের সঙ্গে রক্তের সঞ্চালন আছে, কাজেই সব জায়গায় রক্ত আছে,—তবে কি কথা বলে রক্তে? সবটা নিয়েই তো হ'লে তুমি। সেই সবটা মিলেই তো কথা বলে! আমি যদি বলি—অমুক মহান ব্যক্তি কথা বলছেন,—সেই মহান ব্যক্তিটি কে? রক্ত, মাংস, শিরা, উপশিরা সবটা নিয়েই তো সেই

মহান ব্যক্তিটি। সেইরূপ সবটা নিয়েই তো ভগবান! দেবতার সত্তা শুধু একটা জিনিসের মধ্যে নিয়ে বিচার ক'রছ কেন? বাতাস, আকাশ, জল—সবটাকে নিয়ে একটা দেহ কর। সেই বিষয়বস্তুই তো অনুভূতি! আমাদের ভাষাটা কোথায়? আমরা শিখেছি কোথায়? এই যে অনন্ত মহাকাশের গতি চ'লছে, যেই গতিতে এই সৃষ্টি হ'চ্ছে, সেই গতির সঙ্গে আমরা যখন যুক্ত, সেই গতি—টিউন (tune) যেটা চ'লছে,—সেইটাকে দখল ক'রেছি, সেই ভাষাটা জেনেছি, সেইটাই তোমার কাছে বলছি। সুতরাং তুমি যে আলাপে এসেছ, যে ভগবদ্-বিষয়বস্তুর মধ্যে এসেছ, ভগবদ্‌গতির মধ্যে সমস্ত জীবলোক চ'লছে, এই গতির মধ্যেই চলছে—গতিটা চ'লছে। তা না হ'লে তুমি এতটুকু থেকে এত বড় হতে না এবং তোমার মৃত্যু হ'ত না। দেহের রূপের যখন পরিবর্তন হচ্ছে, সবই যখন পরিবর্তন হচ্ছে, তখন গতি চ'লছে। যার মধ্য দিয়ে গতি চ'লছে, তার মধ্য দিয়ে ভগবৎ-সত্তা চ'লছে, ভগবানের বিরাট সত্তা তোমার মধ্যে প্রবাহিত হ'চ্ছে। প্রবাহিত যদি হয়, সেটা কিভাবে হ'ল? ছয় বছরের শিশুকে যদি বলা যায়—তুমি তো বই পড়োনা, কি করে ইংরেজী শিখেছ?—কি করে আবার শিখব? আমার ভাষা আমি শিখেছি। এই বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টবস্তুর সবাই ভাষা শিখছে। তখন সাধক জিজ্ঞাসা ক'রছে—কি ক'রে ভাষা শিখল? ভাষা যে শিখছে, তা কি করে বুঝলো? বললাম—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়—এই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বার অনুভূতিগুলো যে আছে, এর মধ্যে অনুভূতির ভিতর দিয়ে যা যা চ'লছে, তা'ই হচ্ছে এক জাতীয় ভাষা। চোখে দেখে যে অনুভূতি, সেটা চোখের ভাষা। মনে রেখো, শুধু শব্দ ক'রে কথা বলাটাই ভাষা নয়। চক্ষু যে দর্শনের সাথে যুক্ত, চক্ষুর সেই ভাষাতে দখল তাই। একটা ফুল যদি দেখ, তাকিয়ে দেখলেই বুঝলে—ফুল। আর যদি মুখে বলি—ফুল, তবেও বুঝলে। দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে কিছু?— কোন তফাৎ নেই। এই দেখে বুঝলাম—এও একটা ভাষা হ'য়ে গেল। দেখে বুঝলে, শুনে বুঝলে, চিন্তা ক'রে বুঝলে, ঘ্রাণে বুঝলে। ঘ্রাণে যে বুঝলে—সুন্দর ধূপের গন্ধ আসছে, এটা তো চোখে বুঝবে না! তবে ঘ্রাণের একটা ভাষা আছে। কথা বললে যেমন বোঝে, তেমনি যে ভাবেই বোঝ—সেই বোঝাটাই হ'ল ভাষা। ঘ্রাণে বুঝছে, ত্বকে বুঝছে। যখনই ইন্দ্রিয় সাড়া দিচ্ছে, এই সাড়াটাই হ'ল ভগবান। তখন সাধককে ব'ললাম—ভগবান যদি এসে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে যায়, তুমি কি দিয়ে বুঝলে? সাপ নিয়ে মহাদেব এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কি দিয়ে তুমি বুঝলে? চোখ বুঁজে যদি বোঝ—অনুভূতি দিয়ে বুঝলে, এক্স-রে দিয়ে বুঝলে। এক্সরে যন্ত্র আছে, চক্ষু বুঁজে দেখা যায়—তা হ'লে অনুভূতির যন্ত্র দিয়ে দেখলে। সেই অনুভূতি দিয়ে যখন দেখলে, কি দেখলে?—আঃ চমৎকার! আর ফুলটা দেখে যখন বল—আঃ, চমৎকার, তখন এই দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? একটা কম চমৎকার, আর একটা বেশী চমৎকার বলতে পার। তা' হ'লে দর্শন ক'রে চমৎকার বলে। ভগবানকে দেখে যদি বল—আঃ, অপূর্ব, অপূর্ব—এই যে 'অপূর্ব' বললে, এটা তো তোমার ইন্দ্রিয়তেই সাড়া আসল—তোমার ইন্দ্রিয়ের ভিতর অতি সূক্ষ্মে; সূক্ষ্মানুভূতিতে, অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের মধ্যে যেই ধ্বনি বেজে উঠল, সেই ধ্বনিতে যে

ধ্বনিত হ'ল, সেই ধ্বনিত যন্ত্রে কি ব'লল? আঃ, অপূর্ব!—তোমার ভিতর দিয়েই কিন্তু প্রকাশ হ'লো—সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি—ভগবান যে তোমার সামনে এলেন—এই যে দর্শন, তোমার ভিতর দিয়ে ফুটে বা'র হ'ল, তা' হলে সেই যন্ত্রের ভিতর দিয়েই তো কাজ করল! যন্ত্রের ভিতর দিয়ে যেই সাড়া দিল, এই সাড়া দেওয়াটাই হ'ল ভগবানের সাড়া। মনে রেখো, যন্ত্রের ভিতর দিয়ে যেই বিষয়বস্তু সাড়া দেয় অহর্নিশ, সেইটাই হ'ল ভগবৎপ্রেমের সাড়া। সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে, মানে-অভিমানে, ছলে-কৌশলে—যেইখানে যাও, এই যে সাড়া—যন্ত্রের ভিতর দিয়ে এই যে সাড়া দিচ্ছে, অনবরত সাড়া দিয়ে যাচ্ছে, এই সাড়া দেওয়াটাই ভগবানের ভগবৎ সত্তা। দেখে যে কথাটা ব'লছ, চিন্তা ক'রেও সেইটাই অনুভব হয়ে যায়। অনুভব শক্তির অনুভূতিতে, যেই যন্ত্রের সাড়াতে যেই যন্ত্র বেজে ওঠে, ধ্বনিত হয়, সেই ধ্বনি, সেই বুঝটাই সাড়া। এই একটা শঙ্খ দেখছ—এই শঙ্খটা কি তোমার শরীরের ভিতর ঢুকে গেল? শঙ্খটা তোমার শরীরে ঢুকল না—তুমি চোখে দেখে বুঝলে, এটা শঙ্খ। তা'হলে দেখে যখন বুঝলে, যথেষ্ট হয়ে গেল, আর কিছুর দরকার নেই। ভগবানকেও দেখেই বুঝবে, সাগরকেও দেখে বুঝবে। তা' হ'লে তোমার দেহের যন্ত্রগুলো কিভাবে গড়া? ভগবৎ সাড়ার যন্ত্র মাত্র। এই যন্ত্রটায় শুধু বেজে ওঠে ভগবৎসত্তা, ভগবৎ শক্তি—স্রষ্টার শক্তির সাড়া। সর্ব অবস্থায় এই দেহযন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির ভিতর দিয়ে অবিরাম অনবরত সাড়া দিচ্ছে।

এই যন্ত্রটাই হ'চ্ছে ভগবানের অপূর্ব বিভূতি-শক্তি, ভগবানের অপূর্ব কার্যকলাপ, ভগবানের অপূর্ব গতি। ভগবানের সৃষ্টির স্বাদের সোয়াদ কোথায় আছে? সে এই ধরাতে যে কোন ধারাতে থাকুক না কেন, তোমার এই যন্ত্রে বেজে উঠছে সোয়াদ স্বাদ। ঘ্রাণে একটা জিনিস, আবার জিহ্বায় দিলে আর একটা জিনিস, কি অদ্ভুত দেখ! জিহ্বাতে দিলে—বাঃ কি চমৎকার সেই জিনিস ঘ্রাণে নিলে—বাঃ কি চমৎকার! আবার যখন চোখে দেখ—বাঃ, কি চমৎকার! একই 'চমৎকার' প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে ধ্বনিত হ'চ্ছে খণ্ড খণ্ড ভাবে। অখণ্ড শক্তির বিকাশ—তোমরা ব্যাখ্যা ক'রছ ভগবানের তত্ত্ব। অহর্নিশ ক'রছ ব'লে দাম দিতে পারছ না। তার কারণ, শিশু বোঝে না যে এত বড় গ্রন্থ নিয়ে সে বসে আছে! তোমরা বসে ব্যাখ্যা লিখছ— বাঃ, কি চমৎকার! চমৎকার! কি ব্যাখ্যা লিখছ? ভগবানের ভগবত্তার স্বাদে সোয়াদে, গুণে তিনি যে গুণবান, তিনি যে গুণে ভরপুর, পূর্ণ বিকাশ—সেই বিকাশ শক্তিটাকে বিকাশ ক'রছ তোমার যন্ত্রের ভিতর দিয়ে। তুমি বর্ণনা ক'রছ—কি অপূর্ব, অপূর্ব! এই যে বসে বসে সেই রূপের ব্যাখ্যা ক'রতে ক'রতে তুমি মাতোয়ারা হ'য়ে যাচ্ছ, এই মাতোয়ারে যে ডুবে থাকা, ডুবে গিয়ে যে সুরের সাড়ার সাথে মিশে যাওয়ার যে শক্তির সঙ্গে যুক্ত, এই অপূর্ব ধারার ধারা অনন্ত মহাশক্তির ব্যাখ্যা দিনরাত ব'সে তোমরা ক'রছ,—এই চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বকে, সেই স্খলিতে, সেই বীর্যে, সেই কাম-ক্রোধ-লোভ-হিংসায় অনবরত তোমরা এই নিয়ে চর্চা ক'রছ মহাশক্তির ধারার ধারা। তোমরা সবাই মহাশক্তির ভাণ্ডার নিয়ে বসে আছ। তখন সাধক ব'লল—হ্যাঁ, আমরা তাই নিয়েই তো বসে আছি! বললাম—তা হ'লে তুমি

যে কথাগুলো দ্বন্দ্বে সন্দেহে জিজ্ঞাসা ক'রছ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, এই ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই তা প্রকাশ ক'রছ। সাধক বলে—হ্যাঁ, তাই তো দেখছি, এই ইন্দ্রিয়েতেই তো প্রকাশ ক'রছি। —তা হ'লে তোমার ইন্দ্রিয় দিয়ে তুমি প্রকাশ ক'রছ। স্বাদে, সোয়াদে গরমিল হ'তে পারে। তোমার নাকে সাময়িক গন্ধ পাওনা বলে তুমি এই কথা বলতে পার না যে, এই জিনিষের গন্ধ নেই। কারণ সর্দিতে নাক আটক থাকতে পারে, কোন একটা জীবাণু ধাক্কা দিয়ে বা'র করে দেবে,—বা'র করে দেওয়ার সময় তুমি গন্ধ পেতে পার না। ঘ্রাণশক্তি বা শ্রবণশক্তি সাময়িক বন্ধ হ'য়ে গেল— সেই বন্ধ থাকাটা কি চিরদিন বন্ধ থাকা? এই বন্ধ থাকাটা একটা অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে বহির্গত ক'রে দেয়। তোমার ভিতরে যে অনন্ত শক্তি আছে, তার যে ধারা, সেটা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি ক'রতে পা'রছ এবং বুঝার মতন সর্ব অবস্থায় র'য়েছ—এটা যে কোন অবস্থায় তোমরা বুঝে নিতে পার। দেবতার যে কি দান, অতি সহজে এইটা উপলব্ধি করতে পারবে।

সর্ব্ব অবস্থায় যে আমরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত— এই যে ধারাগুলো, যেমন গাছে জল—সমস্ত খাল-বিল-নদীতে জল—ঠিক এই রকম ধারায় ভরপুর অবস্থায় বিরাজ ক'রছে সকল জীবজগৎ। সকল সৃষ্টবস্তু ভরপুর হ'য়ে রয়েছে, পূর্ণ অবস্থায় বিরাজ ক'রছে প্রত্যেকে। তবু বলছে—ভরপুর নই, বুঝতে পারছি না। এই যে বুঝতে না পারা—সাগরে যে ডুব দেয়, সে বুঝে না যে, সে সাগরে আছে। একটু উঁকি দিয়ে দেখতে হয়। সমুদ্রের জীবগুলি কী করে? লাফ দিয়ে দিয়ে ওঠে, ডুবে থাকলে বোঝা যায় না সাগরে আছে, মানে ভরা থাকলে বোঝা যায় না ভরপুরে আছে, কি না। তখন ব'ললাম—হে সাধক! তুমি ভরপুরে আছ বলেই বুঝতে পারছ না। ভরপুর না হ'লে, খালি হ'লে ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ আওয়াজ হয়। ভরপুরে ডুবে থাকলে নাই বলেই মনে হয়। 'নাই' একটা কথা। এটা পূর্ণেরই বিকাশ। নাই যে কথা—আমি যে বুঝতে পারি না, আমার তো নেই, আমার তো হ'চ্ছে না, আমার হবে না,—এগুলো পূর্ণেরই কথা। পূর্ণে না থাকলে এই কথা আসে না। 'আমার ক্ষুধা নাই'—এ কথাটায় 'নাই' ব'ললে কেন? কারণ তোমার পেট ভরা আছে। আমার ক্ষুধা নাই, তা আমি কি ব'লব—আমার ক্ষুধা আছে? তাই ভগবানকে পেয়েই রয়েছ,—ভরেই আছে—তাই ভরা আছ ব'লেই ব'লছ—আমি কেমন ক'রে পাব, আমার হবে কিনা? তুমি ভরা,—তুমি কি ব'লবে? ভরা জিনিস আবার আছি কি ক'রে বলবে?—তাই বলা হয়—আমি পাচ্ছি না। এটাই ভরার কথা। ভরার কথা হ'ল—আমি পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না, আর পারি না, হবে না। হবেটা কি? ভরেই তো রয়েছে। এটার ব্যাখ্যা এই—যখনই ভরা, তখনই—নাই, কিছু হবে না, হ'তে পারে না।—এটাই ভরার কথা।

সেই সাধক তখন হেসে বলছে—বাবা! তুমি এমন কথা বললে যে, 'নাই' বললেই বুঝতে হবে 'আছে'। আমি বললাম—সাধক, তোমাকে যদি পেট ভরে খাইয়ে দিই, ভরা থাকলে আবার কি তুমি খাবে? আমি তোমাকে খাইয়ে দিলাম, পরেই আর একজন যদি এক থালা খাবার এনে তোমাকে বলে—এটা খাও, তুমি খাবে?

সাধক ব'লল—না, তখন ব'লব—আমার পেট ভরা। বললাম—পেটভরা কেন ব'লবে? ভ'রে রয়েছে, তাই বলবে। তেমনি ভগবানকে সবাই পেয়ে রয়েছে, তাই হা-হুতাশ করছে—কেমন করে আমরা পাব?

প্রশ্ন ঃ—ওঙ্কার ধ্বনি বা প্রণব ধ্বনি কি এবং তার অর্থই বা কি? এটা কি স্ত্রীবাচক না পুরুষবাচক?

উত্তর ঃ দ্যাখরে বাবা, স্ত্রীও পুরুষ হয়, পুরুষও স্ত্রী হয় আজকাল। আমার একজন জানা লোক পুরুষ, সে মেয়ে হ'তে চলেছে। এখন যার নাম পরেশ, সে মা হ'তে চ'লেছে। তুমি যে কথা ব'ললে, এটা হ'ল একটা মিশ্রিত জিনিস। একটা শব্দ যখন গুম্ গুম্ আওয়াজ হয় দূর থেকে, সেটা মিশ্রিত' শব্দ। মনে কর হাটে-বাজারে—আজকাল তো মেয়েরাও যায়—মেয়েরাও জিনিস কিনছে, ছেলেরাও জিনিস কিনছে, যে বিক্রী ক'রছে সেও কথা ব'লছে—সবাই কথা বলছে। মনে কর সেই হাটে এক লক্ষ লোক, আর তুমি অনেক দূরে বসে আছ, তখন তুমি কি সেই এক লক্ষ লোক কে কি বলছে শুনতে পারবে? কথাগুলো কি শোনা যায়? কে কি জিনিস চাচ্ছে তা কি বুঝা যায়? বুঝা যায় না, কেবল গুম্ গুম্ আওয়াজ হয়। ঐ গুম্ গুম্ আওয়াজ সব কথাগুলি মিলেই হয়। তুমি যে ব'ললে—এই রকম শব্দ হয়, সে শব্দটা স্ত্রী-পুরুষ মেশানো শব্দ, সেই শব্দটিকে যদি খুঁজতে যাও, তার মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই পাবে। কথা বুঝলে? তুমি যেই শব্দের কথা ব'ললে, এই ওঁ শব্দটা হ'চ্ছে সমস্ত মহাকাশের একটা শব্দ। সেই শব্দটা খুঁজতে গেলে দেখা যায়, সব কথাগুলো আছে, সমস্ত পৃথিবী আছে, সমস্ত সূর্য আছে, সমস্ত আকাশ আছে এই একটা শব্দে। এই শব্দটা অনেক কষ্টে বা'র করেছে। এই পৃথিবীর শব্দ শুনতে পেয়েছে, অন্য লোকের শব্দ শুনতে পেয়েছে। একটা প্লেন চললে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ হয়—সমস্ত খুঁজে খুঁজে দেখে, একটা মাত্র এই অনুস্বর বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু দিয়েই বেশী বার হয়—হুং, হাং, কাং। তখন খুঁজতে খুঁজতে এই শব্দটাকে একেবারে ফটোগ্রাফি ক'রে, রেকর্ড ক'রে—অন্তরের ভিতরে রেকর্ড ক'রে এনেছে—এনে আটকিয়েছে। আটকিয়ে এইটা সবাইকে দিতে আরম্ভ করেছে ইনজেক্ট ক'রে। দেখ না টিকা যে দেয়, তা ঘোড়ার পক্স—আর এক জনের পক্স নিয়ে তোমার মধ্যে ঢুকাচ্ছে। এক জার্ম (germ) ঢুকিয়ে দিয়ে আর এক জার্মকে আটকায়। ঐ যে বিশ্বের পক্সটুকুন—শব্দটুকুন নিয়ে এসেছে। এনে কি করছে? ইন্‌জেক্ট করতে আরম্ভ ক'রেছে। ইন্‌জেক্ট ক'রে দাও, শব্দটা দিয়ে দাও। ঘোড়ার পক্স্ যেমন তোমার দেহে একটু কেটে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, সেই রকম ঐ শব্দটা কানের মধ্যে ইন্‌জেক্ট করে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়—খ্যাচ্ ক'রে দিয়ে দেয়। খ্যাচ্ করে দিয়েই পাঞ্চ্ ক'রে দিলে—পাঞ্চ্ ক'রলেই ঐ শব্দটা সাঁ-আঁ করে ঢুকে গেল। হোমিওপ্যাথি ঔষধ, তিনখানা বড়ি, খুঁজলে পাওয়া যায় না ঔষধ কোথায় আছে—কোথায় ঔষধ, খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন উপকার—অন্য কিছুতে অসম্ভব। বহু রোগী এই হোমিওপ্যাথি ঔষধ খেয়ে আশ্চর্যরকম ভাল হয়ে গেছে। কিন্তু খুঁজলে ঔষধ পাওয়া যাবে না। এতটুকু তিন খান বড়ি দিয়ে দেয়, কিন্তু যত ডাইলিউট করা যায় তত ক্ষমতা বেড়ে যায়। এটা এ্যাটমিক এ্যাকশান (atomic action)। বোতল ভর্ত্তি সিরাপ খাওয়ালে যা না হয়, এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি ঔষধে কত উপকার!

তা'হলে দেখ বড়ি তো তিনখানা, কিছুই না, কিন্তু শক্তিটা কত বড় তুমি চিন্তা ক'রে দেখ। একটা সূক্ষ্ম শক্তির তেজ কত বড়! আর, এই মহাশক্তির একটা ধ্বনি মাত্র, ধ্বনিটা কত বড় মহাশক্তির ধ্বনি, সেই ধ্বনিতে সৃষ্টি হ'চ্ছে।—এই যে সৃষ্টিটা হ'চ্ছে, পৃথিবীগুলো বা'র হ'চ্ছে—ঐ ধ্বনি, যেমন হুং ক'রে বা'র হ'ল, হুং হুং টোকাইয়া বা'র ক'রে নিয়ে আসল, গুড় গুড় গুড় এই নিয়ে নিয়ে এই একটা শব্দ নিয়ে, এই যে কানের ফুটাটা, এই ফুটার মধ্যে হুস করে দিয়ে দেয়। কানে গেলেই করে কি? হোমিওপ্যাথি ওষুধের মত কাজ ক'রতে থাকে। ঐটাকে কি ক'রবে তুমি?— ঐটা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যদি রেওয়াজ কর, বেজে উঠবে।

গুরু যেটা দিয়ে দিলেন, সেই ধাঁচটা, ঘরোয়ানাটা দিয়ে দিলেন। দিয়ে ইন্‌জেক্ট ক'রে দিলেন। দিয়ে ব্যাস্, যোগাযোগ ক'রে রেখে দিয়েছেন। তোমরা জান, আগে চাষীরা ট্রাক্টরে ব'সে ক্ষেত চাষ ক'রত আর এখন এমন যন্ত্র বেরিয়েছে যে ক্ষেতের এক কোণায় ব'সে থেকে সেটা টিপে দেয়, আর ট্রাক্টরটা নিজে নিজে ঘুরে ঘুরে ক্ষেত চাষ হ'য়ে যাচ্ছে। ঐ এক কোণে বসেই ডান-বাঁ ক'রছে আর ঐ যন্ত্রটার মধ্যে ফট্ ফট্ আওয়াজ ক'রছে, আর ট্রাক্টর চাষ ক'রে চ'লছে। ঘরে ব'সে মাইলের পর মাইল কন্ট্রোল ক'রে চলছে, আর ঐ যন্ত্রটা ফট্ ফট আওয়াজ ক'রে ক'রে চাষ ক'রে আস্‌ল। এই যে আস্‌ল, এই যে ম্যাগ্‌নেটিক চুম্বকতত্বটা, এইটাই হ'ল ঐ শব্দটা। চুম্বকতত্বটা হ'ল ঐ শব্দধ্বনি। একটা চুম্বকের শক্তিতে—ধ্বনি বলে ঐটাকে, একটা ধ্বনিতে ঘরে ব'সে কন্ট্রোল ক'রছে। চাঁদে যে রকেট পাঠায়, এই পৃথিবীর এক ঘরে বসে তাকে কন্ট্রোল ক'রছে, আর সেটা গিয়ে সেই চাঁদ প্রদক্ষিণ ক'রে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসছে। এই পৃথিবীতে ব'সে বসেই কিন্তু টিপছে। এই যে জিনিসটা—এক জায়গায় ব'সে মহাশক্তির বার্তা—তা' এই মাথা হতেই তো বের ক'রছে—তাইতেই আশ্চর্য লাগছে। আর এই মাথা যার থেকে তৈরী—যে পাত্রে লোহা গলায়—সে পাত্রটা কেমন? যেই পাত্রে লোহা গলায়, সেই পাত্রটা তার থেকে বেশী শক্ত নয় কি? পাত্রটাও কি সঙ্গে সঙ্গে গ'লে যায়? যেই মাথার থেকে এগুলো বা'র হ'য়েছে, সেই মাথার বিষয়বস্তুটা আরও শক্ত। সেই শক্ত কোন্ শক্তের থেকে এসেছে? সেই শক্ত বস্তুটা কে? মনটা কত বড় শক্ত! সেই শক্ত যে পুরুষ, যিনি সৃষ্টি ক'রছেন সেই ধারায়, সেই ধারাটাই হ'ল এই সুর। সেই শব্দটা যে যত বেশী দখল ক'রেছে—জন্মের থেকে যিনি নিয়েছেন, তিনি এক রকমের;এই পৃথিবীতে ব'সে যিনি নিয়েছেন—তিনি আর এক রকমের। দুইটার মধ্যে ভিন্ন রকম হবেই। আমাদের দেশে ইংরাজী শিখে যে কথা বলে আর ইংলন্ডের লোকেরা যে কথা বলে—দুইটা দুই রকম, শুনলেই বুঝা যায়। শব্দটা হ'ল কি? মনে কর তেলে ভাজা রসবড়া, আর ঘিয়ে ভাজা রসবড়া—মুখে দিলেই বুঝতে পারবে। আবার গুড়ের সিরাতে আর চিনির সিরাতে দিলে, তাও মুখে দিলেই বুঝা যায়। এই যে শব্দটা—যিনি দেন, তিনি সিরাতে ভিজিয়ে নেন। আবার দেখ, পেঁয়াজের বড়া খেলে কিছুক্ষণ পরে গলা জ্বালা করে—ঢেকুর উঠতে থাকে আর ঘিয়ের বড়া খেলে মুখ মেরে আসে, বেশী খাওয়া যায় না—কারণ ওটা খাঁটি। যিনি জন্মগত—তিনি জন্মের থেকে ঐ শব্দটাই নেবেন,—মাসকলাইয়ের ডাল দিয়ে বড়া তৈরী ক'রবেন, আমৃতি তৈরী ক'রবেন।—তিনি যে তৈরী ক'রবেন, তা' খাঁটি ঘি দিয়ে। জন্মগত থেকে

যেই সিরাতে ভিজিয়ে নেবেন, তাতে আর একরকম—। তোমার কানে যখন জন্মসিদ্ধ ব্যক্তি দিয়ে দেবেন ঐ শব্দ, সাধারণ শব্দ থেকেই দিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু সেই শব্দের ক্রিয়া বেশী হবে। কারণ হ'ল, তাঁর জন্মগতের মাত্রা, তিনি যেই মাত্রা থেকে এসেছেন, সেই মাত্রা থেকে তোমাকে দিচ্ছেন—কথাটা বুঝলে? মনে কর একতলা থেকে পড়া আর তিনতলা থেকে পড়া—এক রকমই ব্যথা কি? চোট বেশী লাগবে না?—ধুপ্ ক'রে আওয়াজটা বেশী হবে না? আটতলা থেকে পড়লে আরও বেশী লাগবে না? চল্লিশ তলা থেকে প'ড়লে আরও বেশী লাগবে না চোট্‌টা? সেই রকম চোট্‌টা বেশী লাগে। অর্থাৎ মাত্রা আছে।—তলা হ'ল মাত্রা, আর যিনি জন্মগতের মাত্রার, তিনি যখন এই শব্দটা দেবেন, মাত্রার কাজটা বেশী হবে। আর এখানে ব'সে চিন্তা ক'রে যাঁরা দেবেন, তার কাজ অন্য রকম হবে। আবার যাঁরা গুরুগিরি করেন—তাঁদেরটা অন্য এক রকম হবে। ভিন্ন ভিন্ন হবেই। ব্যবসার এক আওয়াজ, আর ব'সে যিনি চিন্তা ক'রে দেন তাঁর একটা আওয়াজ;আর যিনি একেবারে ঘরোয়ানা—তাঁর একটা মাত্রা। একই শব্দ, একই জিনিস তোমায় দিচ্ছে,—এও 'রাম', সেও 'রাম'—একই নাম দিচ্ছে—কিন্তু মহাপ্রভু যখন 'রাম' দিচ্ছেন, সে রামে কাজ হয় বেশী। যারা গুরুগিরি করে, তাদের দেওয়া শব্দে অন্য রকম কাজ। এক শব্দের মধ্যে কম-বেশী হয়ে যায়। দেখ, একটা শব্দের মধ্যে কত পার্থক্য!

প্রশ্ন ঃ— আমরা যে জপ-ধ্যান করি, সেসময় সমূহ যে চঞ্চলতা-বিক্ষিপ্ততারূপ বাধা-বিঘ্ন আসে, এটার কারণ কি? আসনে বসে জপ-ধ্যানের নিয়ম কি? আপনি বলেছেন—চিন্তা করলে তোমার কিছু অংশ চিন্তাতে ব্যয় হয়ে গেল। কিছু অংশ আমার যে চ'লে গেল, তা তো বুঝতে পারি না?

উত্তর ঃ—ধ্যান করে যারা, ধ্যান ক'রতে ক'রতে মনটা মানুষ নিবিষ্ট যখন করে, চিন্তায় মনটাকে নিবিষ্ট করার যারা চেষ্টা করে,—কোন্ কোন্ বিষয়বস্তুর মধ্যে সেটা উপনীত হয়? যেমন দেহ যেই যেই বস্তু দিয়ে তৈরী হয়েছে, পঞ্চভূত বলে যেটাকে বলে, সমন্বয় যেটা আছে, সেই দেহ ক্ষুদ্র থেকে, অতি ক্ষুদ্র থেকে, অতি সূক্ষ্ম থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই বস্তুতে পরিণত হ'য়েছে। এই যে পরিবর্তন হ'চ্ছে—সেটা কেমন? যখন চিন্তা করে, ধ্যান করে, এমনি চিন্তা করে, যা কিছু চিন্তা করে, সেইটাই সাধনা হয়ে যাচ্ছে, সাধনার মধ্যে সেটা প'ড়ে যাচ্ছে। এখন, ব'সে যারা চেষ্টা ক'রতে চায়, তাদের মন সম্পূর্ণ বসে না, কিন্তু যতটুকুই বসে, তাতে কি হয়? এই যে মনটা আছে দেহের ভিতরে, এই মনটা দেখ—যখন রক্তে ছিল, তার আগেও ছিল, তার আগেও ছিল; সূক্ষ্ম বস্তুতে যখন ছিল, সকল বস্তুর মধ্য দিয়ে যখন এটা ছিল, এই যে এখন তোমরা এসে উপস্থিত হয়েছ, বা আছ, এর আগেও ছিলে যখন পেটের ভিতরে ছিলে, তার আগেও ছিলে, তার আগেও ছিলে, —সমস্ত বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিলে। তখন এই মনই ছিল, যে-মন এখন আছে। এই মন তখনও ছিল, এর আগেও ছিল, তার আগেও ছিল। এই মন যদি তখনও থেকে থাকে, সেই বস্তু—সেই সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যেও এই মনটাই ছিল। এই মনটাই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু আকারে ছিল,—এমন সূক্ষ্ম ছিল যখন এই ঘরের দেওয়ালটার ভিতর তার যাতায়াতের জন্য ছিদ্র ছিল। এখন তো তোমরা দেওয়াল

ভেদ ক'রে যেতে পারছ না, কিন্তু তখন তোমরা এমন ছিলে, এমন সূক্ষ্ম অবস্থায় এই দেহ ছিল যে, দেওয়াল ভেদ ক'রে তোমরা চ'লে যেতে পারতে, সেই সূক্ষ্ম অবস্থায় দেহটা রক্তে ছিল, তার আগে বাতাসে ছিল, খাদ্যশস্যে ছিল, সূর্যরশ্মিতে ছিল। যেখানে ছিলাম আমরা, যেখান থেকে এলাম, সেই ছিলামের জায়গাটা এত সূক্ষ্ম ছিল যে সর্বত্রই তার গতি ছিল, সর্বত্রই সে প্রবেশ ক'রতে পারত অনায়াসে। তখনও তো এই মনটাই ছিল! এই বুদ্ধিবৃত্তিসহ এই মনই ছিল সেই সূক্ষ্ম অবস্থায়—যেটা শুনেছ অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি অষ্টসিদ্ধির অবস্থা। অণিমা, লঘিমা, গরিমা যেটা ছিল, অণু অবস্থায় যেটা ছিল—অণু-পরমাণু অবস্থার যেই মনটা, সেই মনটাই ক্রমশঃ ক্রমশঃ নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে এখানে এল। এখন এই মনটা সেখানে কি চিন্তা ক'রত, কোন্ ভাবনার মাঝে, কোন্ চিন্তার মাঝে, কোন্ ধ্যানের মাঝে এই মনটা সেখানে ন্যস্ত ছিল? তখন তার সকল জায়গাতেই গতি ছিল। সেই মনটা যখন এই মনটাই ছিল, তাহ'লে এই মনটা যদি সেই মনকে আনতে পারে, এই মনে যদি সেই তখনকার মনের অবস্থা এসে উপস্থিত হয়, তা হ'লে এটার গতি সর্বত্র হয়ে যাবে—কোন জায়গায় তার আটকাবে না। যখন কাজে বস তখন কি হয়? ঠিক ওই সূক্ষ্ম বস্তু—যেই ধারায় মনটা ছিল, চিন্তা করার সাথে সাথে ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুর মধ্যে মনটা গিয়ে পৌঁছায়। মনে কর জপ করছ। মন তখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাতাসে, মাটিতে, খাদ্যে মিশতে চায়। মিশতে চায়, অথচ মিশতে পারে না কেন? জলটা যখন বরফ হ'য়ে যায়, তখন জলটা মনে কর একটা বস্তুর মধ্যে ঢুকছে না, কিন্তু ঐ বরফ যখন জল হয়ে যায়, তখন বেশ ঢুকে যায়,—শুকিয়ে যায়। এখন মনের অবস্থাটা হ'য়েছে কি? তখনকার যে মন ছিল, তা এখন জমাট বেঁধে গেছে। জমাট বেঁধে যাওয়ার ফলে সেটা সব সময় কার্যকরী হচ্ছে না। জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, আবার সেই বরফ তাপ পেলে গ'লে যায়। আমাদের যে মনটা ছিল,—তখন যে মন ছিল, সেই অণিমা, লঘিমা, গরিমা অষ্টসিদ্ধি, মুক্তির অবস্থায় যে বিরাজ ক'রছিলাম আমরা একদিন, স্থলে জলে শূন্যে সব জায়গায় যে আমাদের গতি ছিল, তা আমরা ভুলে গেছি সবাই। তখন যে ছিলে, তার প্রমাণ হ'ল—যখন এসেছি, তখন ছিলাম। সুতরাং সেই অবস্থার থেকে যে আমরা এখানে উপনীত হয়েছি, সেই অবস্থাটা ভুলে গেলেও কিন্তু সেটা আমাদের প্রত্যক্ষ গোচরে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে। প্রত্যক্ষ অনুভব ক'রে বা প্রত্যক্ষ দেখে আমরা উপলব্ধি ক'রতে পারছি যে, আমরা ছিলাম এক সময়। তা না হ'লে এলাম কোত্থেকে? কি ক'রে? সুতরাং যেখানে ছিলাম সেখানে সর্বত্র গতি ছিল; কেননা, পেটের ভিতর তো একদিনে আসি নাই। তার আগে সূক্ষ্ম অবস্থায় ছিলাম। সেই সূক্ষ্মটা দেখার মতন ছিল। এই যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুতে ছিলাম, সেই বস্তুর মধ্যে যে মনটা ছিল, সেই মনটা যখন আজও আছে, আজ কেন সেখানকার মনকে আমরা সেই মাত্রায় আনতে পারছি না? আনবার পথটা কি? কিভাবে আসে? তখনই হ'চ্ছে যে, আমরা যেই অভ্যাস বা যেই জপ বা যেই চিন্তা করি, তাতে সমূহ আমাদের যেই বাধা-বিঘ্ন, যেই বিক্ষিপ্ততা-চঞ্চলতা আসে, এটার কারণ কি?

কারণটা হ'ল—ব্যথা তোমার ডা'ন হাতে, তুমি প্রলেপ দিলে বাঁ হাতে, ব্যথাটা তাই কমেনি। ব্যথা এক হাতে আর প্রলেপ দাও অন্য হাতে, তাই স্বাভাবিকই যন্ত্রণা থেকেই যাচ্ছে। যেখানে সুর থাকা দরকার, যতক্ষণ না ঐ জায়গায় পৌঁছাচ্ছ, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ জায়গায় মিলছে, ব্যথার জায়গায় না বাঁধা হ'চ্ছে বা প্রলেপ দেওয়া হ'চ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অশান্তি। সেই অশান্তিটা হ'চ্ছে ঐ বিক্ষিপ্ততা বা চঞ্চলতা। এটার কারণই হ'চ্ছে, আমরা যে এখনও সেই জায়গায় পৌঁছতে পারিনি, তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে, আমাদের ব্যথা যে এখনও আছে সেইটাই জানিয়ে দিচ্ছে। আমাদের নিজেদের ভিতর থেকেই, আমাদের দেহের ভিতর থেকেই জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা পৌছতে পারিনি এখনও এবং আমাদের মন উথাল-পাথাল ক'রছে এখনও। চঞ্চল ব'লে যেটা বলা হয়, যেটা বিক্ষিপ্ত ব'লে বলা হয়, এখন সেই অবস্থায় আমরা আছি। সেটা কোন্ অবস্থা? পূর্বে যে অবস্থায় আমরা ছিলাম, সারা বিশ্বে যে আমাদের মন বিরাজ ক'রত, সেই মনের একটা স্বচ্ছ ভাব ছিল এবং প্রকৃতির সঙ্গে একটা মিলনের অবস্থা ছিল, সেই অবস্থাটা আজও রয়ে গেছে। সেইটা ভিতরে থাকাতে আমাদের কি হ'চ্ছে? সব সময় আমাদের মন, যাকে চঞ্চল বলি, সেটা চঞ্চল ঠিক নয়, এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনও। যারা বড় লোক থেকে হঠাৎ গরীব হয়ে যায়, মনটা তাদের থেকেই যায়। পকেট ছেঁড়া থাকতে পারে, কিন্তু তাদের বড় লোকের ঘরোয়ানাটা নষ্ট হয়না, বৃত্তিটা থেকে যায়। তোমরা যে বড়লোক ছিলে, খুব বড় অবস্থায় ছিলে, অবতার বা ভগবান অবস্থায় ছিলে এক সময়, সমস্ত বিশ্বের যে অষ্টসিদ্ধির অবস্থায় ঘুরছিলে, এ-গ্রহে ও-গ্রহে যাতায়াত করছিলে, সেইটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে এখন অসুবিধা হয়ে পড়েছে, মানে এখন ঐ মন গরীব হয়ে গেছে। আগে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে সারা বিশ্বে ঘুরতে, সুতরাং সেই মনের ইয়েটা তো র'য়ে গেছে—চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত, এটা ক'রতে পারতাম, সেটা করতে পারতাম, কত কি করতে পারতাম। কিন্তু কিছুই ক'রতে পারছ না। না পারলেও, মনে সেই গতিটা র'য়ে গেছে। ঐ গতিটা থাকাতে আমাদের সেই বীজ একটুও নষ্ট হয়নি। কেন তবে হ'চ্ছে না? কেন সেই অবস্থাটা আসছে না? আসছে ঠিকই মনের দিক দিয়ে, সেটা এমনি ঘুরছে, দেহ নিয়ে ঘুরতে পারছে না। যখনই মন এদিক ওদিক যায়, যেমন তুমি মনে করলে—তুমি সূর্যে গেলে, তুমি না গেলেও তোমার মনের কিছু অংশ চলে গেল। এটা হ'ল মনের একটা অবস্থা। তুমি হয়তো বলবে—আমি সূর্যে গেলাম কই? কিন্তু এটা জেনে রাখবে—যেই দেহের ক্ষয় আছে, যেই দেহের লয় আছে, যেই দেহের পরিবর্তন আছে, সেই দেহ যখন যা চিন্তা করে, তখনই একটু পাত হয়ে যায়, ক্ষয় হয়ে যায়। সূর্য চিন্তা ক'রলে, গ্রহ-উপগ্রহ চিন্তা ক'রলে তুমি সেখানে গেলে না, কিন্তু কিছু একটা তোমার চ'লে গেল। কোথায় কিভাবে গেল, তুমি বুঝতেও পারলে না। ঘুমিয়ে থাকলে মুখে লালা পড়ে, তা কি তুমি বোঝ? ঘুমিয়ে থাকলে দেহের কত রকম অবস্থা হয়, তা কারও খেয়াল থাকে না। এখন দেহের অংশ থেকে একটা সূক্ষ্ম বস্তু যদি বেরিয়ে যায় বহু দূরত্বে, সেটা এমনি বুঝা না গেলেও, বুঝা যায় এটাতে, যেটাতে আমাদের পরিবর্তন হ'চ্ছে। মনের অবস্থা

সূক্ষ্মভাবে যদি বিরাজ না ক'রত, তবে কোন দেহ কোনদিন বৃদ্ধ হ'ত না, কোন দেহের পরিবর্তন হ'ত না, কোন দেহের মৃত্যুও হ'ত না। দেহ ক্রমশঃ সেই অণিমা শক্তির পূর্ণশক্তি সমস্ত দেহে আছে বলেই দেহ ক্রমশঃ ক্রমশঃ ধাপে ধাপে এই বর্দ্ধিত অবস্থায়, বেড়ে যাওয়ার অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, অন্য আকার ধারণ ক'রছে। আকার ধারণ ক'রতে গেলে, সেই সূক্ষ্ম অবস্থার শক্তি যদি তোমাতে বিদ্যমান না থাকে, তবে এই আকারের কোন পরিবর্তন হ'ত না। আকারের যে পরিবর্তন হয়, অনুভূতিতে তোমরা তা দেখতে চাও। কিভাবে দেখবে, কিভাবে বুঝবে? বুঝবার সহজ দৃষ্টান্ত তোমাদের কাছে অজস্র রয়েছে। এই যে যে অবস্থায় থেকে পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছ, আকারে পরিবর্তিত হ'চ্ছ, রূপান্তরিত হ'চ্ছ, তখনই তোমরা বুঝবে যে অণিমা-শক্তি তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিদ্যমান না থাকলে কখনই পরিবর্তন হ'ত না। এই পরিবর্তন-শক্তিটা তোমাদের কাছে সহজ ভাবে তিলে তিলে, সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে প্রতি মুহূর্তে বুঝিয়ে দিচ্ছে— তোমরা অণিমার ঘরের বাচ্চা এবং প্রতি ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, রক্ত, মাংস ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই যে ধাপে ধাপে পরিবর্তন হ'য়ে যাচ্ছে, আমাদের বুঝতেও দেয় না যে, আমরা বাড়ছি, আবার বুঝতে কিছু বাকী থাকে না। তোমাদের আজকের এই অবস্থার বিশ বছর আগেকার কথা বেশ মনে আছে। যাদের পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে, তাদের ত্রিশ বছরের কথা মনে আছে। ত্রিশ বছর আগের তুমি আর ত্রিশ বছর পরের তুমি—ত্রিশ বছর পরে যে তুমি বলছ—ঐ জায়গাতে গিয়েছিলাম, সেটা আগের জন্মের কথার মতন। এইভাবেই মানুষ আগের জন্মের কথা ব'লতে পারে। ত্রিশ বছর আগের কথা যে বলতে পারে, আবার সেখানে দাঁড়িয়ে আরও সত্তর বছর আগের কথা ব'লতে পারে, আবার যাদের ফুটে গেছে, তারা দশ হাজার বছর আগের জন্মের কথা ব'লতে পারে। ওগুলো এক জাতীয়ই। চিন্তা ক'রে দশ হাজার বছর আগের কথা মনে ক'রতে হয়, চিন্তা ক'রে বা'র ক'রতে হয়; ঠিক সেই রকম চিন্তা করেই কয়েক হাজার বছর আগের কথা বা'র করা যায়—কোথায়, কার ঘরে ছিলাম, কেমন ছিলাম। একই পথ-পদ্ধতি, একই বেড়ে যাওয়ার পদ্ধতি, ক্রমশঃ ক্রমশঃ এ-ঘর সে-ঘর এই-দেহ সেই-দেহ এই ভাবেই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের মধ্যে এই যে অণিমা-শক্তি রয়েছে, সেটা কিভাবে রয়েছে? দেখ, একটা ফুল আছে এখানে আর তার গন্ধ বের হয়ে গেছে ঐখানে। তা হ'লে গন্ধ যখন বের হয়ে যাচ্ছে, তখন বস্তু একটা কিছু না-থাকলে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিছু না থাকলে গন্ধটা কি ক'রে ওখানে যায়? মিলতির সঙ্গে এমন ভাবে আছে ব'লেই তোমরা সুগন্ধ পাচ্ছ। এখন এই দেহের থেকে যদি সুগন্ধ বেরিয়ে যায়, বেরিয়ে যেতে যেতে এই দেহ একদিন লয়-ক্ষয় হয়ে যায়। এই যে ফুলটা দেখছ, দেখবে—দিনের পর দিন এর গন্ধ বেরিয়ে যেতে যেতে শেষে শুকিয়ে যাবে, ক্ষয় হ'য়ে যাবে। বেরিয়ে যাওয়া আর কি? সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ অণু আকারে বেরিয়ে যায়, লয় হয়ে যায়, পরিবর্তন হয়ে যায়। অণিমার নিয়ম কি? অণিমা হ'চ্ছে ভ্যানিশ (vanish) হয়ে যাওয়া, মিশিয়ে যাওয়া। অণিমা হ'চ্ছে—যেই বস্তুটা শক্ত আছে, সেইটা সম্পূর্ণ মিশে যায়—পঞ্চভূতের সঙ্গে মিশে যায়, অন্য আকার নিয়ে নেয়। এইটাও ঠিক তাই

এই দেহটার থেকে সেই সুগন্ধ বেরিয়ে যায়। দেহ থেকে কি হ'চ্ছে? দেহের মধ্যে রয়েছে সুগন্ধ-রূপ মন, —মনটা হ'চ্ছে দেহের সুগন্ধ। ফুলের সুগন্ধ হ'ল ফুলের মন,— সেটা যেমন বেরিয়ে যাচ্ছে, দেহ থেকে সেই রকম সুগন্ধ-রূপ মন বেরিয়ে যাচ্ছে। এই সুগন্ধ-রূপ মন অনর্গলভাবে আজও বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং বেরিয়ে যেতে যেতে সেই দেহও মনের সঙ্গে মিশে একদিন বেরিয়ে যাবে। এই দেহ তখন মন আকারে, মন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—মন হয়ে' যাচ্ছে। মন হ'চ্ছে সব থেকে সূক্ষ্ম, মন হ'চ্ছে সূক্ষ্মতম অণুপরমাণু বস্তু, যার থেকে সূক্ষ্ম কিছু নেই, যার গতি মুহূর্তে মুহূর্তে অনন্ত কোটি মাইল চ'লে যায়, যার গতির কোন সীমানা নেই, যাকে কোন প্রকারেই ধরে রাখা যায় না। সেই মন সুগন্ধ-রূপে এই দেহ থেকে সেই সহস্রারের ভিতর দিয়ে, সেই মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে অনর্গলভাবে ফোয়ারার মতন বেরিয়ে যাচ্ছে; তুবড়িবাজি যেমন হু-হু ক'রে ছোটে, মন সেই রকম চ'লে যাচ্ছে। এই যাওয়ার পেছনে কি হ'চ্ছে? যাচ্ছে চ'লে ঠিকই, কিন্তু সেই চলে যাওয়ার পিছনে আমাদের মনকে ধ'রে রাখতে পারছি না। একটা বাচ্ছা শিশুকে ঘরে ছেড়ে দিলে সে যেমন সমস্ত ঘরের জিনিসগুলো আল্‌জাল ক'রে রেখে দেয়, তার স্বভাবই হ'চ্ছে অগোছাল ক'রে ফেলে রাখা, আজ আমাদের মনের ভিতরে চিন্তাগুলোকে এমনি ক'রে আল্‌জাল ক'রে ছড়িয়ে রেখেছি যে, সেই ভাবেই মন সেই পথ দিয়ে আল্‌জাল আকারে চলে যাচ্ছে। শিশু যেমন ঘরের জিনিস আল্‌জাল করে রাখে, মনটা তোমরা তেমনি আল্‌জাল করে ছড়িয়ে রাখায় কোন একটা বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিবিষ্ট ক'রতে পারছ না; ওটা টানছ, সেটা চিন্তা ক'রছ, এটা ক'রতে চাইছ ইত্যাদি। কিন্তু এই আল্‌জালের মধ্য দিয়ে মন তো বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিকই! বেরিয়ে যাওয়ায় মনের গঠনটাই অমনি আল্‌জালের মতই হয়ে যাচ্ছে। এবং সম্পূর্ণ দেহটা যখন ঐ আল্‌জালের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যায়, জন্মটা ঠিক তেমনি আল্‌জাল রূপ নেয়। এই আল্‌জালের রূপে জন্ম নিলে কি হয়? মনে কর, কোন জীবের মধ্যে আল্‌জাল আছে, স্থিরতার অভাব আছে, অস্থিরচিত্ততা আছে। যেমন কোন পাখী এমন আছে যে, মুহূর্তে মুহূর্তে নাচছে—খেয়াল নেই; কোন জীব আছে, মুহূর্তে মুহূর্তে এদিক ওদিক ক'রছে, এটা করছে, ওটা করছে; বহু জীব আছে মুহূর্তে মুহূর্তে নিজেকে ঠিক জায়গায় এক সেকেন্ডও রাখতে পারছে না। আল্‌জাল রূপে জন্ম নিয়ে ঐ আকারটাই নিয়ে নিল। কারণ সমস্ত দেহটা, মনটা সেই আকারে অণু পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আল্‌জাল রূপে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেই মন—সেই শিশুমন যখন একদিন নিবিষ্ট চিত্তে ক্রমশঃ ক্রমশঃ এগিয়ে যায়, সে-ই একদিন দেখা যায় ভারতের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল, বড় একজন নেতা হয়ে দাঁড়াল। তখন সে কঠিন রূপে রূপ নিয়ে নিল। আমাদের মধ্যে এই বিশ্ব-ভারতের শুধু নয়, বিশ্বজগতের, সমস্ত ভূগর্ভের সত্তা—সমস্ত সত্তার সার অংশ এই দেহখণ্ডে র'য়েছে। সেখানে এই মনকে যদি সুকঠিন রূপে চালিত ক'রে তোমরা সেই আকারে আকার নিয়ে নিতে পার, তা'হ'লে এই মন যে কত বড় বিরাট আকারে আকার নিয়ে সেইদিকে এগিয়ে যেতে থাকবে, তা' ভাষাতীত। কারণ অণিমা-গরিমা শক্তি সকল মনের মধ্যেই আছে, তার দৃষ্টান্ত শুধু গ্রন্থে

নয়, তার দৃষ্টান্ত জীবনের পাতায় পাতায়। মুহূর্তে মুহূর্তে, প্রতি অবস্থায় অবস্থায় তোমরা বুঝে নিতে পারছ। এই যে চোখে দেখছ—দেখার সঙ্গে সঙ্গে তুমি ভ্যানিশ হ'য়ে যাচ্ছ, মিশে যাচ্ছ। চোখে দেখাটাও তোমার রূপ দর্শন রূপে মিশে যাচ্ছে। কানে শুনছ,—তোমার রূপ শ্রবণের ভিতর দিয়ে মিশে যাচ্ছে; তোমার রূপ—ঘ্রাণের ভিতর দিয়ে মিশে যাচ্ছে, তোমার রূপ সোয়াদের ভিতর দিয়ে মিশে যাচ্ছে। কর্পূরের দেহ, চোখে দেখছ—কি সুন্দর!—সে যেমন আপনিই ক্রমশঃ ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হ'তে হ'তে মিশে যায়, তেমনি অতবড় দশমণ দেহটা কোথায় চ'লে যায়, খুঁজে পাওয়া যায় না,—ঘরে সে নেই, তবে দশমণ দেহটা উড়ে গেল কোথায়? এই ঘরেই অতবড় দেহটাকে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল—যাকে দু'একজনে উঠান বসান যেত না, ঘরের জানলা-কপাট বন্ধ রাখা সত্ত্বেও সেই দশমণ দেহটা ভ্যানিশ হয়ে কোথায় উড়ে গেল? নিশ্চয়ই একটা জায়গায় সে আছে, কোন বস্তুর সঙ্গে মিশে সেই দশমণ-দেহ র'য়ে গেছে! যেই কর্পূর এমনি উড়ে যেতে পারে, এই দেহ সেই কর্পূরের চেয়েও হালকা, সূক্ষ্ম—উড়ে যাওয়া তার পক্ষে আরও সহজ, কারণ কর্পূর উড়তে সময় লাগে, দেহ উড়তে সময় লাগে না। কেননা দেহ হ'চ্ছে উড়ন্ত বস্তু থেকেই তৈরী— সমস্ত উড়ন্ত বস্তুর সত্তা থেকে এই দেহ তৈরী—মনে রেখো। কারণ সূর্য উড়ন্ত, বাতাস উড়ন্ত, জল উড়ন্ত, খাদ্য উড়ন্ত, সমস্ত উড়ন্ত বস্তুর সমন্বয়ে এই দেহ তৈরী। খাদ্য, শস্য, রক্ত, বীর্য হয়ে এসেছে এই দেহ, সুতরাং উড়ন্ত বস্তুর মতই এই দেহ সূক্ষ্ম! তবে কেন স্থূল হয়ে, জটিল হয়ে, পঁয়ষট্টি-সত্তর বছর এখানে অবস্থান করে? তার কারণ, যেই দেহ অগণিত কোটি বছরেও শেষ হবার নয়, তার পক্ষে পঁয়ষট্টি বছর একটা সেকেণ্ড মাত্র। এই দেহ-শক্তি এত বড় বিরাট শক্তি, এর লয়-ক্ষয় এমনি খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এর লয়-ক্ষয় সমস্ত বিষয়বস্তুর সঙ্গে বিজড়িত। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত অণু পরমাণু অণিমা শক্তির সমন্বয় শক্তির মিলিত শক্তি হ'ল এই দেহ। তাই মন এমন সতেজ। দেহ মনেরই একটা রূপ বিশেষ—মনেরই একটা রূপ হ'ল এই দেহ। তেমনি জল যেমন বরফের, বরফ যেমন জলের রূপ, তেমনি মন হচ্ছে দেহের—দেহ এবং মনের রূপই হল দেহ। মনের রূপ হ'চ্ছে পৃথিবী, মনের রূপ হচ্ছে জগৎ। একভাবে সমস্ত জগৎই মন হয়ে যায়, সব মিশে যায়। দেহ যদি মন হ'য়ে যায়, তবে তোমরা কত বড় ভাগ্যবান, চিন্তা ক'রে দেখ। তোমরা বরফ হাতে নিয়ে বুঝতে পার জলকে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছ, বরফটা বহন ক'রলে কি জল বহন করা হয় না? দেহটাকে বহন ক'রলে মনটাকে দেখতে পাওনা, কিন্তু মনের রূপটা যে এই রকম প'ড়ে আছে সমস্ত জগতের মধ্যে বিশ্বরূপ হ'য়ে, এই রূপটাকে যদি আমরা চিন্তা করি, তবে কাজের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়। দেহ যদি মন হ'য়ে থাকে, তবে এই দেহ মনের সঙ্গে মিশবেই। বরফ যদি জল হয়ে থাকে তবে বরফ গলবেই। সুতরাং দেহ যখন মন, এই দেহ মনের সঙ্গে মিশবেই—এটাই নিয়ম এবং এটাই পথ-পদ্ধতি। এখন আমাদের কি করণীয়? স্রষ্টার যেই নিয়মে সৃষ্টি, সেই নিয়মের সাথে আমাদের মিলতি রেখে চলা—এটাই হ'চ্ছে আমাদের কাজ। তবেই সেই মন সেই হিসাবে পথ দিয়ে চ'লবে। তা না হ'লে জল যেমন

কোন দিকে ঢালু পেলেই চ'লে যায়, ঢালু পেলেই যেমন জলের গতি, এই মনও তেমনি যেদিক দিয়ে তুমি নিয়ে যাবে, সেই দিক দিয়েই ঢালুর মতন চ'লে যাবে। লোহা গলিয়ে জল ক'রে ঢালুর মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে, আর কল-কল ক'রে জলের মতন চ'লে যাচ্ছে এবং ছাঁচের ভেতর দিয়ে জমাট বেঁধে শক্ত হ'য়ে যাচ্ছে। তখন দেখে কে ব'লবে যে এটা পাতলা জলের মতন ছিল! এই মনটা হ'চ্ছে ঠিক সেই রকম। এটা যে দিকেই যাক, ঢালু দিয়েই যাবে এবং যেখানে পড়বে সেখানেই জমাট বেঁধে যাবে। মনে কর, মনটা কাকের মাত্রায় বেরিয়ে গেল কাকের একটা মাত্রা আছে, মনে কর মন সেই মাত্রা নিয়ে চ'লল এবং যেই মৃত্যু হ'ল, কাক হয়ে আবার জন্মগ্রহণ ক'রল। এখন মনটা হ'চ্ছে কি?— সে কোন সময় বসে থাকবে না। তার কাজই হচ্ছে,—খটাখট্—খটাখট্—সব সময় এইরকম করা। ওকে আটকান যায় না। দেহটাই যখন মন, আটকাবে কি করে ওকে? কাকে আটকাবে? বরফটাকে আটকাবে কি? ধরবে, —পট্ করে গলে যাবে; মনে হবে—কাকে ধরলাম?— ধরলাম শক্ত করে, জল হয়ে গেল সে। ওকে আটকাতেই পারবে না, কেউ আটকাতে পারবেনা। কি করবে এটাকে? এটাকে সব সময় সাবধানে রাখতে হয়।—যেভাবে হোক, ওটাকে কাজে লাগাব, এমন ছাঁচে ওটাকে ফেলব, যার চাপে ওটাকে একেবারে কাজের উপযোগী করে নেব। এইটা এমন জিনিস, মনটা এই রকম জিনিস যে, সলতে দেখেছ তো? তেল থাকে এক জায়গায় আর তার মাঝ দিয়ে থাকে সলতে, সলতের মাথায় থাকে আগুন—তিনটায় মিলছে। আগুন বলে—রাখ, তোরেও মিশাব, ওরেও মিশাব। সলতেরেও মিশায়, তেলেরও মিশায়— আগুন জ্বলে। তেলও ক্ষয় হচ্ছে, সলতেও ক্ষয় হচ্ছে, আর আগুন জ্বলছে। তিনটায় মিলে কাজ ঠিকই করছে। মনটা হচ্ছে ঐ আগুন—জ্বলছে। আর এর মধ্যে তেল, সলতে যাবতীয় যা আছে সব ক্ষয় হচ্ছে। তেল, সলতে, আগুন—সবটা মিলে আগুন হয়ে যাচ্ছে; মনটাও ঠিক তাই। এটার মধ্যে আগুন আছে, সলতে আছে, তেলও আছে—সমন্বয়ে মিশে যাচ্ছে। কথা হ'ল—আমাদের কি করতে হবে এখন? দেখ, যার সাজে ফেলবে, মন তার কথাই বলবে। টাকাটা দেখ এক হাত থেকে আর এক হাতে গিয়ে তার কথাই বলছে। কি যন্ত্রণা! এই রোজগার করলাম, এই গেল গিয়া? কেউ বলে না—আমার টাকা। আরে সর্বনাশ! শুধু হাত ঘুরতে ঘুরতেই চলছে! এই মনটা হচ্ছে সেই রকম জিনিস—যার মধ্যে যায়, তার কথাই বলে! ওকে আটকান মুস্কিল হয়ে যায়। এই যে পৃথিবীতে কোটি কোটি জীবজন্তু— এ কেন হ'ল? মনের সাজে মনটা বিভিন্ন মাত্রায় মাত্রায় চলে গেছে, বিভিন্ন রকম সৃষ্টি হয়ে গেছে। মনে কর এই পৃথিবীতে প্রথম ছিল দশটা-বিশটা জীব, তার পর দুটা চারটা করে বাড়তে শুরু করল। এখন এক-দুই, তিন কোটি,—লক্ষ লক্ষ কোটি জীব আছে। যতগুলি জীব, ততগুলি মাত্রা। আমাদের দেহটা একটা মাত্রায় মিশে যাচ্ছে,...... মনে কর একশত মাত্রায় গিয়ে মিশছে। এখন ধরা যাক এই একশত মাত্রা শৃগালের মাত্রা। সুতরাং শৃগাল হয়ে গেল, শৃগালের পেটে ঢুকে গেল,—মাত্রার সাথে মিশে গেল এবং মিশে গিয়ে 'হুয়াক্কা হুয়া' আরম্ভ করে দিল। কিসের মধ্যে কি, ভাল মানুষ প্রেসিডেন্ট, —তারপর কি না 'হুয়াক্কা হুয়া'?

আরে সর্বনাশ! ওর তো পাল্লা-বাট্খারার ওজন। পাল্লা-বাট্খারার ওজন তো কারও কমানর ক্ষমতা নেই। সুতরাং আমাদের কি করতে হবে? আমাদের করতে হবে— না বাবা, 'হুয়াক্কা হুয়া'র মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই, কাকের মধ্যেও যাওয়ার দরকার নেই, কারও মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। জগতে চোখের সামনে এই যে এত জীবজন্তু দেখায় কেন?— হুঁসিয়ার, এই রকম কিন্তু হতে পার! তোমরা মনে করো না—তোমাদের খাবার জন্য, ছবি তোলার জন্য এত পোকা-মাকড়, মশা-মাছি, জন্তু-জানোয়ার দেখায়! এমনি দেখা এবং দেখার আগোচর যা আছে, সব গুলিই তোমার হতে পারে; যেই কোন মুহূর্তে, যেই কোন মাত্রায়, যার-তার মধ্যে তোমরা ঢুকে যেতে পার। সাবধান! এটা এইরকম জিনিস, এটাকে আটকিয়ে রাখতে হয়। মটর গাড়ী যখন চালাও, খুব সাবধানে স্টিয়ারিং ধর, সোজা পথে চল, বে-হুঁশিয়ার হলে নর্দমায় পড়ে যেতে পারে। ঠিক তেমনি খুব সাবধানে এটাকে —এই দেহটাকে চালিয়ে নেবে। চালিয়ে নিতে গেলে ঐ আগুন, সলতে আর তেল প্রয়োজন। আমি যেই ওয়ার্ড, দেহও সেই ওয়ার্ড; আলাদারূপে কথা বলছ, কিন্তু জিনিস—বস্তু এক। যেমন বরফ আর জলে যেই পার্থক্য, আমি আর আমার মনের পার্থক্য হ'ল ঐরকম—জল আর বরফের মতন। মনটা থাকবেই। মরবে কে? মরণ তো নেই। তবে 'মৃত্যু' হ'ল একটা ভাষা। মরবে কে; 'পরিবর্তন-রূপ' কখনও মরতে পারে না, পরিবর্তন-রূপ নামে অভিহিত।— রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। জলে বাতাসে আগুনে, বস্তুতে বস্তুতে মিশে যাচ্ছে। যে আগুন থেকে, পৃথিবী থেকে জীব বা'র হচ্ছে, সেই পৃথিবীর বাতাসে, সেই আগুনে জীব মিশে যাচ্ছে। এই মনের লয় হয় না। দেহের লয় বলে যেটা বলা হয়, সেই লয়ের রূপটি হচ্ছে পরিবর্তন-রূপ। এই পরিবর্তন-রূপটাই হচ্ছে মনের লয়ের অবস্থা। মনের লয় আবার কি? যেই মনটা দেহে আছে, সেই মনটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে, অণিমার সঙ্গে মিশে গেছে! সমস্ত জগৎটাই তাই। আমি মানে মন। এই মনটা কি হচ্ছে? মনে কর তুমি কাজে বসে গেছ, বসে যাওয়ার সাথে সাথে, যেমন আমার হাত দিয়ে আমি চুলকাচ্ছি, তোমার হাত দিয়ে তুমি চুলকাও, সেইরকম তোমার মনকে তুমি গাইড করছ। তোমার হাত দিয়ে তোমাকে চুলকিয়ে যদি খুশী হতে পার, তবে তোমার মনকে তুমি চালিয়ে নিশ্চয়ই খুশী হবে। 'আমার বুদ্ধি', 'আমার বৃত্তি', 'আমার মন'—একই কথা। আমি আমার মনকে বুদ্ধির দ্বারা চালিত করব। সাধনা হচ্ছে সেইখানে। আমরা কাজ করি, ধ্যান করি, জপ করি। করে কি করছি? আকাশ হ'ল ফাঁকা, সেই ফাঁকা চিন্তা করছি, শূন্যের মধ্যে আমরা মন রাখছি, মানে মহাশূন্যের মধ্যে আমরা বসে আছি, কেননা এই সমস্ত জগৎ শূন্যে আছে। এই শূন্যের মধ্যে থেকে আমরা জপ করব, শূন্যের মধ্যে মন রাখব, শূন্যের মধ্যে নিজেকে ফেলে দেব। সেখানে থেকেই আমরা নাম জপ করব। তাতে হয় কি? এই যে এত বড় মনটা,—এত ব্যাপ্তমান মনটা— শূন্যে ফেলে দিলেই ওটা ইচ্ছা মতন যেতে থাকে, ছুটতে থাকে, হু-হু করে ছুটতে থাকে— নাগাল পাওয়া যায় না। সে তার আপন মনে চলুক, যে দিকে যায় যাক, যা খুশি ভাবনা আসুক, যেখানে খুশি মন চলুক। তোমরা কি করছ?— যেন যুদ্ধ ক'রছ। নিজের মনে যেন

যুদ্ধ ক'রে যাচ্ছ— হোক যা খুশি, যে দিকে যেতে চায় মন যাক, তুমি ভাববে—আমি আকাশে চলে যাব, এই কথা মনে ক'রবে। মনে ক'রতে ক'রতে দেখা গেল, মন শূন্যে থাকতে চায় না, নানান দিকের চিন্তায় চলে যায়, মনের মধ্যে যেন যুদ্ধ শুরু হ'ল। কিন্তু তাতেও লোকসানের কিছু নেই। মন এত বড় যে এদিক সেদিক চিন্তা করুক, ছিট্‌কিয়ে যাক নানানদিকে, কিন্তু তাতে তার কিছুই হয় না। মন যেদিকে যায় যাক, তুমি তোমার সেই যুদ্ধটা সব সময় ঠিক রাখবে—আমার মনে যা হবার হোক, আমি আমার মনকে শূন্যে ছেড়ে দেবই। এখন শূন্যে ছেড়ে দিলে হয় কি? সমস্ত জগৎটা শূন্যের উপরে আছে, সমস্ত বিশ্ব শূন্যের উপরে ভাসমান। ভাসমান অবস্থায় আছে বলেই যেই কোন মুহূর্তে মনকে যদি ভাসমান শূন্যে রাখা হয়, যেই ভাসমান থেকে, যেই শূন্যের থেকে আমরা এসেছি, সেই শূন্যে যদি মনকে নিবিষ্ট করা যায়, সাথে সাথে তোমার সমস্ত সত্তাগুলো সেই গতিটাতে চলতে থাকে। অফুরন্ত দ্রুতগতিতে চ'লতে থাকে। তখন কেবল ফাঁকা-ফাঁকা মনে হবে। —ঐ ফাঁকা-ফাঁকা যখনই মনে হবে, তখনই বোঝা যাবে কাজ হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের গতি চ'লছে ঠিক মত। যখনই ফাঁকা চিন্তা করবে, এবং চিন্তা ক'রতে ক'রতে সব ফাঁকা হয়ে যাবে, তখনই বুঝবে, তোমাদের গতি খুব চ'লছে—ফাঁকা হচ্ছে, আর কোনটাতে বাঁধা নেই। তখনই বুঝবে—গতি তোমাদের ঠিক। তার ভিতর তোমরা কি ক'রছ? নাম-জপ অবলম্বন ক'রছ;তখন তোমরা ভাবছ—কি ক'রব, জপটাকেই সঙ্গে করে নেই। এই ব'লে খুব স্পিডে নাম জপ চালিয়ে যাচ্ছ, ভীষণ স্পিডে জপ চালিয়ে যাচ্ছ। তখন হয় কি? একেবারে শোঁ-শোঁ ক'রে চলে যায়। দেখা যাচ্ছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ সব থেকে যাচ্ছে, আর তুমি অনর্গল জপ ক'রতে ক'রতে ছুটে চলেছ। এই যে একটা অবস্থা আসে, তখন মনটা কিরকম হয় জান? ঘরের ভিতর একটা গাছ থাকলে, সে যদি দেখে ঘরের মধ্যে একটা ফুটা আছে, তাহলে গাছটা সেইদিকে অগ্রসর হয়, কেমন্ ক'রে ঐ ফুটা দিয়ে বার হবে, কেবল সেই চেষ্টাই করে। তার চিন্তা—ঐ ফুটা দিয়ে যে বাইরের আলো আসছে, সেই আলোতে সে কেমন ক'রে যাবে। এবং একদিন দেখা যায়, গাছটা ঠিক সেই ফুটা দিয়ে ব'ার হ'য়েছে। দেখ, এইখানে ফুটা আর ঐখানে গাছ র'য়েছে—অথচ তার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে কেমন আলোর পথ চায়, বাতাস চায়, মুক্তির পথ চায়, মুক্ত আকাশ চায়। মুক্ত আকাশ চায় সূর্য, মুক্ত আকাশ চায় পৃথিবী। সবাই চায় মুক্ত আকাশ, মুক্ত আকাশ চায় সমস্ত বিশ্বজগৎ। তাই সবাই উর্দ্ধমুখী হয়ে রয়েছে! এই যে আকাশ পানে চিন্তাধারা, তার কারণ সমস্ত জগৎ ঐ আকাশ থেকে, শূন্য থেকে সৃষ্টি। আকাশ—নীল আকাশ—চিদাকাশ—খালি জায়গায় এত সাধনা,—আর সেখানে এই সাধনার সীমা নেই। সেই সীমাহীন থেকে যেই মন এসে উপস্থিত হয়েছে, সেই সীমাহীনের মধ্যে যদি মনকে নিবিষ্ট ক'রে রেখে দাও সেই জপকে কেন্দ্র ক'রে, ধ্বনিকে কেন্দ্র ক'রে—জপই হচ্ছে ধ্বনি, জপই হচ্ছে মূল সুর, সেই সুরকে কেন্দ্র ক'রে আমরা যদি বোঁ বোঁ ক'রে চ'লে যাই—মনে হবে দেহ শূন্যে উঠে যাচ্ছে, মন শূন্যে উঠে যাচ্ছে। আর তুমি উপর দিকে চ'লে গেছ; পৃথিবী তোমার থেকে স'রে গেছে,

তুমি শূন্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে র'য়েছ—সেই সুর নিয়ে তুমি চ'লছ। তখন দেখবে—অদ্ভুত একটা টিউন্ (tune)—সুর, সমস্ত দেহে যেটা আল্‌জাল্ অবস্থায় ছিল, এদিক ওদিক যে মন ছিল, অন্ধকারে চিন্তাগুলি ছিল, সেই চিন্তার লতাপাতাগুলো যা এদিক ওদিক ঘোলাটে হয়ে ছিল, সবগুলো এসে একমুখী হতে আরম্ভ করেছে; ফাঁকা জায়গা পেয়েছে, মুক্ত জায়গা পেয়েছে, আকাশ পেয়েছে, আলো পেয়ে গেছে, তার স্থান পেয়ে গেছে—সব একমুখী হয়ে একদিকেই চ'লছে। থাক চঞ্চল, থাক বিক্ষিপ্ত, থাক যা কিছু; তুমি তোমার সেই বুদ্ধিবৃত্তি, সেই সতেজতার যেই চিন্তাধারা রয়েছে, সেই চিন্তাধারা থেকে একটুও চ্যুত না হয়ে তোমার বৃত্তিকে ঐদিকে চালিত কর। তোমার বুদ্ধি, তোমার বৃত্তি তোমার থেকে যেই সৃষ্টি হয়েছে, সেই সৃষ্টবস্তু দিয়েই তুমি তোমাকে তোমার দ্বারা তৈরী ক'রে এগিয়ে নিয়ে যাও সেই মুক্ত আকাশে। কারণ স্বাদ আছে যে চিনিতে, সেই চিনির স্বাদ তুমি জিহ্বাতে বুঝতে পারছ, এমনি সহস্র রকমের স্বাদের কথা ঐ এক জিহ্বাতেই বলে দিতে পারে। এই রকম অগণিত বহু বহু সুরের স্বাদের কথা এক সুরে দাঁড়িয়ে যাবে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হ'চ্ছে মনকে শূন্যে ছেড়ে দেওয়া। যারা মূর্তির ভিতর দিয়ে ধ্যান করে, তারা মূর্তিকে শূন্যে ছেড়ে দেয়। দেখ, মূর্তির উপরে একটা গোল জ্যোতি দিয়ে দেয়, মানে হচ্ছে—এ গোল জ্যোতি শূন্যের প্রতীক, শূন্যের প্রতীক হিসাবেই মূর্তির পিছনে গোল দেয়। সুতরাং মূর্তি চিন্তাই কর আর শূন্য চিন্তাই কর, আর আলো চিন্তাই কর অথবা সূর্য চিন্তাই কর, সকল চিন্তাই মন্ত্রকে সম্বল ক'রে, ধ্বনিকে সম্বল ক'রে এগিয়ে যাবে। এই মহাশূন্যে গর্জন—এটা শুধু বৃষ্টিপাতেরই শেষ কথা নয়, এই গর্জন হ'চ্ছে তোমাদের মহাদৃষ্টান্ত, এই ধ্বনি নিয়েই তোমাদের মহাশূন্যে যেতে হবে। কারণ গর্জ্জন—সেই গুরু গুরু আওয়াজ, গম্ভীর আওয়াজ এবং ঐ যে বিদ্যুৎ—এগুলো কোথা থেকে আসছে? ঐ বিদ্যুৎ, ধ্বনি, জল, বাতাস ওগুলো যে ওপরের, ওগুলোই তোমাদের দৃষ্টান্ত। ঐভাবেই যাওয়ার নিয়ম। তোমাদের মধ্যেও ঐ জল, বাতাস, তেজ রয়েছে, তোমরা সেই মন্ত্ররূপ গুরু গুরু ধ্বনিকে আশ্রয় ক'রে, গুরুগত প্রাণ হ'য়ে আপন মনে আপন সুরে এগিয়ে যাবে। অনুভূতির স্বাদ আসছে না তোমাদের কাছে, উপলব্ধিতে বুঝতে পারছ না কি স্বাদ-সোয়াদ, কিন্তু তোমরা ট'লতে ট'লতে চ'লে যাচ্ছ সেই মহাশূন্যে। যেখানে ফাঁকা—ফাঁকা—অফুরন্ত ফাঁকা, সেখানে স্বাদ-সোয়াদের বালাই নেই, আছে এক অফুরন্ত সত্তা।—আপন মনে চ'লে যাচ্ছ, হঠাৎ গিয়ে এক সময় তোমাদের মনে হবে কি, কোথা থেকে যেন এক অজানা আনন্দ, অদ্ভুত অফুরন্ত একটা সত্তা তোমাদের উপর দিয়ে ঢেউয়ের মতন খেলে যাচ্ছে। মহাসাগরের ঢেউয়ের সাথে নীল আকাশের যেমন মিলতি, ঐ মিলতিরই একটা প্রতীক স্বরূপ যেমন ঐ সাগর, তেমনি তুমি আপন সুরে দুলতে থাকবে তোমার মধ্যে। যেন কোথা থেকে এক সাগরের ঢেউয়ের মত দুলছে তোমার মধ্যে। তখন মনে হবে—কোথায় যাচ্ছি? এ আমি কোথায় যাচ্ছি? এইভাবে চ'লতে চ'লতে দেখবে, হঠাৎ উপরে উঠে গেছ,— আরও উপরে উঠে গেছ। অদ্ভুত দেখবে। এই যে মহানন্দ বা চিদানন্দের কথা, এই আনন্দের কথা রেখাপাত হয়ে যাবে তোমার দেহের কণিকায় রেকর্ডের

মত এবং সমস্ত বিশ্বের পরম আনন্দের সত্তা তোমার কণিকায় কণিকায় রেকর্ডের মত দাগ হয়ে থাকবে, তোমার মনের পিনের ঘষায় ঘষায় সে যে কী আনন্দের সুর দেবে তা ভাষায় বলা যায় না, বলা সম্ভব নয়। সেই রকম তোমরা একমাত্র নামকে সম্বল ক'রে এগিয়ে যাবে সেই অফুরন্ত মহাশূন্যের ভিতর। দেখ, কেমন সুন্দর জিনিস! আমরা আছি আবার আমরা নাই, মিশে যাবার মাঝেই রয়েছি, সবাই মিশেই রয়েছি! এমন সুন্দর জিনিস—একটু কাজ ক'রে যাও, দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বুঝে নিতে পারবে। কি বুঝবে? ফাঁকা বুঝবে। কিন্তু সেই স্বাদ, অদ্ভুত স্বাদ পাবে তাতে। সাধারণতঃ মানুষেরা যেমন রসগোল্লা সন্দেশ পুতুল টুতুল দেখে, এই রকম ভাবে দেবতাকে দেখতে চায়। এখন দেখতে গিয়ে হয় কি, ঐটাই হারিয়ে যায়। তার চেয়ে যে অতি সুন্দর দেখা রয়েছে, যে দেখা ভাষাতীত, যা ভাষায় বলা যায় না, সেই দেখাটাই হচ্ছে ঐ ফাঁকা জায়গাটা। দেখবে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে। জপ করবে আর ঐ ফাঁকা চিন্তা করবে গুরুগত প্রাণ হয়ে। ব্যাস! সব সময় যে মনটা বেরিয়ে যাচ্ছে! এটা সবসময় ফোয়ারার মতন বেরিয়ে যাচ্ছে। বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঐটার আকারটা এত সূক্ষ্ম যে ঐটাকেই অণিমা বলে। অণু অবস্থায় ফোয়ারার মতন অবিরাম বেরিয়ে যাচ্ছে এবং অবিরাম বেরোচ্ছে বলেই পাহাড় থেকে সাগর সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ে ঐ ঝরণা, ঐ যে ফাউন্টেন—মাউন্টেন থেকে ফাউন্টেন হচ্ছে, ঝরণা হচ্ছে—ঐ যে ফোয়ারা, ওর থেকেই নদী সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমাদেরও এই যে মনের মধ্যে মহাসাগর চলছে অবিরাম—এই অবিরাম ফোয়ারাই হচ্ছে কাজ; এইটাকেই ধরে রাখতে হয়, ধরে রেখে কাজ করতে হয়। ধরে রাখাটা যত কঠিন বলে মন হয়, কাজের পক্ষে ঠিক তত কঠিন নয়। অতি সহজ কাজ—শুধু একটু গভীরে ফেলে দাও, খাতে ফেলে দাও। কারণ হচ্ছে কি জান? খাওয়ার পর যদি আমাদের নিজেদের চেষ্টায় রক্তটা তৈরী করতে হ'ত, তা হলে কারও আর খাওয়া হ'ত না। খাওয়াটা মানুষ চঞ্চলতা বিক্ষিপ্ততা নিয়েই খাচ্ছে। রক্তটা পরে তা থেকে আপনিই তৈরী হয়ে যাচ্ছে; এটার জন্যে যেমন তোমাদের মাথা ঘামাতে হয় না, কোন জায়গায় মোচড়াতে বা টিপ্ দিতে হয় না, এ বেলাতেও ঠিক তাই। তোমাদের চিন্তাটাকে শূন্যে ফেলে দেবে ঐ খাদ্যের মত ধুপ্ করে। খাওয়া যেমন মানুষ হেসে খায়, গল্প করে খায়, মনের অশান্তি নিয়ে খায়, তেমনি তোমরা ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মনে অশান্তি নিয়ে হোক, ঝঞ্ঝাটে হোক, তোমাদের ধ্যানের চিন্তাটাকে ধুপ্ করে ফেলে দাও ঐ উপরের দিকে। ওটাও একটা খাওয়া—গহ্বরে ফেলে দাও। ফেলে দিলে হবে কি? সিদ্ধি মুক্তি নির্বাণ—যেভাবে গঠন হওয়া দরকার, রক্ত মাংস বীর্যের মতন অটোমেটিক তৈরী হয়ে যাবে। —এটাই হ'ল ল (Law)। ফুড্ (Food) পেটে গেলে যেমন রক্ত হয়, জপ অবলম্বন করে ধ্যানের বস্তুকে মহাশূন্যে ফলে দিয়ে শূন্য চিন্তা করলে যা হওয়া দরকার, সেইটাই ইন্‌স্টিংট্—ন্যাচারাল, বুঝতে পেরেছ? এইটা আপনিই স্ফুরণ হবে, সেখানে বলার প্রয়োজন হয় না—কি ভাবে হবে। আপন সুরে সব সময় জ্বলছে, হু-হু করে জ্বলছে, অদ্ভুত! যেই কোন মুহূর্তে যা খুশি তাই করতে পারবে।

প্রশ্নঃ —নামের উপকার কি? মিনিটে লক্ষ লক্ষ নাম কি করে হয়? নামে বীজে পার্থক্য কি? নাম ক'রলে রূপ কি ক'রে দেখা যায়? এই যে মূর্তি পূজা করে, সেই মূর্তি কথা বলে কি ক'রে? আর দৈনন্দিন যত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, সে সব কিসে খণ্ডন হয়?

উত্তর ঃ এই যে উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন হয়, এই নাম এই ধ্বনি সবাই মিলে যদি এক সুরে দেওয়া যায়, এ নামের যথেষ্ট উপকার আছে। একজনে যে নাম ক'রছে, বহুজনে যদি সেই নাম করে এবং সেই সুর যদি শ্রবণে আসে, তবে এক মুহূর্তে পঞ্চাশ হয়ে যায়। পাঁচ হাজার জনে যদি একটি নাম ক'রে যায়, সেই শব্দের যে ধ্বনি, এক সুরে যেই শব্দটা হয়, সেই শব্দ যার কর্ণে যায়, সে প্রতি মুহূর্তে পাঁচ হাজার ক'রে নাম পেয়ে যাচ্ছে।

পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তি যদি একই সুরে নাম করে—যোল নাম বত্রিশ অক্ষর, তিন লক্ষ বার জপ ক'রতে সময় লাগে প্রায় আঠারো ঘন্টা, এক লক্ষ জপ ক'রতে লাগে ছয় ঘন্টা। এক লক্ষ নাম যদি বহু লোক মিলে হাজার হাজার বার উচ্চৈঃস্বরে ক'রে যায় এবং সেই নামের শব্দ-ধ্বনি যদি কানে শোনা যায়, তাহ'লে মুহূর্তে মুহূর্তে সেই অনুযায়ী ফল পায়। অর্থাৎ এমন ফল পায় যা একেবারে অদ্ভুত! গাছ-পালা বাতাস সব একেবারে ভরপুর হয়ে যায়। দৈনন্দিন যত ত্রুটি হয়, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যত বিচ্যুতি হয়, নাম যদি প্রবল থাকে, শব্দ যদি তার চেয়ে বেশী থাকে, গভীর থাকে তবে সেই ত্রুটিগুলো বিনাশ হয়ে যায়; আগুনে যেমন পুড়ে যায়, সেইরকম সব পুড়ে যায়। মুক্ত কণ্ঠে, মুক্ত চিত্তে সদা সর্বদা বীজ জপ ক'রলেও হয়, আবার নাম কীর্তন ক'রলেও হয়। ঐ বীজ জপ ক'রলেই সবটা সহজ হয়ে যায়। নাম আর বীজ, দু'টার পার্থক্য কিছু নেই, দু'টা একই। একদিন বলেছিলাম যে, ধান আর চাল। ধান পুতলে গাছ হয়, চাল পুতলে গাছ হয় না। আবার চাল না হ'লে চলেও না, মানুষ বাজারে গিয়ে চাল চায়। কিন্তু ঐ ধান না পুতলে আবার ঐ চাল পাওয়া যায় না। নামে চালের মতন কাজ হয়। সব সময় নাম ক'রতে হয়। কিন্তু ধান যদি থাকে তবেই চাল পাওয়া যায়। তাই ধান পুততে হয়। বীজ পুতে যে যে-কোন নাম ক'রবে, সেটাই সফল হবে। যেই কোন বিষয়বস্তুর নাম ক'রলে তা-ই সফল হয়ে যায়, সেইটাই অধিকার হয়ে যায়। অধিকার নিয়েই তারা যোল নাম করে চীৎকার ক'রে। বীজটা চিৎকার করে পাওয়া যায় না। বীজটা তৈরী করে বাজারে রেখে দেয় জান তো? বীজটা গোপনে রাখে—বীজধান। কিন্তু এই নাম সব সময় উচ্চৈঃস্বরে করে। উচ্চৈঃস্বরে নাম ক'রলে হয় কি?—আমাদের শরীরের মধ্যে এই সকল ব্যক্তির মতন অজস্র ব্যক্তি আছে, তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব আছে, বুদ্ধি আছে এবং জ্ঞান আছে। আমাদের যেমন ঘর-সংসার আছে, তেমনি আমাদের দেহের মধ্যে যারা আছে তাদেরও ঘর আছে, সংসার আছে; এই দেহের মধ্যে থেকে তাদেরও সব কিছু ঠিক এই রকম—তাদের স্ত্রী-পুত্র-সন্তান সব আছে। তারা কি ক'রছে? যেই নাম তুমি ক'রছ, সেই নামের সঙ্গে তারা সুর মেলাচ্ছে। ঘরে বাসনপত্র থাকলে জোরে চিৎকার দিলে বাসনপত্র ঝন্‌ঝন্ শব্দ ক'রে বেজে ওঠে। তুমি যখন উচ্চৈঃস্বরে নাম কর, তখন তোমার

শরীরের সেই অজস্র ব্যক্তিগুলি সেই নামের সুর দিচ্ছে। পৃথিবীতে যতগুলো জীব আছে, প্রতিটি দেহে, সকলের শরীরে ঠিক ততগুলো জীব আছে। অগুণতি জীব আছে সকলের শরীরে। তারা কি করে? তারাও ভগবানকে ডাকে, তারাও মুক্তির কামনা করে, তারাও দর্শনের কামনা করে। তাদের মন্ত্র কি? তারা কোন্ উপাসনা ক'রবে? সূর্য যে-পথে চালায়, সূর্য যে গতিসিদ্ধ, সকলের গতি সেইমুখী—সূর্যমুখী হয়ে যায়। তাই আমরা যখন জল চাই, প্রকারান্তরে সূর্যের কাছেই প্রার্থনা ক'রছি— হে সূর্য! তুমি জল দাও, তুমি ঠাণ্ডা দাও, তুমি চাল দাও, ডাল দাও, প্রাণ দাও। যা কিছু সূর্যের কাছেই—তেজের কাছেই তো প্রার্থনা করি। সূর্য হ'চ্ছে তেজ— তেজই হ'চ্ছে মন্ত্র, তেজই হ'চ্ছে গায়ত্রী, তেজই হ'চ্ছে আদি সুর। এই তেজের অনন্ত নাম—এই অনন্ত নামের সব ভাগাভাগী ক'রে ষোলটি নাম বত্রিশটি অক্ষর নিয়ে যখন সকলে চিৎকার ক'রে নাম ক'রতে শুরু করে, তাতে হ'য় কি? পঞ্চভূতে এই যে দেহ গড়া,—এর ভিতরে যে জীব বসবাস ক'রছে, তার মধ্যে আবার অজস্র অগণিত বিরাট বিরাট আত্মা আছে। তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চৈতন্য আছে। তুমি যখন আপন মনে বীজমন্ত্র জপ ক'রতে শুরু ক'রলে, চিৎকার ক'রে নাম ক'রতে শুরু ক'রলে— তখন কি হ'ল? তোমার সাথে সাথে দেহের সমস্ত জীব তোমার সুরে তখন সুর দিতে আরম্ভ ক'রল। সুরে সুরে তারা কি হ'চ্ছে? তাদের ভিতরে চুম্বকের ঘর্ষণে, চুম্বকের স্পর্শে চুম্বকত্ব সৃষ্টি হয়, —চুম্বক যদি একটা লোহাতে ঘষ, তবে লোহাটাও চুম্বক হয়ে যায়। সেই সুরের সঙ্গে একসুরে যখন ধ্বনিত হ'তে থাকে, তখন সমস্ত জীবগুলো ধ্বনিময় হয়ে যায়, সুরময় হয়ে যায়, সুরের সঙ্গে একসুর দিতে শুরু করে। তখন কি হয়? যেমন হারমোনিয়াম আছে, তানপুরা আছে, সেতার আছে, তবল আছে—কিন্তু সবগুলির সাথে একটা মিলতির সুর বাঁধা আছে। যখন হারমোনিতে 'সা' দিচ্ছে, তখন দেখবে তানপুরা, সেতার, তবল সবটাতে সা' ক'রছে। দেখা যাচ্ছে সবগুলো এক পর্দায় সা-সা রে-রে ক'রছে, কিন্তু সুর ভিন্ন ভিন্ন, চেহারা ভিন্ন ভিন্ন, তবু সবাই সা-সা রে-রে ক'রছে। এক সঙ্গে মিলনের সুরে সবাই বাঁধা এবং বাঁধা আছে বলেই যখন সাধতে থাকে, তখন সবগুলো একসঙ্গে একসুরে ধাপে ধাপে চ'লছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে, ভিন্ন ভিন্ন সুর আছে, কিন্তু যখন তুমি সুরে বিভোর করে দেবে, তখন সমস্ত জীবকণিকাগুলো মোহিত হয়ে যাবে, সুরে সুরময় হয়ে যাবে; তখন তারাও আপন মনে সুর দিতে থাকবে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে তারাও হরির নাম সুর দিতে থাকবে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বীজমন্ত্রের সুর দিতে থাকবে। একটা টিয়া পাখীকে কথা শেখাতে শেখাতে শেষে 'কৃষ্ণ কথা কও' শিখে ফেলে—সব কথাই শিখে ফেলে। ঠিক তেমনি এই জীবকণিকাগুলো মন্ত্রের ধ্বনি, সুরের ধ্বনি, নামের ধ্বনি করতে থাকে। মহাপ্রভু জীবকল্যাণে সহজ পথ ক'রে দিয়ে গেছেন। যুগ উপযোগী কল্যাণ-মন্ত্র তিনি দ্বারে দ্বারে দিয়ে গেছেন। তিনি বুঝেছিলেন—এই অল্প আয়ু, এর মধ্যেই ক'রে নিতে হবে, আর তো বেশী সময় নেই! বলেছেন—আকাশ পানে তাকাও। আকাশ পানে আমাদের গতি হয়ে আমাদের মধ্যে যে নামের গতিগুলো বইতে থাকে, সেই নামের গতি সমস্ত জীব-কণিকাতে

যখন বইতে থাকে, তখন সমস্ত জীবকণিকাগুলো সুরময় হয়ে যায়, সুরে লয় হয়ে যায়, ধ্বনিময় হয়ে যায়। তখন কি হয়? যে অনন্ত অগণিত জীব এই দেহের মধ্যে রয়েছে, তারা তখন কি করে? তারা তখন আপন মনে ঐ সুর ভাঁজতে থাকে। যে সুর তুমি ক'রছ, সেই সুর তারা ক'রছে। ক'রতে ক'রতে যখনই সব সুরে একসুর হয়ে গেছে, নিজেদের মধ্যে যখন আলোড়ন হয়ে গেছে, তখন তোমার আর তাদের মধ্যে নামের ঢেউ বইতে থাকে। জলে যখন সাঁতার দাও, তখন জলে ঢেউ বইতে থাকে। সেইরূপ তোমার মধ্যে যখন নামের তরঙ্গ বইতে থাকে, সেই তরঙ্গের ঢেউ তোমাতে এসে তোমাকে ধাক্কা দেবে। ধাক্কা দিলেই, তুমি শুয়ে হয়ত ঘুমিয়ে ছিলে, জেগে দেখছ, কি অপরূপ রূপ তোমার সামনে ভেসে উঠেছে! কেন ভেসে উঠছে? যে, তোমার মধ্য থেকে এমন নামের বন্যা বইতে থাকে, যা বইতে বইতে রূপের বন্যা বইতে থাকে। দেখ, সিনেমার রিল থাকে পিছনে, সিনেমা তো সামনে থাকে না! সামনে থাকে পর্দাটা। আলোর বন্যায় ঐ রিলের সিনেমার ছবি সামনের পর্দায় নিয়ে ফেলে দেয়। তাই তোমার মধ্যে কি ক'রতে থাকে? তোমার ভিতরে যে সেই চিত্রের মতন নামের বন্যা বইতে থাকে, সেই নামের বন্যার সাথে রূপের বন্যাও বইতে থাকে। সেই রূপ কি হয়? সামনে গিয়ে প্রতিফলিত হয়, শূন্যে প্রতিফলিত হয়। শূন্যে যেই ভেসে ওঠে, অমনি দেখতে পাও—বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন তোমার সামনে—অদ্ভুত রূপ! অপরূপ রূপ। এ রূপ তো তুমি জানতে না! এ রূপ কোথা থেকে এল? বাঃ! আসবে না কেন? একটা গাছ—তার থেকে ফুল হয়, তার থেকে ফল হয়, তার থেকে বীজ হয়। এতটুকু বীজের মধ্যে যে এতো বড় গাছ থাকে, তা দেখলে তো বোঝা যায় না! ফুটলে দেখা যায়, কি সুন্দর গাছ হ'য়ে বেরিয়ে গেছে, রূপ নিয়ে বেরিয়ে গেছে। এই নামের সুরের মধ্যে, ধ্বনির মধ্যে, আলোর মধ্যে যে এত সুর রয়েছে, আলো যে কত কিছু ক'রতে পারে, আলোর যে সপ্ত রং—সেই আলোর মধ্যে বহু রং-এর মিলতি র'য়েছে দেখ। সপ্ত রং—এই সপ্ত সুর। সপ্ত রং দিয়েই সেই সপ্ত স্তর ক'রে দিলেন। এই সপ্ত স্তরের ভেদাভেদ এবং মিলতিতে এক ধ্বনিতে তখন রূপ হ'তে থাকে। সেই রূপ—এই জগৎ। এই জগৎটা কিসের রূপ? আলোর রূপ। এই যে তোমরা রয়েছ, জীবজগৎ রয়েছে, এটা কিসের রূপ? আলোরই। আলোরই একটা রূপ, কারণ এই রূপের মধ্যে আলো রয়েছে, বাতাস রয়েছে, জল রয়েছে, তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে বলেই তা' জমাট বেঁধে এই রূপ তৈরী হয়েছে। প্রকারান্তরে এই রূপ আলোরই রূপ, তেজেরই রূপ। তেজের রূপ যদি এতগুলো হ'তে পারে, তবে সেই তেজের রূপ কেন আলাদা হ'য়ে বিরাট হয়ে দাঁড়াতে পারবে না? এই তেজের রূপ রক্ত-মাংসের ভিতর তৈরী ক'রে নিয়েছে, এই শূন্যের থেকে। শূন্যে ছিল বাতাস, শূন্যে ছিল আলো, শূন্যে ছিল জল। তার থেকে তৈরি হ'ল এই দেহ, এই সমস্ত মাটি। তার থেকেই যখন আমরা, তারই রূপ আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ আলোর প্রভাবে, তেজের প্রভাবে অজস্র জীব-ধ্বনি যদি এক সাথে ধ্বনিত হয়, তখন রূপের সৃষ্টি হয়। রূপ যখন তোমার সামনে এসে ব'লবেন যে, তুমি আমাকে কেন

এত ডাকছ? তখন ব'লবে যে, তুমি যখন আমার ডাক শুনেছ, আমার ডাকে এসেছ, তুমি জান আমার কি করা উচিত; আমি কি ক'রব তা' আমি জানিনা। তখন তিনি ব'লবেন—ঠিক আছে, তুমি যখন আমার উপর নির্ভর ক'রছ, আমি তোমাকে আমার মনের মতন ক'রে গড়ব। তোমার কাজ আর কিছু নয়। তুমি শুধু স্মরণে রেখো। যিনি ব'লছেন তিনি কে? তিনি সমস্ত আলোর প্রতীক, তেজের প্রতীক। তিনি 'তিনি' নয়, তিনি সমস্ত বিশ্বের আলোর প্রতীক হয়ে, তেজের প্রতীক হয়ে, রূপ হয়ে আমাদের সামনে এসেছেন। তিনি কথা ব'লছেন, তাঁর আদেশ জানাচ্ছেন, তিনি আমাদের কল্যাণ চাইছেন। তিনি দেহী, এই দেহের থেকেই বিদেহীর চেহারা নিয়ে তিনি দেহী রূপে আমাদের সামনে এসেছেন। এই আসা অতি কঠিন নয়, অসম্ভব নয়। কারণ আকাশ-বাতাসের মধ্য দিয়ে তিনি কথা ব'লতে পারেন, আকাশে বাতাসে তিনি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারেন। আকাশ বাতাসের ভিতর দিয়ে যদি সবকিছু চালিত হতে পারে, তবে কেন আসবে না এত মহিমা? অনন্ত মহিমা-শক্তি কেন বিকাশ হবে না? বিকাশ না হওয়ার কি আছে?

এই যে পাথরে কথা বলে, কি ক'রে? আজ থেকে কত হাজার হাজার বছর হ'ল পাথর পূজো ক'রে আসছে। মূর্তি সম্বন্ধে আমি কিছু বলিনা, মূর্তিকে আমি এড়িয়ে আসছি, মূর্তি সম্বন্ধে আলাদা ক'রে বলিনা। তবু বলছি, এই যে পাথর পূজো ক'রে আসছে, সেটা নিছক মিথ্যা হ'লে এতদিন ধরে চলতে পারেনা। একটা অসত্য জিনিস এতদিন স্থায়ী হতে পারেনা। আজ থেকে হাজার, হাজার, হাজার বছর ধরে সেই পাথর পূজো করে আসছে, সেই পাথর কোথা থেকে প্রাণ পেয়েছে? এই পাথরের মধ্যে মহাপ্রভু বিষ্ণু দর্শন ক'রলেন, তিনি সেই পাথরকে জড়িয়ে ধ'রলেন, পাথরকে কোল দিলেন। পাথরের মধ্য থেকে কত জিনিস পেয়েছে কতজনে। কেন পাবে না? পাথরকে কোল দিলেন। পাথরের মধ্য থেকে কত জিনিস পেয়েছে কতজনে! কেন পাবে না? পাথরের রূপ তার নিজস্ব রূপ নয়। পাথর ব'লছে—আমার রূপ আমার রূপ নয়, আমি মাটির থেকে গড়া। পাথর যে মাটি, একথা কি কেউ বিশ্বাস ক'রবে? পাথর আর মাটি তো এক নয়! পাথর হ'ল ভীষণ শক্ত। পাথর বলছে—আমি মাটি; মাটি ব'লছে— কি করে যে আমি পাথর হ'লাম তা' তো আমি জানি না, কিন্তু আমি শুধু একটাই জানি যে, সর্ব অবস্থায় মাথা উঁচু করে আমি ঊর্দ্ধগামীর চিন্তা ক'রছি। ঊর্দ্ধগামীর চিন্তার ফলে আমার দেহ ক্রমশঃ ক্রমশঃ শক্ত হয়ে গেল। একদিন দেখলাম—আমি যে বালুময় ছিলাম, তার থেকে শিলাময় হয়ে গেলাম, পাথর-আকার নিলাম। তখন সে ব'লছে—আমি কি ক'রে পাথর হলাম? পাথর হওয়ার কারণ কি? মাটি তখনই পাথর হয়, মাটি তখনই জমাট বাঁধে যখন ঊর্দ্ধচিন্তায় ঊর্দ্ধগামী হয়ে ঊর্দ্ধভাবনায় সে বিরাজ করে। ত' হ'লে দেখা যাচ্ছে, ঊর্দ্ধচিন্তায় জমাট হয়। সেই পাথর যখন স্মরণে আসবে, তখন তার মধ্য থেকে তুমি সেই সুরটাই পাবে, ঊর্দ্ধচিন্তা ঊর্দ্ধগামীর ভাবনায় সে এমনভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। একটা রূপের থেকে যদি আর একটা রূপের সৃষ্টি হয়—পরিবর্তন হয়, তখনই বুঝবে তার প্রাণ আছে; প্রাণ না থাকলে এক রূপ থেকে আর এক

রূপে পরিবর্তন হয় না। মাটি ব'লছে—আমি একদিন কোথা থেকে এলাম, তা তো আমি জানি না! এই যে মাটি দেখা যায়, এই মাটি একদিন ছিল না,—ছিল গলিত, ছিল ধাতু, ছিল আগুন। আগুন-মাটি কি রকম দেখ, আপনা-আপনি বা'র হয়ে আগুন জমাট হয়ে গেল। এই যে আমাদের জীবনের চিন্তাধারাটা সেই ভাবে যদি ঊর্দ্ধ দিকে রেখে মন-আকাশকে চিন্তা করি, যেই কোন রূপকে চিন্তা করি এবং সেই চিন্তার সাথে সাথে যদি নাম করি, নামের সাথে সাথে আমরা নামময় হয়ে যাবো। সেই জন্য সর্ব অবস্থায় অজস্র নাম ক'রতে হয়। এত অগণিত জীব আমাদের শরীরের মধ্যে আছে, অজস্র নাম না ক'রলে সেই জীবকণিকাগুলো বেশী নাম পাবে না, কারণ অজস্র নামে তারাও নামময় হয়ে যায়। রাজা তো দান ক'রলেন এক কোটি টাকা; দেখা গেল প্রত্যেকে আট আনা ক'রে পেল, আর সবাই ব'লতে আরম্ভ ক'রল—দানের নাম শুনে এত দূর থেকে এলাম, পেলাম মাত্র আট আনা পয়সা। অর্থাৎ দুই কোটি লোক দাঁড়িয়ে গেছে। রাজা ব'ললেন—আমি তো এক কোটি টাকা দিলাম, কিন্তু পেল মাত্র আট আনা ক'রে। তোমাদের ভান্ডারের যিনি রাজা, যিনি তোমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে এতগুলি জীবকে দান ক'রবেন সেই নাম, অতগুলি জীবকে সেই নাম যদি দান ক'রতে হয়—একটা তো জীব নয়, এই শরীরে কোটি কোটি জীব আছে—তাদের যদি আধা পয়সা করে দাও, তা' হ'লেও অনেক দিতে হবে। তাই বেশী ক'রে নাম বাড়াতে হয়,—টাকা যেমন ব্যাঙ্কে রাখে, তার সুদ তো হয়। সুদে সুদে বাড়তে থাকে। নামেরও সুদ আছে। নামের সুদ কি রকম? নাম হ'চ্ছে—সকলে মিলে একত্রিত হয়ে হাজার হাজার ব্যক্তি একই সুরে নাম ক'রলে, সেই নাম তোমার কর্ণে গেলে তোমার প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে ঐ হাজার হাজার নাম হয়ে যাচ্ছে। তা' হ'লে এক ঘন্টায় দেখা যায় তোমার ক-ত নাম বেড়ে গেছে! এই ভাবে ধ্বনিতে ধ্বনিতে নাম ঘন্টার পর ঘন্টা হ'তে থাকলে দেখবে, শরীরের প্রত্যেকটি জীব ভরপুর হয়ে গেছে; ভরপুর হয়ে তারাও তখন এইভাবে ধ্বনিত হবে। তাদের মধ্য থেকে যখন নাম শুরু ক'রে দেবে, ঐ জীবগুলো তখন উচ্চৈস্বরে 'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে। তারা যখন নাম ক'রতে আরম্ভ ক'রবে, দেখবে তোমার ভিতর থেকে একটা গুম্ গুম্ ধ্বনি হ'তে থাকবে। তখন সেই মৃগের মধ্যে যেমন কস্তুরি থাকে, যা'র এমন সুগন্ধ বের হ'তে থাকে যে হরিণ ছুটতে থাকে এই ভেবে—এমন গন্ধ কোথা থেকে এল, তেমনি তোমার মধ্যে এমন সুন্দর ধ্বনি—ঐ যে বলে নূপুরের ধ্বনি, ঐ ধ্বনি সোঁ সোঁ ক'রে শব্দ ক'রে বইতে থাকবে। তখন দেখবে, ঐ আত্মার সুদে আসলে কাজ হয়ে যাচ্ছে। ঐ মহাব্যাঙ্কে, বিশ্বব্যাঙ্কে তোমার জমা হ'ল। তখন বুঝতে পারবে, ঐ সোঁ সোঁ ধ্বনি, সর্প যেমন ফোঁস ফোঁস করে, সেই অনন্ত নাগ অনন্ত ফণা বিস্তার ক'রে যখন চ'লতে থাকে, তখন সোঁ সোঁ শব্দ ক'রে চ'লতে থাকে, তেমনি সোঁ সোঁ ধ্বনি তোমার এই মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর থেকে সহস্রার—এই সপ্তচক্রের ভিতর দিয়ে ফণা বিস্তার ক'রে উঠতে থাকবে। সেই সোঁ সোঁ ধ্বনিতে এমন একটা আনন্দ হ'তে থাকে তখন, যেমন সাগরের পারে গেলে দেখা যায়, সুন্দর একটা বাতাস ঝাউ গাছকে দোলায় এবং তা' থেকে একটা সোঁ সোঁ

শব্দ হ'তে থাকে, যেটা শুনতে অতি ভাল লাগে,—তোমার মধ্যে তেমনি অনন্ত সাগরের ঢেউ বইতে থাকবে, অফুরন্ত আনন্দের উন্মাদনা হ'তে থাকবে। কোথা থেকে আসছে জান না, কিন্তু তোমার মধ্যে ব'য়ে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে গেলে যেমন কোথা থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে—হাসনা হানা ফুলের গন্ধ, তেমনি অফুরন্ত একটা আনন্দ আড়াল থেকে তোমার মধ্যে বইতে থাকবে; তুমি তখন আত্মহারা হয়ে যাবে। এই আত্মহারা কথাটা—এটা আত্মাতেই স্থিত হয়। এই আত্মহারা কি এমনি হয়? আত্মহারা তখনই হয়, তখনই উর্দ্ধবাহু হয়ে হাত উপরে উঠে যায়, শ্বাস যেমন উপরে ওঠে, তেমনি আত্মহারা হ'লে শ্বাস উপরে ওঠে। আত্মহারা হ'লে আত্মা আত্মাতেই স্থিত হয়, তখন আপনিই স্থিত হয়ে ভরপুর হ'তে থাকে। তোমার নাম তুমি কেমন ক'রে কর? তোমার নাম, তোমার মধ্যে অজস্র যারা বসবাস ক'রছে, তারাই ব'সে ব'সে নাম ক'রছে। সেই নাম তোমারই অঙ্গ, অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এবং যুক্ত আছে বলেই তুমি সেইভাবে সেখানেই যুক্ত এবং তাতেই তোমার কাজ হাসিল হয়ে যাচ্ছে। সেখানেই তুমি ভরপুর হ'চ্ছ, সেখানেই তুমি আত্মহারা হয়ে ডুবে যাচ্ছ। যেটাকে চিদানন্দ বলে, ব্রহ্মানন্দ বলে, তাকেই আত্মস্থ বলে। সেই অবস্থায় যখন আসবে, তখন জীবলোক, মহলোক একলোক হয়ে যায়, সেইটাই আলোকিত হয়। তারই জন্য জন্ম হচ্ছে এই জীবলোকে—জীবলোকে জন্ম হ'চ্ছে আত্মস্থ হওয়ার জন্য। কপাল—ভাগ্যের জন্য সৃষ্টি হয় না, আত্মস্থ হওয়ার জন্যই সৃষ্টি। তোমরা সেই লোকে রয়েছ, তোমাদের হ'তে বাধ্য তোমরা তারই পথিক এবং যান্ত্রিক।

/ প্রশ্ন ঃ—বেদ কি? বেদ কোথা থেকে এল?

উত্তর ঃ— বেদ হচ্ছে ধ্বনি, ধ্বনি হচ্ছে সুর, তাই বেদ কখনো আসে নাই, চিরকাল ছিল। শূন্যের যেমন শেষ নাই তেমনি ধ্বনিরও শেষ নাই, চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবে। এই সুর নিয়ে হলো জগৎ সৃষ্টি। তখন ব'লছে— সুর চিরকাল থাকলে তাতে যদি সৃষ্টি, তবে এই মৃত্যু যেটা, যে মারা যায়, সে কি আবার ফিরে আসে? আমার যদি কেউ মরে, সে কি আবার ফিরে আসবে? বললাম— জল যখন সূর্যের টানে চলে যায়, ডোবা, খাল, বিল, নদীর সব জল চলে যায়, ডোবা কি বলবে—আমার জল ফিরে এসেছে? আবার জল যখন ফিরে আসে বৃষ্টিতে, সেই ডোবা, সেই খাল, নদী সব ভরে যায়। ভরে যখন, তখন সব জলই তাতে আছে বুঝতে হবে। সব জল যখন চলে যায়, শূন্যে গিয়ে এক জায়গাতে নদী-খাল-বিলের সব জল একত্র হচ্ছে, তখন আর জলের কোন নাম নাই, খাল বিল এ নাম আর নাই। তখন কেবল জল। যেমন খাল বিল নদীর জল সাগরে পড়ে তখন সব সাগর হয়ে যায়, সব জল নুন হয়ে যায়, তখন যেমন খালবিলের জল বলে কিছু থাকে না; আবার সাগর থেকেই খাল-বিল-নদীর সৃষ্টি, সাগর যখন আবার তার জল পাঠিয়ে দেয় খালে বিলে নদীতে, তখন সেই জল আলাদা নাম নিল—খালের জল, বিলের জল, নদীর জল। তাই মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন সব আত্মা একত্র মিশে যায়। তখন আর এর আত্মা তার আত্মা নেই, তখন কেবল আত্মা। আত্মা যখন আসে, তখন আসার মুখী হয়েই আসে। সাধক তখন বলছে—

সব আত্মা যদি একত্র হয়, তবে এক এক আত্মা এক এক কাজ করে গেছে, তা হলে যে আত্মা ভাল কাজ করে গেছে এবং যে আত্মা খারাপ কাজ করে গেছে তাদের কি হবে? তখন বললাম—যেমন মনে কর হাতের সোনার চুড়ি—ষোল আনাই পাকা সোনা, আংটি—তাতে দু আনা খাদ, রুলী—তাতে তিন আনা খাদ, গলার হার, তাতে চার আনা খাদ—এই সব যখন একত্র ক'রে ঢালায় ফেলে দেবে, তখন সবটার থেকে ষোল আনা পাকা সোনাটাই বের ক'রে নেবে, আর যেটার যেটুকু খাদ মেশান ছিল সেটার খাদ আলাদা হয়ে গেল। তখন খাঁটি সোনাটা বলবে না—আমি আংটির, আমি রুলীর, আমি হারের। তখন সব সোনা সমান। আত্মাও ঠিক সেই রকম—যে আত্মার যতটুকু খাদ আছে, যখন সব আত্মাকে ঢালাইতে ফেলে দেওয়া হয়, তখন যার যার খাদ আলাদা হয়ে যায়। আত্মাগুলি তখন আর 'আত্মাগুলি' থাকে না, কেবল আত্মা হয়ে যায়। সেই আত্মা শুদ্ধ নির্মল, সেই আত্মাই সুর। ফিরে আসে ঐ খাদগুলি। যখন আত্মা আসবে তখন তোমার দু আনা খাদ ছিল নিয়ে যাও, দু আনা চলে এলো। তোমার চার আনা খাদ ছিল নিয়ে যাও, চারআনা খাদ চলে এলো—তোমার দশ আনা খাদ নিয়ে যাও, নিয়ে এলো দশ আনা। এইভাবে যার মধ্যে যত খাদ ছিল, সব নিয়ে জন্ম নিল।

প্রকৃতি পুরুষের মিলনেই এই জগৎ সৃষ্টি। মন যখন মনন করলো, তখনি সৃষ্টি হলো। সেই মন সকলের মধ্যে আছে—মন বীজ হয়ে সকলের মধ্যে রয়েছে। একটা বটের বীজ কতটুকু, কিন্তু সেই বীজ মাটিতে পুতলে কত বড় প্রকাণ্ডগাছ হয়! বটবীজ দেখলে বুঝা যায় না তার মধ্যে অত বড় গাছ আছে। এতটুকু বীজের কত বড় শক্তি! সেই বীজ-শক্তি সকলের মধ্যে আছে। বীজের ধর্ম হলো ফুটে বা'র হওয়া, মাটিতে বীজ পড়লেই সে ডাল-পালা মেলে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ দিকে উঠতে থাকে। যে বীজ মাটিতে পুতেছ, সেই বীজই তখন হাত বাড়িয়ে উপর থেকে পেড়ে নিতে হয়। তোমাদের সকলের মধ্যে যে বীজ আছে, সেই বীজ তোমাদের ভিতর পোতা আছে। সেই বীজ চায় ফুটে বার হতে, সেই বীজ ক্রমশঃ উপর দিকে ঠেলে উঠতে চায়। দেখ, সন্তান যখন গর্ভে থাকে, সেই সন্তান যখন বার হতে চায়, তখন প্রসূতির ব্যথা যদি না থাকে তবে সকলে চিন্তায় প'ড়ে যায়, ব্যথা নাই কেন? ব্যথা না হ'লে সন্তান যদি মারা যায়? ডাক্তার আনে, ডাক্তার এসে ব্যথা বাড়াবার জন্য ওষধ দেয়, ইনজেকসন দেয়। দেখ চিন্তা করে, কি আশ্চর্য! ভাল মানুষ, তার জন্য ব্যথা চায়, ব্যথা না হ'লে সুপ্রসব হয় না। যত জোরে ব্যথা ওঠে, ততই সকলে স্বস্তি পায়, এবার প্রসব হবে। তাই তোমাদের শরীরের বীজ-শক্তি যখন উপরে উঠতে চায়, মূলাধারে থাকে অফুরন্ত শক্তি, সেই বীজ-শক্তি যখন উপরে ঠেলে উঠতে চায়, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রারে যখন উঠতে চায়, তখন ব্যথা চায়, ব্যথা ছাড়া উঠতে পারে না, মানে সুপ্রসব হয় না। সহস্রারে উঠলেই সুপ্রসব অর্থাৎ সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বাণ, নির্বিকল্প। সেই সুপ্রসব হ'তে গেলেই ব্যথা চাই, তাই জীবনে রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য আঘাত। যত আঘাত আসবে, তত সুপ্রসব হবে। আঘাত তোমাদের আক্কেল দেবার জন্য নয়, এই আঘাতে আঘাতে দ্রুত সুপ্রসব হয়।

যার যত আঘাত বেশী আসবে, তার তত তাড়াতাড়ি সুপ্রসব হবে। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত—হে ভগবান! যত আঘাত আছে আমাকে দাও, দিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি ফুটিয়ে দাও। জীব-শক্তি চান না ভিতরে আবদ্ধ থাকতে, তিনি চান ঠেলে উর্দ্ধমুখী উঠতে। তাই আঘাত, রোগ, শোক, দুঃখ, ঝঞ্ঝাট।

প্রশ্ন ঃ—জপে বসলে নানা বাজে চিন্তায় মন চলে যায়—এটা কেন হয়?

উত্তর ঃ—সব জিনিস নীচের দিকেই পড়ে—এটাই হলো নিয়ম। জল ঢাল, তা নীচে পড়বে। কোন জিনিস ঢিল দাও—নীচে প'ড়বে। নীচ দিকে গতি—এটা হলো নিয়ম। মন যে আজে-বাজে চিন্তা করে, এটা হচ্ছে নীচ চিন্তা, এটা মন ক'রবেই। এটাই নিয়ম। কিন্তু এতে তোমাদের ভাববার কিছু নেই, কারণ এটা কেন হচ্ছে? এতে ধূম্রের সৃষ্টি হ'চ্ছে। দেখ, সব জিনিস নিম্নমুখী, কিন্তু ধোঁয়া উর্দ্ধমুখী। আগুন যদি জ্বালাও, তখন সব ধোঁয়া উর্দ্ধমুখী উঠবে, তাকে কিছুতেই নিম্নদিকে রাখতে পারবেনা ধরে। সে উর্দ্ধদিকে উঠবেই, তার গতিই হ'লো উর্দ্ধ। জল যদি জ্বাল দাও, দেখবে সব জল ধূম্রাকারে উপরে উঠে যাচ্ছে। যেয়ে কি হ'চ্ছে? মেঘের সৃষ্টি হ'চ্ছে। মেঘ আবার সূর্যেরই সৃষ্টি, সূর্য না থাকলে মেঘ হতো না। মেঘ গিয়ে সূর্যকে ঢেকে রাখে, কিন্তু মেঘের সাধ্য নাই সূর্যকে চিরদিন ঢেকে রাখে। সূর্যের তাপেই মেঘ আবার সরে যায়। সেই সূর্যের অগ্নি তোমাদের মধ্যে সব সময় আছে, তার প্রমাণ তোমাদের দেহের তাপ। সূর্য না থাকলে এ তাপ থাকতোনা;তাহলে তোমাদের মধ্যে ব্রহ্মাগ্নি আছে। সেই ব্রহ্মাগ্নি ধূম্রাকারে চিন্তারূপে বা'র হয়ে যাচ্ছে, আর তোমাদের মনে হ'চ্ছে—এত আজে-বাজে চিন্তা মনে ওঠে, তবে আমাদের হবে কি ক'রে? একথা হ'লো, ঐ মেঘ সূর্যকে ঢেকে রাখার মতন, আবার এই তোমাদের ব্রহ্মাগ্নির তেজেই সেই মেঘ অপসারিত হবে, সূর্য দেখা দেবে।

এই যে আজে-বাজে চিন্তাগুলো—এর একটা স্তর আছে। সেই স্তর পর্যন্তই এই চিন্তা থাকবে। তুমি যদি সেই স্তরের উর্দ্ধে যেতে পার, তবে দেখবে নিজের ইচ্ছায় গ্রহ-গ্রহান্তরে যেতে পারছ, আপন ইচ্ছায় ঘুরছ, সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ তোমাকে সাহায্য করবে, আর এই সব আজে-বাজে চিন্তা আকু-পাকু ক'রবে, তোমাকে স্পর্শ ক'রতে পারবেনা। একদিন শিশু ছিলে, যৌবনে এলে। যৌবনে ছিলে, বার্দ্ধক্যে এলে—চুল পাকলো। পেট ভ'রে খেলে, আবার ক্ষুধা। এসব কি তুমি নিজের ইচ্ছায় ক'রতে পেরেছ? সব যেমনি আপনা থেকে, ঐটাও তেমনি আপনি হবে। তোমাদের তবে করণীয় কি? তোমাদের করণীয় হচ্ছে—সংসারের কর্তব্য পালন করে, বিবেককে সঙ্গে রেখে, মনের নির্দেশ মতন চলবে। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ তা মনই জানিয়ে দেবে। আজে-বাজে চিন্তার দিকে মন দেওয়ার দরকার নেই। যা ইচ্ছা তা মনে আসুক। সূর্যকে এখন দেখতে পাচ্ছ না, তাই তোমাদের মনে হচ্ছে সব অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকার নয়—ঐ মেঘ স'রে গিয়ে যখন সূর্য দেখা দেবে তখন দেখতে পাবে—কী আলো! কী তেজ! তোমরা সকলে কেবল 'তাধিন্ ধিন্ না, তাধিন্ ধিন্ না' ক'রে ক'রে জপটা চালিয়ে যাও, আর কিছু নয়।

প্রশ্ন ঃ—সপ্তচক্র কি? এই সপ্তচক্র জাগলে কি কি অনুভূতি আসে? সহস্রার কি করে জাগে?

উত্তর ঃ—বাল্মীকি মুনি কি ক'রলেন? যখন তিনি রাম নামে তন্ময় হ'লেন, তিনি আজ্ঞাচক্রে মন নিবিষ্ট করলেন। হঠাৎ দৈববাণী হ'ল—তোমার আজ্ঞাচক্রে তো হবেনা, মূলাধার থেকে শুরু ক'রতে হবে; তিনি তখন মূলাধার থেকে রাম নাম শুরু ক'রলেন। মূলাধার থেকে তিনি যখন যাত্রা করলেন, তখন পথে তিনি কি কি অনুভব করলেন? মূলাধার থেকে তিনি যখন সহস্রারে যাচ্ছেন, তখন কি কি ভাব নিয়ে যাচ্ছেন, তাই তিনি বর্ণনা ক'রছেন। মূলাধারের মূল গ্রন্থিতে অপূর্ব সব দেখছেন—সেখানে সব পৃথিবী, গ্রহ উপগ্রহ, সব আপন মনে ধীর স্থির হয়ে, আপন মাত্রা রেখে তার গতিতে কি যেন এক অদ্ভুত চাহিদার পিছনে, অদ্ভুত পূরণ ক'রবার অভিলাষে অগ্রসর হ'য়ে চ'লছে। এই মূলধারে মূল গ্রন্থিতে যখন তিনি নিজে তন্ময় হলেন সেই রাম নামে, সেই 'ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের' সত্তা নিয়ে যখন গভীর সুরে সুর দিলেন, তখন কি করলেন? তিনি স্বাধিষ্ঠানে এলেন। স্বাধিষ্ঠান হ'চ্ছে মূল গ্রন্থির সাথে শিবশক্তি যেখানে শুরু হলেন, সহস্রার যেখানে বিকাশ করলেন, তখন সেখানে দেখলেন সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ থেকে যেন হঠাৎ তাদের একটা ইচ্ছাশক্তি এমন ভাবে এসে নিজের ভিতরে আলোড়ন আরম্ভ করেছে যে, সমস্ত প্রকৃতির প্রকৃত সত্তার ভিতরে এক অদ্ভুত আলোড়ন হয়ে যাচ্ছে। সে আলোড়নটা কি? সে উন্মাদনা অদ্ভুত!—সমস্ত গ্রহ, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন অদ্ভুত একটা চাহিদার পিছনে আপন মনে ছুটে চলেছে। কেন চলেছে? ঋষি দেখছে, এই ইচ্ছাশক্তির একটা হ'ল কাম! সেই কামটা হচ্ছে বৃত্তির; প্রকৃতি বৃত্তি জাগাচ্ছে, সাথে সাথে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে—অফুরন্ত গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবী আপন মনে বা'র হয়ে যাচ্ছে অজস্র অগণিত সেই ফোয়ারার মতন পৃথিবী বার হচ্ছে দেখে তিনি বললেন—অপূর্ব! অপূর্ব! কি অদ্ভুত! সেই কুলকুচি-জলের মতন, যেমন জলগুলা অজস্র কণা-কণার মতন বা'র হয়ে যায়, সেই রকম ঝরণার মতন পৃথিবী বা'র হচ্ছে। তখন তিনি শুধু বলছেন—অপূর্ব! অপূর্ব! এর কোন ব্যাখ্যা নেই। মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠানে এসেছেন—তারই ব্যাখ্যা নেই। ঋষি যখন মণিপুরে এলেন, সেখানে এসে নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন গ্রহের ভিতরে, দেখতে পাচ্ছেন এক অপূর্ব বিরাট শক্তি—যার এদিক নাই, ওদিক নাই—তার থেকে অদ্ভুত হাতীর শুঁড়ের মত বা'র হয়ে গেছে;.................তার উপরে দেখেন সমস্ত গ্রহ পৃথিবী সব কিছু যেন নৃত্য করছে।—এই হ'ল মণিপুর—নাভিমূলে অবস্থিত। তারপর আবার দেখছেন—একি! কি আশ্চর্য! এই কি রাম! এই কি বিষ্ণু! এই সেই দেবতা! তাঁর ভিতরে তখন জাগতে আরম্ভ করেছে। তাঁর কাছে যখন তিনি গেলেন, গিয়ে দেখেন—অদ্ভুত তাঁর স্বচেতন; অদ্ভুত এক বিরাট ভরপুর হয়ে, অফুরন্ত একটা শক্তি এন্তার আপন মনে বইছে এই নাভিমূলে। তাই শিশুরা নাভি দিয়ে পান করে; মুখ দিয়ে তখন পান ক'রতে পারেনা, নাভির সাথে মায়ের সাথে একটা যোগাযোগ থাকে, সেই যোগাযোগ সূত্রে নাভিমূলে তখন তার দেহ বেঁচে থাকে। তখন তিনি খুঁজে পেলেন এক অদ্ভুত সুর; সেই সুরের, সেই মন্ত্রের

একটা ব্যাখ্যা তিনি এখানে খুঁজে পেলেন। এই অপূর্ব ব্যাখ্যার সাথে নিজের সমস্ত সত্তা মিলিয়ে দিয়ে হাত জোড় করে শুধু হা বিষ্ণু, হে বিষ্ণু, হে হরি করে চিৎকার করছেন। উন্মাদ হ'য়ে বলছেন—কোথায় তুমি, এমন করে অপূর্ব লীলার মাঝে এত অফুরন্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ ক'রছ, আমাদের বুঝাবার জন্য? আমরা অবুঝ বুঝি না, তাই মণিপুরের কোঠরে এসে যে অভিজ্ঞতা যতটুকুন সঞ্চয় ক'রলাম, এই অভিজ্ঞতা যেন জগতের কল্যাণে, জীবের কল্যাণে লাগাতে পারি—হে প্রভু! তুমি সেই আশীর্বাদ কর। জীবনের যাত্রার পথে জীব অজ্ঞ, জীব বোঝেনা এত অপূর্ব স্বাদ সোয়াদ অনন্ত মহিমার প্রকাশ এই মণিপুরেই রয়েছে, যা কেউ জানে না, যা কেউ বোঝে না। যেই চক্ষু তুমি দান করেছ, এই চক্ষু দিয়ে ঐটুকু দেখার শক্তি এই জীবলোকের নাই। তুমি সেই আজ্ঞা-চক্রের দৃষ্টি খুলে দাও, অন্তর-চক্ষু খুলে দাও, বুঝতে শেখাও, তা'রা যেন —এই জীবলোক যেন পাগল হয়ে সেই মূলাধারের দরজা দিয়ে মণিপুরে এসে হাত জোড় ক'রে দু'হাত আকাশ পানে তুলে, মহাপ্রভু যেমন ক'রেছিলেন তেমন ক'রে যেন সবাই আকাশ পানে তাকিয়ে থাকে। তাই মহাপ্রভু যখন বুঝলেন, তখন সেই বাল্মীকির সুরের সুর তাঁর ভিতরে জেগে উঠল। তিনি আকাশ পানে তাকিয়ে 'হে হরি, হা হরি' ক'রে উন্মাদ হয়ে এই রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে বেড়িয়েছেন। তিনি নিজেকে বুঝেছিলেন। তাই হরি হয়ে 'হে হরি' 'হা হরি' ক'রে হরি ভজেছেন।

বাল্মীকি আর মণিপুর থেকে উঠতে চাইছেনা না। তিনি কি বলছেন?—বলছেন,—এই মণিপুরে বসেই তোমাকে ভজনা করব। এর বেশী আমি উঠতে চাই না।— কিন্তু তার ভিতর থেকে আবার উথাল পাতাল হচ্ছে—কে যেন ভিতর থেকে বলছে—তুমি অগ্রসর হও, আরও—আরও—আরও, অ-নে-ক রয়েছে! এখনো কিছু নয়, আরও—আরও—রয়েছে—আরও।—আরও রয়েছে? আরও?—আবার তিনি রাম নামে বিভোর হয়ে মণিপুর থেকে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন অনাহতের রাস্তায়.....আস্তে আস্তে অনাহতে এসে ঠেকলেন। অনাহতে এসে তাকিয়ে দেখলেন—তাঁর আর দুই চক্ষু নেই, সমস্ত চক্ষু তাঁর চক্ষু হয়ে গেছে, সমস্ত লোক তাঁর হয়ে গেছে—যেদিকে তাকান, সেদিকেই তিনি নিজেকে খুঁজে পান—তিনি অদ্ভুত হ'য়ে গেছেন! তখন তিনি নিজেই ব'লছেন—হে রাম! আমি গণ্ডীর মধ্যে তবে এখনও আছি? গণ্ডীর বাইরে তিনি, সমস্ত লোকে তিনি বিরাজ ক'রছেন। সেই অবস্থায় অবস্থিত হয়ে অনাহতে সেই আত্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এবং সর্বশক্তির সমন্বয় সুরে তিনি নিজেকে বিভোর ক'রে দিয়ে এক অদ্ভুত লোকে বিরাজ করছেন! সেখানে দেখেন—সমস্ত সাগর ভরপুর হয়ে আছে, সমস্ত বিশ্বময় উথাল পাথাল করছে ঢেউ! নিম্নে সাগর, ঊর্দ্ধে সাগর জলময় হয়ে প্রতি জলকণিকায়, প্রতিটি সত্তায় যেন কথা বলে। তাদের বুঝ আছে, সচেতনতা আছে,—এক অদ্ভুত নীলবর্ণ—তাই নীলাকাশ, তাই কৃষ্ণ এবং রাম নীলবর্ণ! সেই বর্ণগুলো তখন তিনি বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি ক'রতে আরম্ভ করলেন। এই সপ্তবর্ণ, সপ্তসুর যে সপ্তরঙে বিভূষিত, সেই রংগুলো ভিতর থেকে এসে উদ্ভাসিত হ'ল এই সূর্যলোকে। সূর্যের

ভিতরে রয়েছে অফুরন্ত রং, যেই রং-এর মহিমায়, যেই রং-এর তারতম্যে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে—এই জগতের মহিমা, জগতের বর্ণনা, রং-বেরং-এর বর্ণনা। এই রং-বেরং এর বর্ণনায় অনন্ত মহিমার প্রকাশ। সূর্যের ভিতরে সেই রং-ঢালা আলো জ্ব'লছে সর্বলোকে, সর্ব অবস্থায়। তিনি অনাহতে থেকে দেখলেন—একটিমাত্র সূর্য নয়, অগণিত সূর্যের ধারা রাধার শক্তি-রূপ এই অনাহতের কোঠরে আপন মনে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। বোঝা যায় না এই অন্তরের কথা—অন্তর্যামিত্ব—এই অন্তরের বাণী—এই অন্তর নিহিত সুর সূর্যলোকের সুর। এই সূর্যলোকের সুর পদ্মের আকারে অনাহতে আপন মনে বইছে। মানুষ যখন দুঃখ পায়, শোক পায়, আনন্দে যখন আত্মহারা হয়, প্রেমানন্দে যখন আলিঙ্গন দেয়, তখন এই আত্মা এই অনাহতে থেকে সেই ধ্বনিজগতে থাকে। এই অনাহতের ধ্বনি অদ্ভুত ধ্বনি, এই ধ্বনিই হ'চ্ছে মহানাম, মহাসুর। তারপর তিনি ব'ললেন—আমি আর যাব না, এইখানে থেকে আমি সব কিছু নিয়ে, সবকিছু বুঝে জীবলোকের মাঝে এই আনন্দ, এই আত্মানন্দ, এই ব্রহ্মানন্দ সবার ভিতর জাগিয়ে দিয়ে সবাইকে এখানে এনে ভরপুর ক'রব—সবাইকে এখানে টেনে নিয়ে আসব। তখন তিনি আবার দৈববাণী শুনলেন—আরও অগ্রসর হও।....। তাই বিশুদ্ধে যখন ঋষি যাত্রা শুরু করলেন, তখন দেখেন সব শেষ হ'য়ে গেছে, কিছুই নেই,—অনুভূতি নেই, নির্বাণ নেই, মুক্তি নেই, কিছু নেই। বিশুদ্ধের রাস্তায় এসে তিনি ধীর স্থির হ'য়ে গেলেন, মনে হ'ল যেন সাধারণ হয়ে গেলেন। হঠাৎ তিনি যেন উর্ধ্বলোক থেকে ধপ্ ক'রে এই বিশুদ্ধের রাস্তায় ব'সে প'ড়লেন। তিনি ভাবলেন—কোথায় গেল সেইগুলি? স্বপ্নের মত যে আসছিল, ওগুলো কি স্বপ্ন? না অলীক? না সত্যিকারের সুর? এখন তো তার কিছুই বুঝতে পারছি না! এখন তো দেখছি, আমি একা-মনে, একা-আসনে ব'সে আছি এখানে। ঋষির যখন এই অবস্থা, তখন তিনি সেই শিব-শক্তি, সেই শিবের হুঙ্কার ধ্বনি শুনতে পেলেন—শিব এসে তখন দাঁড়ালেন। ত্রিশূল হাতে শিবকে দেখে বাল্মীকি অবাক হয়ে বললেন—তুমি হঠাৎ এখানে? তোমার সেই শুভ্র দাড়ি, শুভ্র কেশ—সুন্দর তুমি, —তুমি হঠাৎ কেন এই লোকে এসে দাঁড়িয়েছ? শিবকে দেখে তিনি হাতজোড় করে বললেন—হে শিব! হে ব্রহ্মানন্দ! হে মহাদেব! তোমার যখন দেখা পেয়েছি, তখন আমি অধঃপতনে যাইনি। তোমার দর্শন যখন হয়েছে, তাহ'লে নিশ্চয় এখানে আমার কোন কাজ আছে। শিব তখন ঋষিকে বললেন—তুমি থেমো না, অগ্রসর হও। ঋষি অগ্রসর হচ্ছেন—অগ্রসর হ'তে হ'তে হঠাৎ দেখলেন যে, অদ্ভুত! সমস্ত সংসারের বিষগুলো যেন সাগরের মতন ব'য়ে যাচ্ছে—যেন বিষের সাগর। একটা সর্পের বিষ—এতটুকুন বিষ মুহূর্তে শেষ ক'রে দেয়। —আর সেই এতটুকু এতটুকু বিষ যেন একত্রিত হয়ে এক মহাবিষের সাগর হয়ে বিষের ঢেউ-এর মতন বয়ে যাচ্ছে। অজস্র বিষধর সেইসব বিষ বয়ে নিয়ে চলেছে। দেখে তিনি বললেন—এত বিষ! আরে সর্বনাশ! ওগো বিষধর! কোথায় তোমরা যাচ্ছ? ওগো অজস্র ফণাধারী সর্প! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা যেন সেই বিষ মুখে করে শিবের কাছে গিয়ে শিবকে প্রণাম করে চলছে বাস্তব লোকে—চলছে সব সংসারে। তাই দেখে ঋষি বললেন—

তোমরা কোথায় যাচ্ছ সকলে?—তাদের পিছনে হুহু করে বিষের স্রোত চলছে দেখে শিবকে বললেন—এ বিষ কোথায় যাচ্ছে? শিব বললেন—যে লোক থেকে তুমি এসেছ, যেখান থেকে তুমি এসেছ, এ বিষ সেখানে সাপ্লাই (supply) হবে, সেইখানে এই বিষ চলে যাচ্ছে। বললেন ঋষি—এ বিষ কে নিচ্ছে? এই সাগরের মতন বিষ, যে সাগর দেখা যায় না, বুঝা কেন প্রয়োজন? শিব বললেন—এই বিষ সংসারে না গেলে, এই বিষ সংসারে প্রবিষ্ট না হ'লে সমাজ-উন্নতি হবে না, সমাজ বুঝবে না। কারণ বিষের জ্বালা আর শোকের জ্বালা—বিষেরই জ্বালা; রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য, আঘাত, প্রতিঘাত—এইসবই বিষক্রিয়া এবং মৃত্যুর যে জ্বালা তাও বিষক্রিয়া। সুতরাং এই বিষ যদি সমাজ-সংসারে জীবলোকে প্রবিষ্ট না হয়, তবে জীবের অভিজ্ঞতা হবে না, জীব ব্রহ্মলোকে যেতে পারবে না, জীবের অনুভব হবে না, অনুভূতি আসবে না এবং মুক্তির পথে, দর্শনের পথে তাদের বিঘ্ন হবে। তাই এই অনন্ত মহাজ্বালার ভিতরে জীব থাকবে এবং ডাকবে। তার জন্যই এই অফুরন্ত বিষ সাগরের মতন, ঝরণার মতন অবিরাম ব'য়ে চ'লছে। তখন শিব ব'ললেন—তুমি অগ্রসর হও, এই বিষের সাগরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। বিশুদ্ধে চলে যাও।

ঋষি জিজ্ঞাসা ক'রলেন—প্রভু, আমি এই বিষে ঝাঁপ দেব?—তারপর? শিব বললেন—কালবিলম্ব করো না তুমি, যাও, ঝাঁপিয়ে পড়।—হে শিব! হে রাম! হে শিব-শম্ভু! ব'লে ঋষি আপন মনে সেই বিষের সাগরে ঝাঁপ দিলেন। বিশুদ্ধে এসে উপনীত হ'লেন। মুহূর্তে দেখলেন—বিষ কোথায়, সব অমৃত! যাঁরা এই বিশুদ্ধে এসে উপনীত হন, তাঁরা দেখেন—সমস্ত বিষ তখন অমৃত হয়ে যায়। সেই সাগরতুল্য বিষ মুহূর্তে অমৃত হয়ে গেল।। মুহূর্তে তখন অমৃতের সাগর। সেই অপূর্ব অমৃত-সাগর দেখে ঋষি আত্মহারা হয়ে ব'ললেন—হে শিব, হে ব্রহ্মানন্দ! এত অদ্ভুত স্বাদ যে এই বিষের ভিতরে রয়েছে, তা তো আগে জানতাম না! এই বিষকে অবজ্ঞা ক'রেছি, তোমাকে কত প্রশ্ন ক'রেছি, তোমার সাথে কত তর্ক করেছি। হে শিব! তুমি আমার অজ্ঞানতার জন্য ক্ষমা কর। এই বিশুদ্ধে এসে সব বিষ শোধন হয়ে যায়, সমস্ত বিষ যে এক অদ্ভুত অমৃত স্বাদে সোয়াদে ভরপুর,—এই মহাজ্ঞান এসে যে উপস্থিত হয়, তা তো জানতাম না! আজ এক অদ্ভুত জগতে এসে, এই লোকে এসে—দেখলাম যা কিছু সব অমৃত হয়ে যায়, যা কিছু সব আনন্দময় হয়ে যায়, যা কিছু সব চিদানন্দ হয়ে যায়, যা কিছু সব নির্বাণ-নির্বিকল্প হয়ে গিয়ে সেই স্বাদ এসে উপস্থিত হয়, যার কাছে আর কোন স্বাদ থাকে না, কোন বিষ থাকে না। কোন জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই। এই অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডারে স্বাদে সোয়াদে জ্ঞানে অমর হয়ে অমর লোকে বিরাজ করছি, এটা তো আগে জানতুম না! তখন শিব ব'ললেন—দেখ, দূরে তাকিয়ে দেখ।....কি দেখা যায়?....ঋষি তাকিয়ে দেখে—দূরে এক চক্ষু; সে যেন ডাকছে—এখানে এস, এখানে এলে দেখতে পাবে যেন সব চক্ষু খুলে যাচ্ছে। সেই চক্ষে ডাকছে! কি অদ্ভুত! দূর থেকে দেখা যায়—চক্ষু জ্বল জ্বল ক'রে জ্ব'লছে। সেই চক্ষে ইঙ্গিত দিচ্ছে, তাকে সেখানে যেতে ব'লছে। তখন তিনি সেখানে গেলেন—আজ্ঞা চক্রে গেলেন—ত্রিনয়নে এসে পৌঁছলেন। তখন কি দেখছেন

ঋষি ঃ—সেখানে দেখেন, সেই চক্রের মধ্যে রামনাম ব্রহ্মনাম লেখা। তখন শিব বললেন—যেই রামনাম ক'রে তুমি এতদূর অগ্রসর হয়েছ, যে মহানাম ক'রে তুমি এতদূর এসেছ, সেই বিরাট নাম, বিরাট সুর—সেই বীজগুলি, সেই শক্তির ধারাগুলি সমস্ত সেই ত্রিনয়নে বিরাজ করছে। আজ্ঞাচক্রের ত্রিনয়নে এসে যখন তিনি উপস্থিত হ'লেন তখন দেখেন, সেখানে সমস্ত শক্তি, গ্রহ উপগ্রহ, সমস্ত পৃথিবী—সব যেন হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যাকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কে, বলে—আমি অমুক গ্রহ, আমি অমুক পৃথিবী, আমি অমুখ সূর্য।—আরে সর্বনাশ! তুমি সূর্য? তুমি পৃথিবী? যে পৃথিবী থেকে ঋষি গিয়েছেন, সেই পৃথিবীও যেন ছোট্ট হয়ে হাত জোড় করে রয়েছে। সেই পৃথিবী ব'লছে—যেখান থেকে তুমি এসেছ, আমরা সেখানকারই বাচ্চা। আরে সর্বনাশ! এত লক্ষ লক্ষ পৃথিবী সবাই যেন হাত জোড় ক'রে রয়েছে! সবাই ত্রিনয়নের দিকে তাকিয়ে রয়েছে!—সেই ত্রিনয়ন জেগে উঠল—সেই ত্রিনয়ন ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না। ঋষির ত্রিনয়ন জেগে উঠল।...তিনি ত্রিনয়নের আজ্ঞাচক্রে আসন ক'রে ব'সে প'ড়লেন ভরপুর হয়ে। তখন শিব বললেন, রাম বললেন,—তুমি এখানেই ব'স, এইখানে বসে তুমি সাধনা কর। তখন তিনি সেখানে আসন ক'রে ব'সে পড়লেন এবং রাম-নামে গভীর তন্ময় হয়ে গেলেন।.......সহস্রার সম্পর্কে যেটা, সেটা অফুরন্ত ভাণ্ডার। তিনি আজ্ঞাচক্রেই স্থগিত ক'রলেন—সেখানেই বসে পড়লেন। বললেন—আমি সহস্রারে এখন যাব না, আমি এখানে ব'সেই সহস্রারের সাধনা ক'রব, সহস্রারের স্বাদ নেব; যেমন নদীর সাথে সাগরের সঙ্গম—নদী সাগরকে উপলব্ধি ক'রছে এবং প্রতি মুহূর্তে সাগরের কোলেই বসে আছে।....আমি সাগরের স্বাদ নেব,—আমি সাগর হব না। সাগরের স্বাদ আমি উপলব্ধি করব, সাগরের সত্তা আমি নেব এবং সমস্ত সত্তা নিয়ে তার কোলে থেকে, তার সব কিছু নিয়ে, তার সঙ্গে এক হয়ে অথচ বিভক্ত থেকে, আলাদা থেকে তাকে আমি উপভোগ করব। এইভাবে তিনি সহস্রারকে উপলব্ধি ক'রতে লাগলেন।....ক্রমশঃই দেখেন, তিনি যেন সহস্রারের সাথে মিশে সাগর হয়ে যাচ্ছেন। তখন তিনি বললেন—আমি সাগর হব না, আমি সাগর হতে চাই না। তখন ব্রহ্মের থেকে, বিরাটের থেকে এক দৈবাদেশ হ'ল—তোমাকে সাগরে মিশতেই হবে,—তোমাকে সাগর হতেই হবে, উপায় নেই ঋষি। পুনরায় কাকুতি-মিনতি ক'রতে আবার দৈববাণী শুনতে পেলেন— তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে, কিন্তু তোমাকে সাগরের সাথে সাগর হয়ে থাকতে হবে। ঋষি প্রশ্ন করলেন—কিভাবে? শুনতে পেলেন— সাগরে থেকেও নিজেকে উপলব্ধি ক'রতে পারবে।—তখন দেখলেন—তিনি সাগরের সাথে মহাসাগর হয়ে মিশে গেছেন; কিন্তু মিশে গিয়েও তাঁর সেই চাহিদা জাগতে লাগল—আমি সাগর হব না, আমি সাগরের স্বাদ গ্রহণ ক'রব। তখন ব্রহ্মের থেকে আবার দৈববাণী হ'ল—তুমি বরফ হয়ে সাগরে দোল। সাগরের মধ্যে বরফ সাগরেরই জল, সাগরের থেকেই সৃষ্টি, সাগরের জলই বরফ— সেই বরফ সেই সাগরেই দুলছে। তখন তিনি ক্ষণে সাগর, ক্ষণে বরফ হয়ে দুলতে শুরু করলেন। কখনও উপলব্ধি ক'রছেন—সাগরের দোলনা, সাগরের মাহাত্ম্য, সাগরের তত্ত্ব; কখনও সাগর বরফ হচ্ছে,

আবার কখনও বরফ সাগরে মিশে যাচ্ছে। এই উভয়ের মিলনে একই সুর বাঁধা, গাঁথা। এক রূপ ও স্বরূপের স্বরূপত্বের বিভক্ততা, তা জল আর বরফের পার্থক্য।--পার্থক্য থাকলেও একই বস্তুর বস্তুত্বের অস্তিত্ব শুধু একই হয়ে আলাদা জায়গায় একই অবস্থায় দুলছে—সাগর নিজে জল, আবার আলাদা হয়ে দোলনায় দুলছে। এই যে ব্রহ্মানন্দ চিদানন্দের আত্মহারা অবস্থা, এই আত্মহারা বুদ্ধি সমস্ত সজ্ঞানে সুরে এবং বিভোরে নিজের সত্তায় এক-সত্তা হয়ে আবার সত্তার মধ্যে রূপ নিচ্ছে। এই রূপ স্বরূপেরই রূপ, এবং এই রূপের মাঝে রূপ নিয়ে স্বরূপকে বুঝতে পারছে, আবার মাঝে মাঝে যে কোন মুহূর্তে মিশে গিয়ে ঢেউয়ের মাঝে বরফ হয়ে নিজেকে উপলব্ধি ক'রছে। এই সত্তা হ'চ্ছে,—মূলাধার থেকে সহস্রারের ভিতরে এই যে একটি দরজা, এই যে একটি রাস্তা, এটা জগতের প্রত্যেকেরই আছে, জীবের ভিতরের সৃষ্ট সব বস্তুর ভিতরের সবার ভিতরেই আছে। এটা জাগে শুধু কীর্তনে। এটা জাগে শুধু শত নামে, সহস্র নামে; জাগে কর্ণে যে বীজ দেওয়া হয়, সেই বীজ যদি সদা-সর্বদা আপন সুরে নিজ-মনে ক'রে যায়। বুঝে হোক, অবুঝে হোক, যে কোন উপায়ে নাম করলেই সহস্রার জাগবেই। জাগাবার জন্যই জীব-জগতের সৃষ্টি। এটা তর্কে আসেনা, বিতর্কে আসেনা। শুধু নিজের সত্তায় ডুবে থেকে, নিজের বিভোরতায় ডুবে থেকে এর অভ্যাসে শুধু আপন মনে রাস্তায় ঘাটে সব সময় নাম ক'রে যাবে। তোমাদের যখন সপ্তচক্র জাগবে, তখন তোমরা বুঝতে পারবে তোমাদের মধ্যে ক-তো শক্তি আছে!

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা

(তৃতীয় ভাগ)

প্রণাম

সূচীপত্র

১।	জীবনে হতাশা ও নিরাশায় সুখী হোতে পারল না, এই নিয়ে যে আত্মহত্যা করে সেই মৃত্যু, আর স্বাভাবিক মৃত্যু—এর মধ্যে প্রভেদ আছে কি?	১৬৫
২।	সংসারে অন্যায়-অপরাধ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অনেকেই করে। ঠাকুর—তুমি যদি অপরাধ সম্বন্ধে কিছু বল, তবে মুক্তির পথে তৈরি হোতে আমাদের সাহায্য কোরবে।	১৬৫-১৭৩
৩।	আচ্ছা ঠাকুর, অপরাধ করবো না—অন্যায় করবো না—মুক্তির জন্য তৈরি হবো। তবু যদি ভুল বশতঃ বা কোনো কারণে অপরাধ হয়ে যায়, তবে কি হবে?	১৭৩
৪।	অপরাধ যে থটে আসে, অপরাধ বিনাশের কি কোনো থট নাই?	১৭৪
৫।	প্রাণী হত্যা তো অপরাধ। খাওয়া দাওয়া করলে তো প্রাণী হত্যা করতেই হবে। মাছ-মাংস না খেলে কি প্রাণী হত্যা বন্ধ হবে?	১৭৫
৬।	নিজেকে হত্যা করবো—অপরাধ করবো, এই ইচ্ছা জাগে কেন?	১৭৪-১৭৫
৭।	ঠাকুর, অনেক সংসারে সামান্য কারণে নানা অশান্তি-মনোমালিন্য-ঝগড়াঝাটি হয়। কি করলে—কোন্ পথে চললে এসব এড়িয়ে সংসারে শান্তিতে বাস করা যায়, আমাদের একটু সে সম্বন্ধে উপদেশ দাও।	১৭৫

অপরাধের তালিকা

প্রশ্ন ঃ —জীবনে হতাশা ও নিরাশায় সুখী হতে পারল না, এই নিয়ে যে আত্মহত্যা করে সেই মৃত্যু—আর স্বাভাবিক মৃত্যু—এর মধ্যে প্রভেদ আছে কি?

উত্তর ঃ— আত্মহত্যার আত্মার বড় ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়—জন্ম মিলতে বড় দেরী হয়। জন্মের মিলের ভিতর না আসা পর্য্যন্ত জন্ম হয় না। জন্ম না নিলে উদ্ধার নাই, আটকে থাকে অনন্ত কোটি বছরের জন্য। কেউ যেন এমন না করে।

প্রশ্নঃ — সে আত্মা কি বুঝতে পারে?

উত্তর ঃ— জন্ম দ্বারাই মুক্তি। সে আত্মা তখন আরো বেশী বুঝতে পারে—আত্মহত্যা করে কি সর্বনাশটা করেছি! জীবনের বেশী দিনতো চলেই গিয়েছিল—কেন করলাম আত্মহত্যা! এই যে আটকে আছি, কবে জন্ম পাবো! তারা তখন চিৎকার করে কাঁদে—হে ভগবান! জন্ম দাও, জন্ম দাও, কুকুর বেড়াল যা হয় একটা জন্ম দাও। এক জীবনে শিব হওয়া যায়—বিষ্ণু হওয়া যায়। এই যে আটকে আছি—কবে জন্ম পাবো, কবে মুক্তি পাবো!—তারা চিৎকার করতে থাকে।

আর স্বাভাবিক মৃত্যু হোলে জন্ম হয়ে যায়।

মনে মনে মৃত্যুর ইচ্ছা হওয়াটাও অপরাধ। অনেকে বলে—আর থাকতে ইচ্ছা করেনা, এই পৃথিবীতে বাঁচতে ইচ্ছা করে না, ভাল লাগে না—সূক্ষ্ম অপরাধ করে চলেছে।

অনেকে আবার ভাবে—আমি রেলের তলায় মাথা দেব, accident করে মরবো, বিষ খাব, আত্মঘাতী হবো।—মনে মনে ভাবলে চরম অপরাধ। যারা বিষ খেয়ে, জলে ডুবে বা আগুন লাগিয়ে মরে অর্থাৎ যে কোন প্রকারে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে বা আত্মহত্যা করে, প্রকৃতির নিয়মে কঠোর কঠোর সাজা অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। অনন্ত কোটি বছরের জন্য তাদের আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। সেখানে মৃত্যু হয় না, সেখানে মৃত্যু নেই, আছে শুধু আগুনের দুঃসহ জ্বালা— তারা শুধু জ্বলতেই থাকবে, মরবে না। বিদেহী হয়ে থাকে। ঐ অবস্থায় সিদ্ধিও হয়না, মুক্তিও হয়না।

তাই মনে রেখ, সংসারে ক্ষণিকের অশান্তি সহ্য করতে না পেরে সমূহ জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কত কোটি বছরের যন্ত্রণা টেনে আনলো তারা! তোমরা কখনও এমন করোনা।

প্রশ্নঃ—সংসারে অন্যায় অপরাধ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেকেই করে। ঠাকুর—তুমি যদি অপরাধ সম্বন্ধে কিছু বল, তবে মুক্তির পথে তৈরী হতে আমাদের সাহায্য করবে।

উত্তর ঃ—যে কোন ব্যক্তি যে কোন কারণে যে কোন কথা বললে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে সেই কথাটুকুই শুধু শুনবে, ধারণা করে বাড়তি কোন কথা বলবে না। তোমার আচার আচরণে কোন রকমের অসৌজন্য প্রকাশিত হলে, মা-বাপ অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা সে

সম্বন্ধে বলবেনই। যেমন কাউকে হয়তো বলা হ'ল—এত অবেলায় ঘুমোচ্ছিস কেন? না বলে কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলি? এত যে ডাকাডাকি করা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছিস না? এর উত্তরে সে হয়তো বললো কেন? আমি বুঝি কাজ করি না? আমি একটু বসলেই সকলের চোখে পড়ে। আরও তো অনেকে আছে, তাদের তো বলনা? আমাকে বলতে বুঝি খুব সুবিধা? ইত্যাদি। নম্রভাবে সহজসুরে তার উত্তর দেওয়া উচিৎ ছিল।

কোন সহজ কথাকে বক্র দৃষ্টিতে গ্রহণ করে যদি উত্তর দেওয়া হয়, একটাও অপরাধ। সহজ কথার প্রত্যুত্তরে যদি ব্যথা বা দুঃখ লাগে, তবে যার কথায় আঘাত পেল তার অপরাধ হবে।

মনে কর তুমি কারও উপর রাগ করেছ, সেই রাগের যথাযথ কারণ থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। সাধারণতঃ ঘর সংসারে মানুষেরা যার উপরে রাগ করলো, তার সব কাজ বক্র দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। তার হাঁচি কাশি কথা বার্ত্তা সব কাজেই তখন ত্রুটি খুঁজছে। সে যদি হাসে—ঐ আমাকে দেখে মুচকি হাসলো, ঐ আমাকে দেখে নাক সিটকোচ্ছে, হাঁচি দিচ্ছে, কাশি দিচ্ছে ইত্যাদি। যতই চিন্তা করছে, তার প্রতি রাগও ততই বাড়ছে। ধারণা করে সঠিক ভাবে না জেনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অপরাধ। তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করবে—তুমি কি আমাকে দেখে হাসলে?

সে যদি হাসে তোমাকে দেখে, বিদ্রূপ করে—তার অপরাধ। আর যদি তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলে—না আপনাকে দেখে হাসিনি তো, তাহলে অযথা মিথ্যা ধারণা করাতে তোমার অপরাধ।

তুমি হয়তো বুঝতে পারছ কেউ তোমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে; তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে যদি তা অস্বীকার করে, সেটাই সত্যি বলে মেনে নেবে। সে যদি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেও তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলে, তার অপরাধ হবে। আগেই বলেছি, ধারণা করে মন্তব্য করা অপরাধ। মনে যদি প্রশ্ন জাগে, জিজ্ঞাসা করে নেবে। মনে কর কারও উপরে তোমার রাগ হয়েছে, সে জিজ্ঞাসা করলে যদি স্বীকার কর তাহলে safe হয়ে গেলে। মিথ্যা বললেই ত্রুটিতে পড়ে যাবে।

সংসারে কাজ কেউ বেশী করে, কেউ কম করে। কেউ অর্ধেক দায়িত্বসম্পন্ন, কর্ত্তব্যবোধ কারও বেশী, আবার কারও ততটা নেই। সাধারণতঃ সংসারে কাজ থাকে অনেক। মনে কর কেউ তা এড়িয়ে গেল, ফাঁকি দিল, কাজ করলো না। সেখানে দেখতে হবে, তোমার এড়িয়ে যাবার বুদ্ধি হয়েছে কিনা। অন্য কোনও কাজের নামে, অন্য কোন কাজের দোহাই দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছ কিনা, সংসারের কাজের চেয়ে তোমার কাজটির বেশী প্রয়োজন আছে কিনা? যদি তোমার কাজটির বেশী প্রয়োজন থাকে, রক্ষা পাবে। না হলে ত্রুটিতে পড়বে। আটকে যাবে।

অন্যে কথা বলছে, হাসাহাসি করছে; কখনও ভাববে না তোমাকে বলছে বা তোমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করছে। যাতায়াতের পথে অন্যের কথাবার্ত্তার মাঝে একটি শব্দ তোমার কর্ণগোচর

হ'ল। তুমি তার অগ্র-পশ্চাৎ বৃত্তান্ত কিছুই জানোনা, অমনি শব্দটিকে নিজের সম্বন্ধে ধরে নিয়ে মুখ গোমড়া হয়ে গেল।—জানি জানি,—আরম্ভ হল দুঃখ বা হতাশা। সম্পূর্ণ না জেনে দুঃখ পাওয়া ত্রুটিমূলক। ধাপ্পার ছলেই জিজ্ঞাসা করে নেবে। যাকে জিজ্ঞাসা করলে সে হয়তো বলল, "এই শব্দটি এই কারণে ব্যবহার করেছি, আপনার সম্বন্ধে বলি নাই।"

যদি আড়ালে কেউ কারো সম্বন্ধে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, নিন্দা, সমালোচনা করে, তার জন্য তার অপরাধ।

মনে কর 'ক'-এর ধারণা 'খ' ও 'গ' তার সমালোচনা করে। তখন 'ক' পরিষ্কার 'খ' ও 'গ' কে জিজ্ঞাসা করবে— তোমরা কি আমার সমালোচনা করছ?

আর যদি বলে— না করিনি, তখন 'ক' বলে দেবে—আমার মনে এই ধারণাটি জেগেছিল, তাই আমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম।

মনে কর, 'ক'-কে আমি কাজের জন্য ডাকি, এই কর সেই কর বলে আদেশ করি। তখন যদি আর এক জন বলে—ঠাকুর ওকেই কাজের জন্য ডাকেন। ও আমাদের নামে নালিশ করে ঠাকুরের কাছে, ঠাকুর আমাদের জিজ্ঞাসাও করেন না। এটাও—অপরাধ।

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি বলবো—ও কারও নামে নালিশ করে না। ওরা ব্যক্তিগত কথাই বলে। আর যদি কখনও অন্যের সম্বন্ধে কিছু বলে, ভাল করার চিন্তাতে ভালর উদ্দেশ্যেই বলে। হয়তো বললো—এখানকার ছেলে-মেয়েদের আরও ভাল হওয়া উচিত। এত ভাবে ঠাকুর শিক্ষা দিচ্ছেন, কেউই যেন সঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। এতে ও দুঃখই প্রকাশ করে। আমার কথা বিশ্বাস না করলেও মারাত্মক অপরাধ।

মনে কর 'ক' আমার কাছে এসে বলছে—'খ' এই করেছে, 'গ' এই করেছে। আমি বললাম—তুমি কি সঠিকভাবে জানো তারা এই করছে, না ব্যক্তিগত রাগ প্রকাশ করছো? এ কথা আমাকে এসে বলছ কেন? ওদের কি জানিয়েছ?—আজ্ঞে না। আমি বললাম—তুমি ওদের জানাও। ও বলছে—আমি যদি একথা জানাতে যাই, তাহলে বলবে, আপনি এরকম নাকি? শান্তভাবে থাকেন আর নালিশ করে করে ঠাকুরের মন বিগড়ান।

আমি তখন 'খ' ও 'গ' কে ডেকে বললাম—'ক' তোমাদের সম্বন্ধে এই কটি কথা জিজ্ঞাসা করছে, কথাগুলি কি ঠিক? ওরা সত্যি কথা বললে বাঁচলো। আর মিথ্যা বললেই অপরাধে জড়িয়ে যাবে।

আমার এখানে অনেকে অনেক কাজ করে। আমার ঘরে কেউ হয়তো কাজ করছে, কেউ বসে আছে। যদি মনের স্বচ্ছতায় বসে থাকে তবে অপরাধ হবে না, যদি ইচ্ছা করে বসে থাকে—অপরাধ।

আমি যদি কারও উপরে অসন্তুষ্ট হই, তখন যে বিষয় নিয়ে বা যে কথাতে অসন্তুষ্ট হয়েছি, আমার অসন্তোষ তাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেই ব্যক্তির অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু আমার অসন্তুষ্টি থাকে না। আমি তাকে খেতে ডাকছি, জিজ্ঞাসা করছি—টাকা নিয়েছিস কিনা। সে কিন্তু আমার উপর গম্ভীর। রাগারাগি হ'ল একবিষয়ে, গম্ভীর হ'ল সব বিষয়ে। আর একজন

তো বললো—ঠাকুর তোয়াজ করছেন। মারাত্মক অপরাধ। মন্তব্য করাটাই ত্রুটি। যে কোন জনকে অযথা ব্যথা দেওয়ার অধিকার তোমার নেই। আমি আমার সহজ স্বচ্ছ মনে সব কাজ করে চলেছি। তাই বলছি, যখন যেভাবে কথা বলছি সেই কথাটুকুই শুধু শুনবে। অযথা কথা বললেই অপরাধ। আমার কাছে সবাই সমান। যে আগ্রহ করে কাজ করতে এগিয়ে আসে, আমি তাকেই ডাকি। কারো প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। কে কতটা কাজ করে বা না করে, সেই প্রসঙ্গে কিছু বলব না। এই ব্যাপারে অনেকেই ভুল ধারণা করে বসে আছে—জানি জানি, যাদের ডাকার ঠাকুর ডাকবে। আমাদের কথা তো বলে না, যারা সামনে কাজ করে, তাদের কাজের দাম বেশী। ওরা ঠিকই আছে। ওদের ঠিকই ডাকা হয়। ওরা যত অন্যায় করুক না কেন, ওদের কোন দোষ নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আগে বলেছি, ধারণার বসে যে যত মন্তব্য করবে, সে তত অপরাধের জালে জড়িয়ে পড়বে। কাউকে হয়তো বললাম, ওখানে বসে আছিস কেন? ঐ সময়ে তোর খোঁজ করছিলাম, এগিয়ে আসলিনা কেন? তার উত্তরে সে যদি বলে বাসন মাজছিলাম, গান শিখছিলাম অথবা অন্য কোন কাজ করছিলাম, পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু তা না করে যদি মুখ গোমড়া করে বসে থাকে বা বাঁকা ভাবে উত্তর দেয়, অপরাধ হবে। আর একজন বসে আছে আমার কাছে। তাকে বললাম, তুই একটু পড়াশুনা কর। সে উত্তরে বলল—কেন আমি বসে থাকলে কি অসুবিধা হচ্ছে? মারাত্মক অপরাধ হয়ে গেল। আমি বললাম—তোর কথায় আমি কিছু মনে করলাম না, কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখতো কথাটা ঠিক বলেছিস কিনা। পরে অবশ্য সে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে।

যে কেউ যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আমার কাছে কোন অভিযোগ করলে আমি শুধু শুনে যাই। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে সঠিক ভাবে না জেনে কোন মন্তব্য করিনা অথবা কোন ধারণাও করিনা। সংসার ক্ষেত্রে এটিই হয় বেশী। সংসারে তোমরা না জেনে কোন ধারণা বা মন্তব্য করতে পারবে না। কে কোথায় গেল, কার সঙ্গে গেল, কবে গেল, না জেনে অযথা সন্দেহ করবে না। আমি যদি কাউকে ডেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি—তুই কি এই কথা বলেছিলি? তাহলে অনেকে মনে করে, কেউ বুঝি নালিশ করেছে এবং তার নালিশের উপর ধারণা করেই আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করেছি। আমি কিন্তু সহজ স্বচ্ছ মনেই কথাটি জিজ্ঞাসা করেছি। কেউ বলুক বা না বলুক, যা জিজ্ঞাসা করেছি যদি সহজ সরল মনে উত্তর দেয়, পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু নানা বিরূপ ধারণা করে যদি মনে মনে তাতেও গুমরোতে থাকে—অপরাধ হবে।

মনে কর আমি কাউকে ডাকি, আদর করি—তাতে অন্যদের রাগ বা হিংসা হতে পারে। মনে মনে হিংসা বা রাগ পোষণ না করে যদি খোলা মনে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপারটা কি?—পরিষ্কার হয়ে যায়। তা তো করে না। অধিকাংশ মানুষের মনই সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় ভরা। তারা আমার স্নেহ ভালবাসার মর্যাদা দিতে পারে না। জন্মগত ভাবে প্রকৃতির সব নিয়ে আমি এসেছি। সেই সুরে, সেই ধারায় সবাইকে গড়ে তুলতে চাই। আমার স্নেহের সমুদ্রে অবগাহন

করে তোমরা তৃপ্ত হও। তৃপ্তির সুর খুঁজে নাও। প্রকৃতির ভাণ্ডার তো অফুরন্ত। সমুদ্রের জল যতই নাওনা কেন, সমুদ্র কি তাতে শুকিয়ে যায়? আলো, জল, বাতাস কোনটিই তো ফুরিয়ে যায় না। শেষ হয় না। তাই বারে বারে জানিয়ে যাচ্ছি একটিই কথা—সঠিক বার্ত্তা না জেনে অযথা ধারণা করা কত বড় অপরাধ।

কারও প্রতি হিংসা, পরশ্রীকাতরতা মারাত্মক অপরাধ। আমি কুমোর, মূর্তি গড়ি, যখন যেভাবে বুঝি সেভাবেই তৈরী করবো। দুর্গা প্রতিমা গড়তে হলে দশভুজা গড়তে হবে আর জগন্নাথের মূর্ত্তি গড়তে ঠুঁটো জগন্নাথই গড়তে হবে আমাকে। যেভাবে গঠন করা প্রয়োজন, সে ভাবে বুঝে বুঝে আমি তৈরী করবো। যদি জগন্নাথ দেব ক্রুদ্ধ হয়ে বলে—ওর দশটা হাত আর আমার একটা হাতও সম্পূর্ণ নয় কেন? এই বলে যদি মারামারি শুরু করে, তাহলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হবে না। সব পণ্ড হয়ে যাবে। আমি যাকে যে ভাবে বলি, সেই আদেশ মেনে চলতে চেষ্টা করবে। তাহলেই ত্রুটিমুক্ত হয়ে চলা সম্ভব হতে পারে। আর যদি অযথা হিংসা করতে যাও—ঠাকুর ওকে ডাকেন, ও ঠাকুরের সেবা করার সুযোগ পায় ইত্যাদি প্রতিটি কথায়, প্রতিটি চিন্তায় অপরাধ যুক্ত হয়ে পড়বে। আগেই বলেছি, না জেনে কিছু বলা বা ধারণা করা অত্যন্ত অপরাধ।

সব কথা সবাইকে সব সময় বলা যায় না। কারণ আমার কার্যপদ্ধতি, আমার সহজ সরলতা কেউ হয়তো সহজ মনে নিতে পারবে না। শুনে সে ফাৎ ফাৎ করে জ্বলে উঠবে, মারামারি কাটাকাটি করতে ছুটবে। তাতে তার ক্ষতি হয়ে যাবে। তার জন্য অনেক সময় আমি বলি—এই কথাটা এখন ওকে জানিও না। পরে অবস্থা ও সময় বুঝে আমি নিজেই সে কথা জানিয়ে দিই।

মনে কর কেউ হয়তো আন্দাজে বুঝেছে তাকে একটি কথা গোপন করা হচ্ছে। কেন বলা হ'ল না, না বুঝেই সে মনে মনে ফুসতে শুরু করেছে—জানি আমাকে তো বলবেনই না। কত প্রিয়-জন, আপনজন—তাদের কাছেই ঠাকুর বলবেন তাঁর মনের কথা। জানি তো—এ-কি জানি না? এটাও অপরাধ। যাদের সাথে একত্রে বাস করছে, তাদের মধ্যেই একজন কথাটি তাকে বলে দিয়েছে। এখন চিৎকার, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি—সে এক বিশ্রী ব্যাপার। সে আমার আদেশ অমান্য করে কথাটি তাকে বললো—সেও অপরাধ করলো। তখন পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার জন্য আমি তাকে ডেকে সব বুঝিয়ে বললাম। কেন তাকে বলা হয়নি, সেই কারণটিও বুঝিয়ে বলা হ'ল। আমার কথা শুনে যদি সে শান্ত, নম্রভাবে সব মেনে নেয়, ঠিক আছে।—আমি জেনে গিয়েছি কিনা, তাই বলতে এসেছ—তা হলেই ত্রুটি হবে।

আমাকে যে কেউ যে কোন কথা যদি বুঝিয়ে বলে, আমি মেনে নেব। আর যদি মিথ্যা বলে, সে ত্রুটিতে পড়বে। তোমরা সব সময় পরস্পরের কাজে সহযোগিতা করবে। একজন যদি কাউকে কোন কাজ করতে বলে, তার প্রত্যুত্তরে সে যদি বলে, আমার সময় কোথায়? এই কথাটি মিষ্টি করে বুঝিয়ে না বললে একটু ত্রুটি হয়ে গেল। আর যদি ভ্রু কুঁচকে বলে—

আমি কেন করতে যাবো? এটা তো আমার duty নয়। তবে তো ত্রুটি হবেই। প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে লক্ষ্য করে না চললে, একটু একটু করে ত্রুটি জমে যায়। শেষে বিরাট আকার ধারণ করে।

কারও চেহারা নিয়ে, কারও আচার আচরণ নিয়ে বিদ্রূপ বা হাসি ঠাট্টা করবে না। "বুঝি, চেহারা দেখলেই বুঝি।"—আন্দাজে ধারণার বশে মন্তব্য করলেই ত্রুটি হয়ে গেল।

কোন বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ তোমাকে কোন কথা বললেন, তুমি ঝাঁঝি মেরে তার উত্তর দিলে। তোমার কথাতে তিনি যদি অন্তরে দুঃখ পান, তোমার ত্রুটি হয়ে গেল।

আবার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা যদি প্রথমেই ধমক দিয়ে রূঢ়ভাবে কোন কথা বলে, সেটা তাদের ত্রুটি। বয়সে বড় বলেই বকাঝকা করার কোন অধিকার নেই। কথা বলবে মিষ্টি করে, উত্তর দেবে নম্রতায়।

আমি অপরাধের সম্পর্কে সব কিছু জানিয়ে বুঝিয়ে দেবার পরও যদি ত্রুটি করে, তবে হবে দ্বিগুণ অপরাধ।

আগেই বলেছি, কোন্ প্রয়োজনে আমি কখন কি করি, না জেনে না বুঝে যদি বলতে থাক,—ঠাকুর ওকে বেশী ভালবাসেন, ওর মন রক্ষা করার জন্য এ কাজ করছেন, আমার সঙ্গে কৌশল করছেন, ওর দোষ চাপা দেওয়ার জন্য এই কাজ করলেন, আমার বেলায় তো এমন করেন না, ইত্যাদি — প্রতিটি কথায় ও চিন্তায় দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যাচ্ছে।

আমি যখন যা কিছু করি, সব সময় ভাল মন নিয়ে, ভাল করার উদ্দেশ্যেই করে থাকি। সংশোধন করার উদ্দেশ্যে আমি প্রত্যেকের ত্রুটিগুলি ধরিয়ে ধরিয়ে জানিয়ে দিয়ে যাই। তাতে অনেকেই ভুল বোঝে। মনে কর, আমি 'ক'-কে বললাম—তুমি এই কাজটা এইভাবে কেন করলে? এতে তো এই দোষ হয়ে গেল। তার উত্তরে সে বললো—হ্যাঁ, দোষ হয়েছে না? আমার বেলা দোষ তো হবেই। এই কাজ তো ওরাও করেছে, ওদের বেলায় তো দোষ হয়নি? রুদ্ধ আক্রোশে সে যেন ফেটে পড়তে লাগলো। নিজের সংশোধনের পথটি সে বেছে নিল না—মারাত্মক অপরাধ।

সে যদি নম্রভাবে বলতো—প্রভু, আমার অন্যায় হয়েছে। আমি কিভাবে করবো আমাকে শিখিয়ে দিন। কত সুন্দর হ'ত বলতো?

প্রতিটি কাজ করেই যদি আমাকে তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ-ভালবাসা অক্ষুণ্ণ আছে জানাতে হয়, তবে তোমাদের ত্রুটি। তোমাদের বেশীর ভাগই 'আমার বেলা, আমার বেলা' কথাটি বার বার কেন বল? আমি যাকে যে ভাবে যে কথা বলবো, তার দাম সেভাবে দেবে। না হলে ত্রুটি হবে। ছ্যাঁন ছ্যাঁন মেজাজে ক্ষণে ক্ষণে রাগ, গুরুজনের মুখে মুখে তর্ক—মারাত্মক অপরাধ।

নিজের অপরাধ পরিষ্কার করার জন্য সবার সামনে খুলে বলতে হয়। অপরাধ গোপন করাটাও অপরাধ। আমি সবার সামনে পরিষ্কার ভাবে সব খুলে বলি। কেন বলবো না? তাদের জন্য আমি কেন পাপের ভাগী হবো? কারো পাপের ভাগী কেউ হবে না। মারামারি

কাটাকাটি, হিংসা, খুন-চিন্তা অথবা কারণে অকারণে মন খারাপ করা মারাত্মক অপরাধ। আগেই বলেছি, তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে সহযোগিতা করবে। কেউ কাউকে হিংসা করবে না, ভুল বুঝবে না। ভাল করার উদ্দেশ্য নিয়ে স্বচ্ছ মনে আমি কাজ করি। কাউকে সংশোধন করার জন্য যদি ধমক দেই, চিৎকার করে কথা বলি বা শাসন করি, তাহলে অনেকে মনে করে "ঠাকুর সবার সামনে বলে আমাকে অপমান করলেন"। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বা কারও সম্মান নষ্ট করার জন্য আমি কিছু করি না। তোমাদের অপমান করার জন্য আমি কিছু করি না। তোমাদের অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমাদের সম্মান আমি নষ্ট করতে যাবো কেন? আমি যদি কিছু বলে থাকি, একজনকে কেন্দ্র করে সবাইকে গড়ার উদ্দেশ্যেই বলি। কাউকে হয়তো ঠাটিয়ে মারি, পরমুহূর্তেই প্রসাদ মেখে রাখি। অন্যেরা ভাবে—ঠাকুর ওকে তেল দিচ্ছেন। কত বড় অপরাধ!

একটি ক্ষুদ্র বালুকণার দাম আছে কি? দাম আছে পৃথিবী গড়ার পক্ষে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা একত্রিত হয়ে এই বিশাল পৃথিবী গড়ে উঠেছে। আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু নিয়েই বিরাট সাগরের সৃষ্টি। ছোট ছোট ত্রুটি একত্রিত হয়েই বিরাট ত্রুটি। প্রকৃতির ন্যায়ের দণ্ডে কেউ যে রেহাই পাবে না ! অপরাধের হাত থেকে মুক্তি নেই। এ সব সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত কথা। এই নিয়ে আমি কোন তর্কাতর্কি, তর্কবিতর্ক করতে চাই না। মৃত্যুর পরে কি আছে কি নেই, সে বিষয়ে আমি কিছু বলবো না। আমি শুধু বলছি—তোমাদের কথায়, কাজে, চিন্তায় যে যত অপরাধ করে যাচ্ছে, একেবারে চরম শাস্তি অপেক্ষা করছে প্রত্যেকের জন্য। এই জ্বালার শেষ নেই। এই শাস্তির হাত থেকে মুক্তি নাই। এখন আমার কথা ভাল না লাগতে পারে, রাগ করে ভুল বুঝে আমার কাছে আর না আসতে পারে, তাতে আমার কিছু ক্ষতি হবে না। আমার নির্দেশকে, তোমাদের ভাল করার চেষ্টাকে জ্বালা যন্ত্রণা মনে করে অস্থির হয়ে রেলের তলায় মাথা দিতে পারে, তাতে কি হ'ল? প্রকৃতির বাইরে তো যেতে পারলে না। যত ডুববে নদীর জলেই ডুবে মরবে, নদীর হাত থেকে রেহাই নেই। অনেকে তো রাগ করে বাড়ী চলে যায়। বাড়ীতে বসে থাকে বছরের পর বছর, আসে না। আমি স্নেহভরে ডেকে পাঠাই। ভাবি, আবার একবার ডাকি, যদি কিছু সংশোধন হয়। আমার কার্যাবলি দিয়ে তোমার নিজের চরিত্রকে বিচার করে দেখ, ভুল ত্রুটি কোথায়? জীবনের অঙ্ক শেখ। পাঁচে পাঁচে দশ—সাতে তিনে দশ। যোগ ঠিকভাবে যুক্ত হতে পেরেছে কিনা, হাতের এক বাদ পড়েছে কিনা ভাব। ভেবে ভেবে নিজেকে বিচার কর। ধীর, স্থির, নম্র হয়ে গুরুগতপ্রাণ হয়ে যদি থাকতে পার, এর চেয়ে সুখের ঘর আর নেই। সূর্যমুখী ফুল সূর্যের দিকে চেয়ে থাকে, সূর্যের সাথে সাথেই ধীরে ধীরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়। সূর্যমুখী ফুলের মত গুরুমুখী মন রাখতে হবে। তবে তো হবে।

নালিশ কোনটা, শাসন কোনটা, স্নেহ কোনটা বুঝতে হবে। তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ কোন ব্যক্তি তোমাকে বললেন—কাপড়টা এত উঁচু করে চলছিস কেন? তুমি কাপড়টা তো ঠিক করে নিলেই না, উপরন্তু বললে—আপনি তো এই দেখবেন! আর কোন্ দিকে নজর

দেবেন? তোমার কথায় তিনি লজ্জা পেয়ে গেলেন। কত বড় অপরাধ! প্রত্যেকে অত্যন্ত সংযত হয়ে, গুরুজনের সম্মান রেখে মিষ্টি করে কথা বলবে।

কেউ বলল— একটা বাসন মাজতে এতটা সার্ফ লাগাচ্ছিস কেন?

উত্তর ঃ—কেন? আপনার সে বিষয়ে কি দরকার? সার্ফের খরচ কি আপনি দেবেন? সে ব্যক্তি একেবারে চুপ হয়ে গেল।

আর একটি প্রশ্ন ঃ—একটি বাটি ধুতে এতটা জল লাগাচ্ছিস?

উত্তর ঃ— কেন? জলের খরচটা কি আপনি দিচ্ছেন নাকি? আপনি বালতি বালতি জল ঢালেন না? সেই বেলা মনে থাকে না! আর একজন বলছে—কাঁচের গ্লাস মাজতে এত অন্যমনস্ক হচ্ছিস কেন? পড়ে গেলেই ভেঙ্গে যাবে।

উত্তর —যাক্, আপনাকে অত চিন্তা করতে হবে না। ভেঙ্গে গেলে আর একটা নিয়ে আসবো।—বাসন মাজার সময় নীচে যদি একটা বস্তা বা ছালা পেতে রাখিস, তা হলে আর ভেঙ্গে যাবার ভয় থাকে না।

উত্তর ঃ— থাক্, আপনাকে আর অত জ্ঞান দিতে হবে না। নিজের কাজ করুন গিয়ে।

আর একটি জিজ্ঞাসা ঃ—আলুর খোসা এরকম করে ছাড়াচ্ছ কেন? আর একটু পাতলা করে ছাড়াও না!

উত্তর ঃ—থাক্ থাক্,—অত জ্ঞান দিতে হবে না। আমি আমার নিজের কাজ ভালই বুঝি। বেশী দরকার হলে আপনি নিজে এসে কাটুন!

সাধারণ সংসারে দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি প্রশ্নোত্তরে নমুনা মাত্র দেখালাম। প্রত্যেকটি উত্তর কিন্তু ত্রুটিমূলক; অপরাধের বোঝা ক্রমশঃই তৈরী হয়ে যাচ্ছে।

কেউ হয়তো সকালবেলায় কাজকর্ম না করে বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে। তাকে যদি আর একজন বলে, এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিস। এখনও বিছানা তুলিসনি কেন?

তাকে যদি শাসন করার জন্য, জব্দ করার জন্য অথবা সবার সামনে ভুল দেখাবার জন্য কথাটা বলা হয়, তবে যে বলেছে, সে অপরাধে ঠেকবে।

কিন্তু যে ভাবেই বলুক না কেন, কথাটা তো সত্যি। যাকে বলেছে, সে যদি নিজের ভুলটা স্বীকার করে নিয়ে বলে—হ্যাঁ ভাই, আমার ভুল হয়ে গেছে। ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। এখন বিছানা তুলে দিচ্ছি। তা হলেই জিনিসটা সুন্দর হয়ে যায়। যে বলেছে, সে যদি কোন উদ্দেশ্যমূলক ভাবেও কথাটা বলে থাকে, তবে সে নিজেই লজ্জা পেয়ে যাবে। কিন্তু তা তো হ'ল না। এখনও বিছানা তুলিসনি কেন? বলার সাথে সাথেই উত্তর এল—আমার কাজ আমি যখন খুশী করবো। তুই আমার উপরে মাতব্বরি করতে এসেছিস নে?—অপরাধে আটকে গেলে।

একটু নম্র হলে, একটু adjust করে চললে সংসার কত সুখের হয়! চেষ্টা করলে পালন করা কিছুই কঠিন নয়। কঠিন ভাবলেই কঠিন। কঠিন না ভাবলেই সহজ।

আমি যখন কোন আলাপ আলোচনা করি, সবাইকে সবসময়ে ডেকে শোনান সম্ভব

নয়। আমার সময় অত্যন্ত কম। সব সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। এতেও অনেকে ভুল বোঝে।—জানি জানি, আমার কথা মনে পড়বে কেন? আমাকে ডাকবে কেন? আমি তো বাইরের লোক, যাদের নিয়ে আলাপ করার দরকার ঠিকই করছে। যারা যারা ভালবাসার জন, তাদের ঠিক ডেকেছে, ইত্যাদি—অপরাধ। স্বচ্ছ মনের মধ্যে আক্রমণ করাটাই অপরাধ। সমুদ্রের পাড়ে ঝিনুকের মত, অপরাধ কুড়াতে কুড়াতে চর পড়ে যাচ্ছে যে। প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে suicide হয়ে যাচ্ছে।

যারা আমার উপর নির্ভর করে চলে, আমার মনের দিক থেকে যেন পবিত্র মন নিয়ে তাদের গড়ে তুলতে পারি, সেই চেষ্টাই করে গেলাম। আমি যে দৈবের আশ্রয় নিয়ে এসেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের স্নেহের দাবীতে এই কটি কথা বললাম। স্নেহের দাবী ঠিকই আছে। আগেই বলেছি, **আমার ব্যক্তিগত কাজে আমি এই পৃথিবীতে এসেছি এবং আমার নিজস্ব চিন্তাধারায় কথাগুলি বলেছি।** এতে তোমরা উপকৃত হবে কিনা, অথবা কতটা উপকৃত হবে সে তোমাদের ব্যাপার। আমার ব্যক্তিগত ধারণা—তোমাদের উপকার করলাম। এখন গ্রহণ করা-না করা তোমাদের ইচ্ছা।

গুরুগতপ্রাণ হয়ে থাকো। গুরুর নির্দেশ পালন করবার চেষ্টা করো। কখনও গুরুর গুরুত্ব লঙ্ঘন করার চেষ্টা কোর না। সেটি হবে অলঙ্ঘনীয় অপরাধ। কৃষ্ণ অর্জুনের সাথে সখার মত মিশতেন, হাস্য পরিহাস করতেন, কিন্তু অর্জুনকে বলে দিয়েছিলেন—অর্জুন, কখনও খেলার ছলেও ভুলে যেও না, তুমি ঢোঁড়া সাপ, আমি জাত কেউটে। অর্জুন সদা-সর্বদা সেটি মনে রেখে চলবার চেষ্টা করতেন। তোমরা আমাকে মাতা-পিতার মত ভালবাস। সেই আমাকে আপন করে হৃদয়ে ধরে রেখ। আমার হৃদয়েও তোমরা চিরদিন থাকবে অম্লান হয়ে।

প্রশ্ন —আচ্ছা ঠাকুর! অপরাধ কোরবো না, অন্যায় কোরবো না—মুক্তির জন্য তৈরি হব। তবু যদি ভুলবশতঃ বা কোনো কারণে অপরাধ হোয়ে যায়, তবে কি হবে?

উত্তর ঃ— অপরাধ কোরবো না—অন্যায় কোরবো না—সত্য পথে থেকে মুক্তির জন্য তৈরি হবো, এই যে একটা ইচ্ছা জাগবে—এই ইচ্ছা যদি মনে জাগিয়ে রাখতে পারিস্, তবে তোরা অপরাধ কোরতে পারবি না। তারপর মনে কর হঠাৎ একটা অন্যায় কোরে ফেললি। তার জন্য চিন্তা করার কিছু নাই। আবার তোরা শুদ্ধ হ। আবার যদি অপরাধ কোরে ফেলিস, আবার সংকল্পে দৃঢ় হোয়ে 'আর কোরবো না' অনুতাপে আগের অন্যায়-অপরাধ পুড়ে যাবে। এইভাবে আবার তোরা শুদ্ধ হবি। শুদ্ধ হোতে হোতে তোরা শুদ্ধই হয়ে যাবি। তখন দেখবি— অন্যায় করার প্রবৃত্তি আর থাকবে না। দেখ, এই যে দোলের আগে কুঁড়ে পোড়ে—তো কেন? কৃষ্ণকে আবির দেবে—কৃষ্ণ-চিন্তায় বিভোর থাকবে, তাই আগের যত মলিনতা-পঙ্কিলতা ছিল—অন্যায়-অপরাধ ছিল, সে সব অনুতাপের আগুনে পুড়িয়ে ফেলে দিল। তাই মনের গোড়ায় আগুন দেয়া বুঝবার জন্যই কুড়ে পোড়া। অনুতাপের আগুনে সব অন্যায় পুড়ে যায়। তাই ভাববার কিছু নাই।

প্রশ্ন ঃ—অপরাধ যে খটে বা চিন্তায় আসে, অপরাধ বিনাশের কি কোন খট্ নেই?

উত্তর ঃ— দেখ, অপরাধ যে খটে আসে, অপরাধ বিনাশের চিন্তাও সেই খটে আসে। গঙ্গায় যখন বান আসে, খুব উঁচু হোয়ে আসলে হাওড়া ব্রীজ চুরমার হোয়ে যাবে, তাই গঙ্গার পাড়ে কামান ফিট কোরে রাখে। মস্ত উঁচু বান আসলেই সেই বানের উপরে কামান দাগে, বান অমনি ভেঙ্গে যায়, ব্রিজ রক্ষা পায়। তোদের সেই কামান আমি দিয়ে রেখেছি। সেই কামানের গুরু গুরু শব্দে যত অপরাধের খট ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে। তোরা কেবল ঐ কামান দাগবি। খট্ খট্ বীজমন্ত্র জপ করবি। অন্যায়-অপরাধ কোরবো না—মনে সংকল্প নিবি আর গুরুগতপ্রাণ হোয়ে থাকবি। তোদের কোন চিন্তা নাই।

প্রশ্নঃ—প্রাণী হত্যা তো অপরাধ খাওয়া-দাওয়া কোরলে তো প্রাণী হত্যা করতেই হবে। মাছ-মাংস না খেলে কি প্রাণীহত্যা বন্ধ হবে?

উত্তর ঃ—দেখ্, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বলে, প্রাণী হত্যা অপরাধ—প্রাণী হত্যা করবে না। সাধু-সন্ন্যাসীরা ঘর ছেড়ে আশ্রমে যায়। আশ্রমে যেয়ে কি তারা না খেয়ে থাকে? লাউ-কুমড়োরও প্রাণ আছে। তবে তো প্রাণী হত্যার থেকে কোন সাধু-সন্ন্যাসী রেহাই পাবে না। প্রয়োজনেব মধ্যে যেটা পড়ে তাতে দোষ নেই, প্রয়োজনের বাইরে যেটা সেটাই অপরাধ। উদ্দেশ্যটাই আসল। তোমার জীবন রক্ষার জন্য তুমি খাচ্ছ। মাংস কিনে খাবে। লাউ কুমড়োর প্রাণ আর মাছ-মাংসের প্রাণ—প্রাণ একই।

প্রশ্ন ঃ—নিজেকে হত্যা কোরবো, অপরাধ কোরবো—এই ইচ্ছা জাগে কেন?

উত্তর ঃ— দেখ্, সৃষ্টিকর্তা যখন সৃষ্টি কোরেছেন তখন সবার ভিতর তাঁর ইচ্ছাশক্তিটা দান কোরে দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে cautious (সতর্কতা) বোলে একটা জিনিস দিয়ে দিয়েছেন। যে ইচ্ছাশক্তি তিনি দান কোরে দিয়েছেন, সেইটা তিনি আর ফেরৎ নেন্না। তিনি বলছেন—আমি তোদের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পাঠালাম। তোরা বুঝে বুঝে ব্যয় করবি। সতর্কতা যেটা দিলাম—সেইটাই তোদের মনে করিয়ে দেবে।

তোরা ইচ্ছা করলে নিজেকে হত্যা কোরতে পারিস—ইচ্ছা করলে তোর একটা আঙ্গুল কেটে ফেলতে পারিস। রাস্তার কলের জল না খেয়ে, নর্দমার জল খেতে পারিস—সে তোদের ইচ্ছা। আমি যে ইচ্ছা দান করেছি, তাতে হস্তক্ষেপ করবো না। কিন্তু সতর্কতা যেটা তোর ভিতর আছে, সেটা তোকে বারণ কোরবে—হাত কাটলে রক্তপাত হবে। এটা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছে। নর্দমার জল খেলে অসুখ করবে এটা তুমি জান। আমি তোমাদের পাঠালাম—কাজ কোরে আবার আমার কাছে চলে এসো। তুমি কি করলে? নিজেকে হত্যা করে বসলে। সতর্কতা তোমাকে জানিয়ে দিয়েছে এটা অন্যায়—এটা অপরাধ। তুমি ক্ষণিকের উত্তেজনায় নিজেকে বিনাশ কোরো প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করলে। সতর্কতা যেটা, সেটা তোমার ভিতর ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দের মতন জানিয়ে দিচ্ছে—এটা কোরো না, অন্যায়; ওটা কোরো না, অপরাধ। তুমি তার কথা না শুনে করে যাচ্ছ। তাই ঐ সব ইচ্ছা জাগে। মনের নির্দেশ মতন সতর্ক বাণী শুনে যদি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা চলতে পার, তবে

তোমাদের সিদ্ধি-মুক্তি কেউ আটকাতে পারবে না। দেখবে, একটা অন্যায় কাজ করতে গেলে মনে সায় দেবে না। তখনি জানিয়ে দেবে—এ কাজটা করা উচিত হবে না। মনের নির্দেশ মত যারা চলতে পারে, তারা কলের জলই খাবে। যারা মনের নির্দেশ মেনে চলে না, তারা নর্দমার জল খাবে আর ভুগবে। অর্থাৎ সতর্কতার কথা না শুনে অপরাধের প্যাঁচে আটকে যাবে।

প্রশ্ন ঃ—ঠাকুর, অনেক সংসারে সামান্য কারণে নানা অশান্তি-মনোমালিন্য ঝগড়াঝাটি হয়। কি করলে, কোন্ পথে চললে এসব এড়িয়ে সংসারে শান্তিতে বাস করা যায়, আমাদের একটু সে সম্বন্ধে উপদেশ দাও।

উত্তর ঃ— আমি তোদের যা যা বলি মন দিয়ে শোন্। আমার সব কথা শুনলে তোরা বুঝতে পারবি, সংসারে কোন্ পথে চললে শান্তিতে থাকা যায়।